কুমিল্লার ইতিহাস

আদি পর্ব

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪০৮ জুলাই ২০০০

প্রকাশিকা : সুলেখা কোঙার নতুনপল্লী বর্ধমান

পরিবেশক : দে বুক স্টোর ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

মুদ্রক : অর্চনা অফসেট ১৬৮ নতুনপল্লী বর্ধমান

প্রচ্ছদ : শ্যামলবরণ সাহা ৩৭ কালনা রোড বর্ধমান

অক্ষর বিন্যাস : মৃণালকান্তি ঘোষ

অক্ষর সংশোধন : মাধব চক্রবর্তী

ভূমিকা

১৯৭১ সালে নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি হাজার হাজার বছরের পুরানো। এই রাষ্ট্রটি তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে ক্রমাগত পরিবর্তন, বহিরাগত সংস্কৃতির আগ্রাসন আর তার নিজস্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থানে এসেছে। তবে প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলে বাংলা বলতে একক কোনও ভূখণ্ড ছিল না। এই অঞ্চলে ছিল জন বা গোত্র বসতি। এক সময় তাদের নামানুসারে গড়ে ওঠে প্রাচীন বঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, রাঢ়, পুণ্ড্র ইত্যাদি জনবসতি বা জনপদ। ফলে বাংলাদেশের কোনও একটি জেলার বা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস রচনা নামান্তরে এই জনপদগুলোর কোনও একটির ইতিহাস রচনা। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাচীন ইতিহাস চর্চা, অধিকন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও রচনা অনেকটাই অবহেলিত। কেননা বিগত কয়েক দশকে অধিকাংশ রচনাই হয়েছে ঔপনিবেশিকাল ও তৎপরবর্তী সময়ের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। তবে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ফলে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়েও প্রাচীন ইতিহাসে রয়ে গেছে অনেক শূন্যতা।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যারা ইতিহাস ও প্রত্নচর্চা করছেন তাদের অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। তারা জাতীয় পর্যায়ে প্রাচীন ইতিহাস রচনার পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে ইতিহাস রচনা করছেন। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোতে ইতিহাস চর্চার এই দিকটি অর্থাৎ স্থানীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগটি অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও আগ্রহেই এই বিষয়টির চর্চা করছেন।

উল্লেখ্য, বাংলার প্রাচীন কালের ইতিহাস রচনা কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। কেননা এই সময়ে একক কোনও বৃহৎ রাষ্ট্র যন্ত্রের বিকাশ এই অঞ্চলে হয়নি। উপরন্তু আর একটি জটিল সমস্যা ঐতিহাসিকদের সম্মুখীন হতে হয়। আর তা হ'ল উৎস সংক্রান্ত সমস্যা। কেননা ঐতিহাসিককে কথা বলতে হয় সাক্ষ্য প্রমাণ তথা উৎসের ভিত্তিতে। কিন্তু বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে উৎসের স্বল্পতা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উৎস না থাকার কারণে ঐতিহাসিকদের হোঁচট খেতে হয় বারবার। বাংলায়

সমগ্র প্রাচীনযুগের কোনও লিখিত ইতিহাসগ্রন্থ পাওয়া যায়নি। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস কেন্দ্রিক প্রথম লিখিত উৎস হ'ল দশম শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিতম'। কিন্তু এটিও নিখাদ কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয় বরং দ্ব্যার্থবোধক একটি কাব্যগ্রন্থ। ফলে ঐতিহাসিকদের সাহায্য নিতে হয় অন্যান্য উৎসের। আর সেগুলি হ'ল তাম্রশাসন বা জমি ক্রয়-বিক্রয় বা দানের দলিল, সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ অথবা বিদেশীদের বিবরণের উপর। এগুলোর পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শন যেমন মুদ্রা, মৃৎফলক, মৃৎপাত্র, শিলালিপি অথবা স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলি নৈর্ব্যাক্তিক হবার কারণে এগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যে অনেকক্ষেত্রেই সন্দেহের অবকাশ খুবই কম।

এই সমস্ত সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই ঐতিহাসিকগণ বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনার কাজটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বৃহৎ পরিমণ্ডলে এই ইতিহাস লেখার পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়েও এই ইতিহাস রচনার কাজ এগিয়ে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গ্রন্থে আজকের কুমিল্লা জেলার আদিপর্বের অর্থাৎ প্রাচীনযুগের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

কুমিল্লা জেলা তথা লালমাই-ময়নামতি পাহাড়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এই এলাকাটি বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি জনপদ। শত শত বছর ধরে নগরায়ন ও উন্নত সংস্কৃতির সাক্ষ্য বুকে নিয়ে এই অঞ্চলটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নগরায়নের পাশাপাশি এই অঞ্চলে প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই রাষ্ট্রযন্ত্রের উত্থান ও বিকাশ হয়।

প্রাচীন কালে এই অঞ্চলটি যে জনপদটির মধ্যে সিংহভাগ সময়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল সেটি সমতট নামে পরিচিত। মূলত সমতটকে কেন্দ্র করে দেব রাজবংশের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় উত্থান ঘটে। দেব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে একাধিক বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির। পরবর্তীতে চন্দ্রদেবের সময় কুমিল্লা অঞ্চলটি হরিকেল জনপদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সমতট অঞ্চলে যে সমস্ত বৌদ্ধ স্থাপনা এবং বৌদ্ধ ধর্মচর্চা কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন তার অনেকগুলিই বর্তমান কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। তার বর্ণনায় সে সময়ের কুমিল্লা অঞ্চলে বিরাজমান বৌদ্ধ ধর্মচর্চা, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকাশ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যের বিবরণ পাওয়া যায়।

বর্তমান গ্রন্থটিতে কুমিল্লার প্রাচীন ইতিহাস রচনার জন্য প্রাচীন বাংলার

ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎসের সাহায্য নেয়া হয় সেগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুপ্ত রাজবংশের তাম্রশাসনগুলির পাশাপাশি পাল, দেব, খড়গ, চন্দ্র এবং সেন রাজাদের তাম্রশাসনগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ, বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ, স্থানীয় লোকসাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের (হিউয়েন সাং, ফা হিয়েন, ইৎসিং) সাহায্য নেয়া হয়েছে। তবে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে কুমিল্লা অঞ্চলের অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সবচেয়ে মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। বৌদ্ধ স্থাপনা এবং বৌদ্ধ মূর্তি ছাড়াও প্রাপ্ত মুদ্রা, শিলালিপি, মৃৎপাত্র, মৃৎফলক ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছে।

গ্রন্থটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায় বিভক্ত করে কুমিল্লা অঞ্চলের আদিপর্বের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে কুমিল্লা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দেয়া হয়েছে। এতে এর বর্তমান অবস্থান, আয়তন ও লোকসংখ্যা, জলবায়ু, কুমিল্লা নামের উৎপত্তি ও জেলার সৃষ্টি, ভূ-গঠন, প্রধান নদ-নদী (মেঘনা, গোমতি), প্রাচীন যাতায়াত পথ, খনিজ ও বনজ সম্পদ ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ইতিহাস মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের বিবরণ, যা তার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলেই আবর্তিত হয়। ফলে এ অধ্যায় প্রাচীন কুমিল্লার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বর্তমান অবস্থা ও প্রাচীন তথ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুমিল্লার রাজনৈতিক ইতিহাসের আদি পর্বটির কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। এই অঞ্চলের তথা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ছিল মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবংশ। কুমিল্লায় মৌর্যদের না হলেও গুপ্তদের ক্ষমতা বিস্তারের সাক্ষ্য বিদ্যমান। পরবর্তীতে এই অঞ্চল গৌড়ের প্রথম স্বাধীন নৃপতি শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং অবশ্য শশাঙ্ক পরবর্তী সময়ে বাংলায় ভ্রমণ করেন। তিনি কুমিল্লা অঞ্চলে অর্থাৎ সমতট এলাকায় পৃথক রাজবংশের অস্তিত্বের কথা বলেন। অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার এ অঞ্চল অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় দেব ও চন্দ্র বংশীয় রাজাদের পৃথক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব আছে। এর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরার রাজাও কখনও কখনও কুমিল্লায় তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে পাল ও সেন রাজাদেরও কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র রাজ্যশাসন নয় এর পাশাপাশি বিভিন্ন রাজবংশের সময়ে কুমিল্লার ধর্মীয় জীবন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ঐতিহ্য তা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এই অঞ্চলের প্রত্ন সম্পদগুলির বিবরণ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নব্য প্রস্তরযুগে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ, শালবন বিহার, কোটিলামুড়া, চারপত্রমুড়া, আনন্দ বিহার, ভোজবিহার, রূপবানমুড়া, লতিকোট মুড়া, কোটবাড়ি বিহার, চিলামুড়া, চণ্ডিমুড়া, ময়নামতি মুড়া এবং রানী ময়নামতির প্রাসাদ পাহাড় ইত্যাদি প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে কুমিল্লার প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলা হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে বাংলায় নৃতাত্ত্বিক সংকরায়ণ একটি ঐতিহাসিক চলমান প্রক্রিয়া। বাংলার প্রাচীন জনস্রোতে অস্ট্রিক ভেড্ডিড, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ও আর্যধারার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলা তথা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কুমিল্লার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলে বর্ণ ও বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন জনশ্রেণীর বিবরণ এতে দেয়া হয়েছে। অধ্যায়টির শেষে প্রাচীন সমতট অঞ্চলে নারীদের ইতিহাস ও সামাজিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই অধ্যায়টি মূলত বাঙালির জনবিচিত্রতার ধারাবাহিকতায় কুমিল্লার জনবিচিত্রতার বিবরণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাচীন কুমিল্লার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতিকে সামনে রেখেই কুমিল্লার সংস্কৃতিকে আলোচনা করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলায় আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় গুপ্তদের সময়ে বাংলায় আর্যায়ণের প্রক্রিয়া মোটামুটিভাবে শেষ হয়। কিন্তু বাংলাতে সংস্কৃতির অর্থাৎ খাদ্যাভাস, পোশাক, ভাষা, দৈনন্দিন আচারাদি, ধর্মীয় অনুশাসন সকল কিছুতেই তার প্রাক-আর্য সত্তা খুবই প্রবল। কুমিল্লাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ফলে এ অঞ্চলের কৃষি, খাদ্যাভাস, পোশাক, ভাষা, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এই দুই ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত তথ্য ও উৎস না থাকলে কোনও দেশ বা অঞ্চলের ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এ কারণেই এই গ্রন্থে কুমিল্লার আদিপর্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। যেমন সুপ্রাচীন কাল থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোনও বিবরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। এই সময়ের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই সর্বভারতীয় ও বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের গতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন উৎসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বিমত থাকতে পারে। বইটিতে যে সকল উপসংহার টানা হয়েছে সেক্ষেত্রেও অনেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারেন।

ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণের নিকট থেকে এ ব্যাপারে তাদের মূল্যবান বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা পেলে তা পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

উৎসের স্বল্পতা এবং অনেক ক্ষেত্রেই উৎসগুলির অদ্ভুত প্রকৃতি, এই বিশাল সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই বর্তমান গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎসের সাহায্য নেয়া হয় তার সবগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত উৎসগুলি থেকে গ্রন্থটির বিষয় বিন্যাস অনুযায়ী তথ্যসমূহ প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রাচীন কুমিল্লার সমাজ সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে ইতিহাসের গতিধারাকে অনুসরণ করে। লেখক কিছু মূল্যবান ছবি, অংকন, মানচিত্র এবং সারণীর ব্যবহার করেছেন যা গ্রন্থটির বিষয়বস্তুকে ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে। একটি গ্রন্থ তখনই সফল যখন সেটি তার পাঠকের মনে দানা টেনে যায় তা যে ভাষার আঙ্গিকেই হোক বা বিষয়বস্তুর আলোকেই হোক। 'কুমিল্লার ইতিহাস আদি পর্ব' গ্রন্থটি ভাষা ও বিষয়বস্তু এই উভয় মানদণ্ডেই আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে কৃতিত্বটি সম্পূর্ণভাবে গ্রন্থকারের। তাঁকে এজন্য জানাই সাধুবাদ। আমি গ্রন্থটির ব্যাপক সাফল্য ও প্রচারণা কামনা করি।

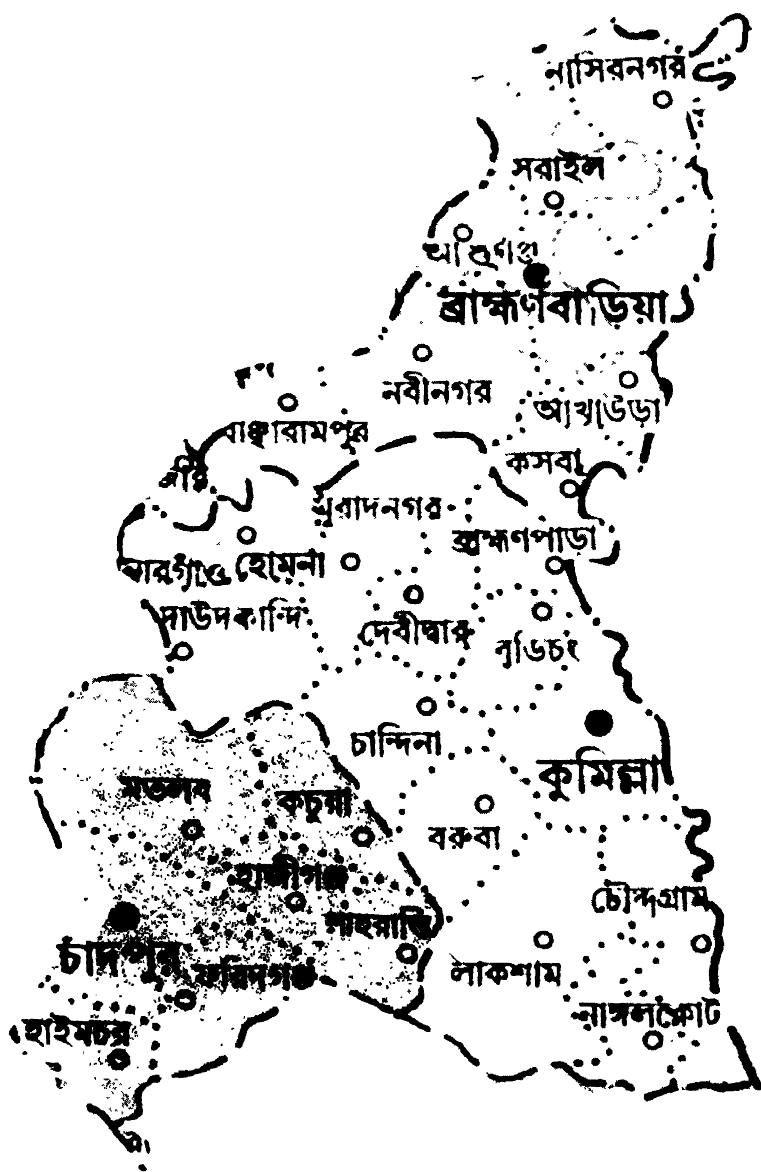
সূচিপত্র

মানচিত্র সূচি

কুমিল্লা জেলা



১. বর্তমান কুমিল্লার মানচিত্র



২. বৃহত্তর কুমিল্লার মানচিত্র

বাংলাদেশ প্রশাসনিক

সাংকেতিক চিহ্ন

ভারত

বঙ্গোপসাগর

বার্মা

৩. বর্তমান বাংলাদেশের মানচিত্র

BANGLADESH

(SHOWING ANCIENT MONUMENTS)

Scale I inch to 18 Miles

৪. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বলিত বাংলাদেশের মানচিত্র

INDIA

SHEWING THE BRITISH POSSES

in the year 1812

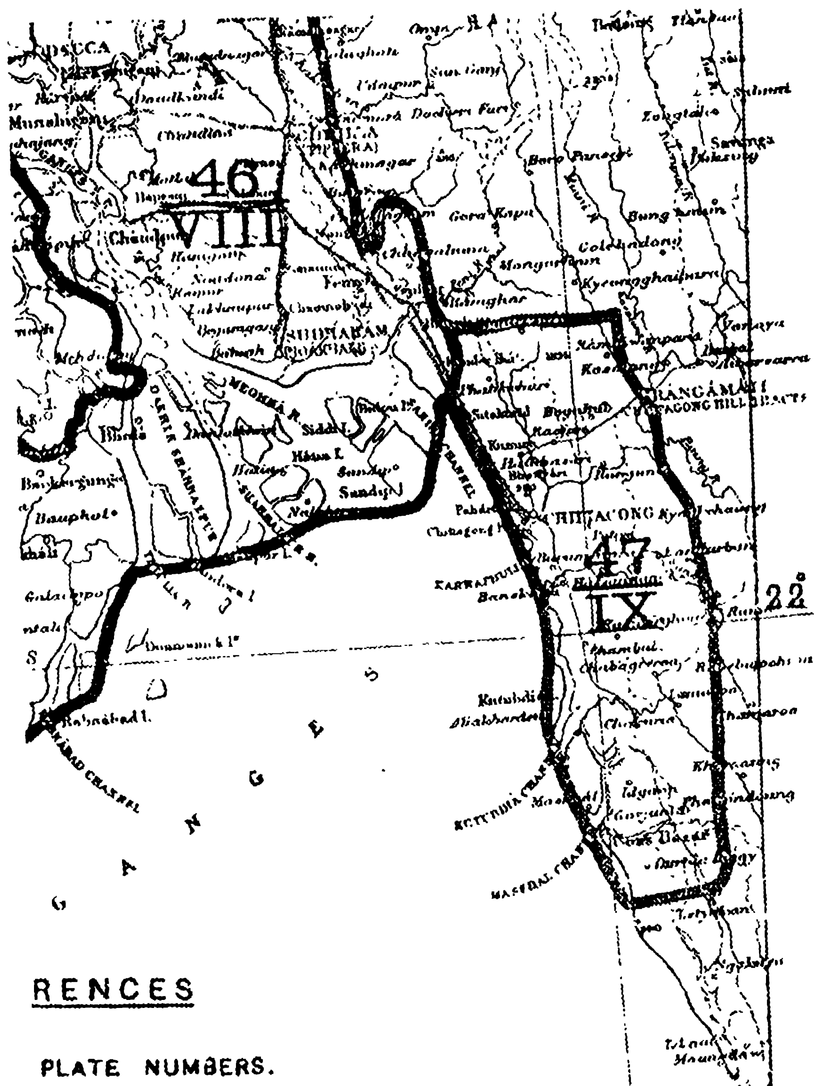
BAY OF BENGAL

Chronological Table of the Acquisitions of the British under Administration

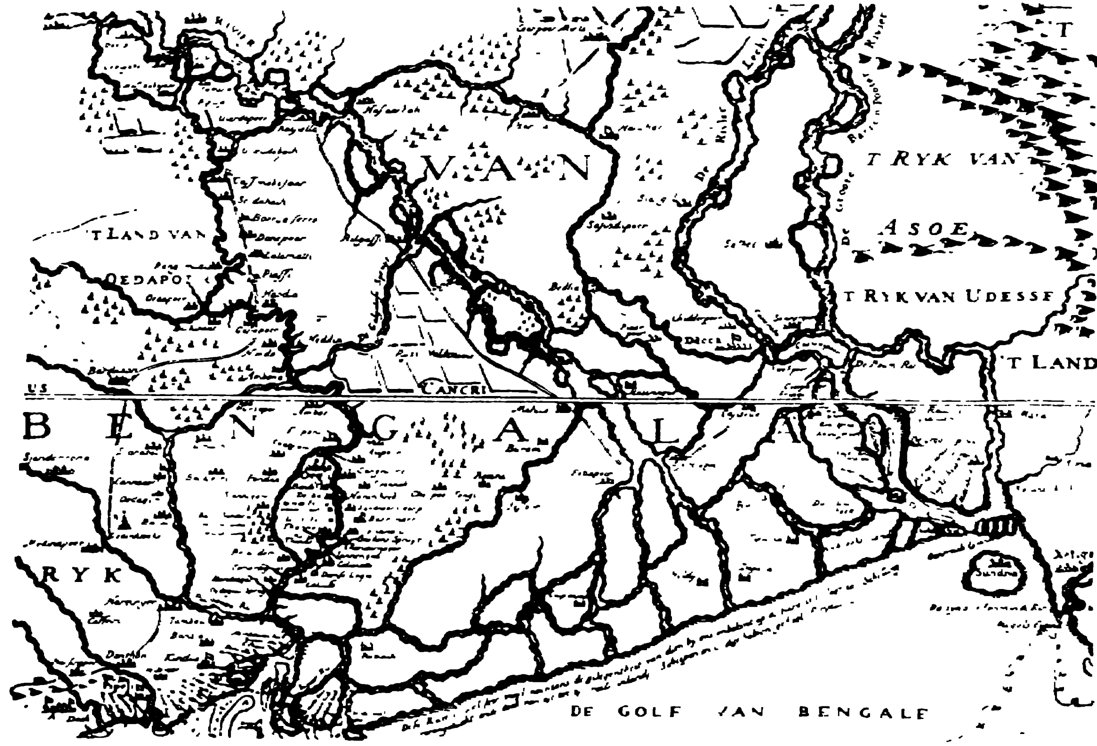
৫. ইন্ডিয়া ১৮১২ সাল



৬. রেনেলকৃত (১৭৬৪-৭৬) বাঙলার ভূমি ও নদ-নদীর মানচিত্র



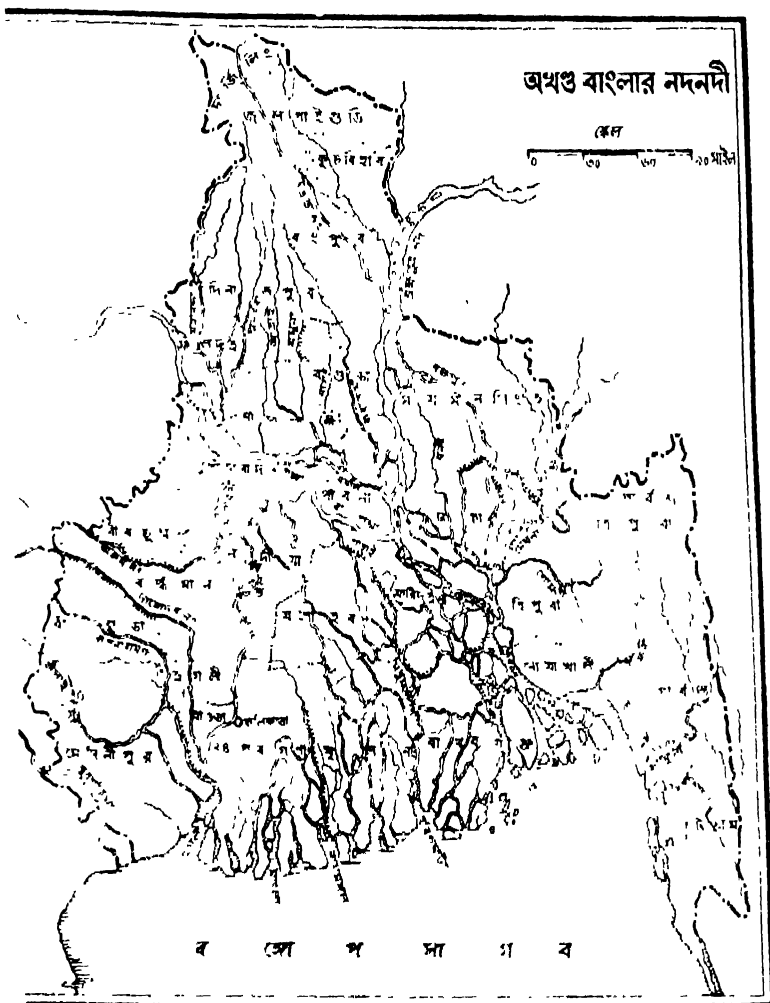
৭. রেনসেস মানচিত্র



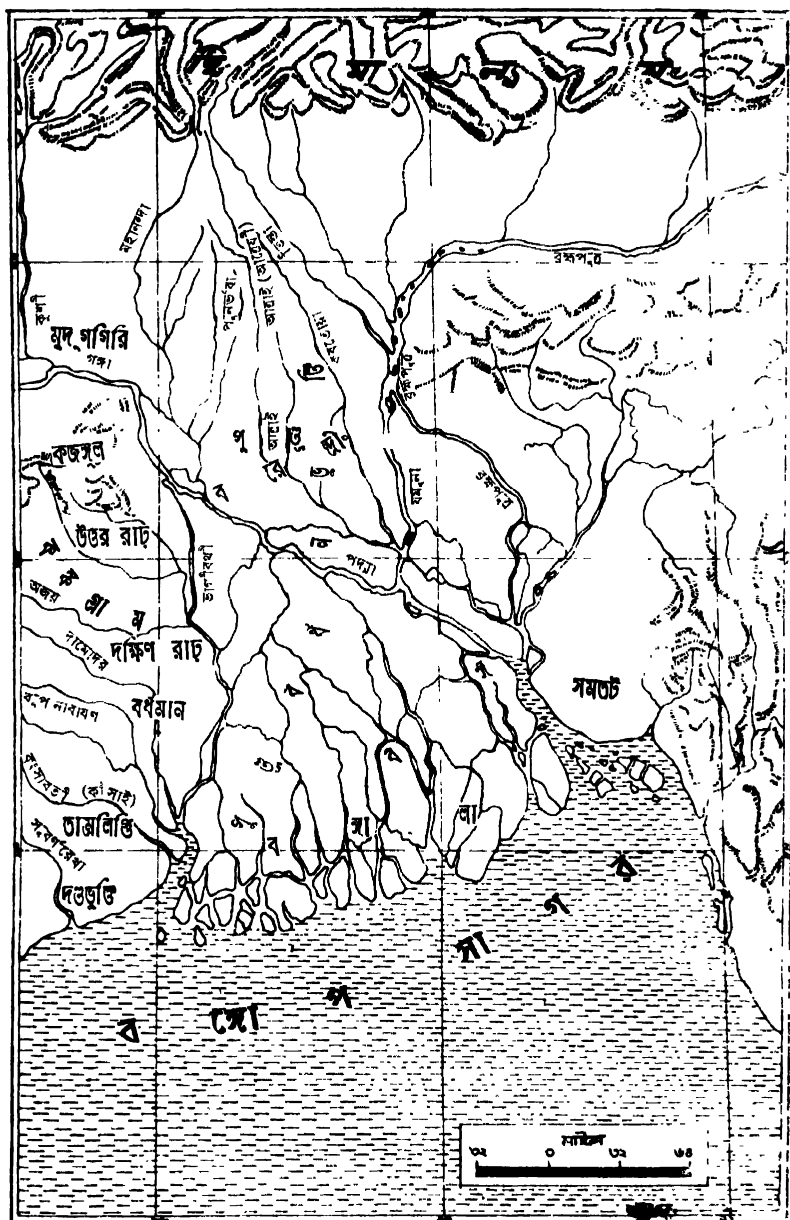
৮. ভন ডেন ব্রুক-কৃত (১৬৬০) বাঙলার ভূমি ও নদ-নদীর নকশা



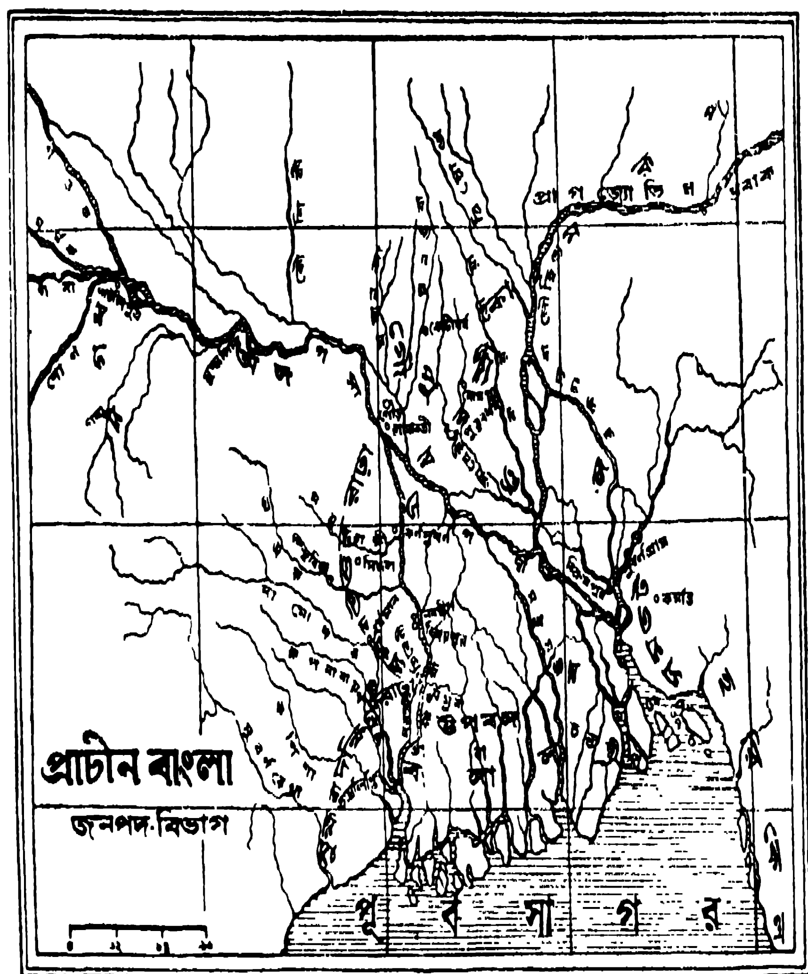
৯. জাও দ্য ব্যারোস-কৃত (১৫৫০) বাংলার ভূমি ও নদ-নদীর নকশা



১০. অখণ্ড বাংলার নদ-নদী



১১. বাংলার প্রাচীন আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক বিভাগ



১২. প্রাচীন বাঙলার জনপদ-বিভাগ



১৩. আর্য্যাবর্ত্ত মানচিত্র (প্রাচীন যুগ)

প্রথম অধ্যায়
ভৌগোলিক পরিচয়

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ মনে করেন অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ভারতবর্ষের পূর্বসীমা সমুদ্রগর্ভে মিলিত ছিল। হিমালয়ের স্থানে স্থানে সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রবাহিত কর্দম থেকে বঙ্গভূমির উদ্ভব ঘটে থাকবে।[১] কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতে এমনকি কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গের নাম উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণে মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলেছেন কঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কৌশল প্রভৃতি দেশের রাজারা তার শাসনাধীন।[২] মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে যযাতি রাজার চতুর্থ পুত্র অনুর অধস্তন দ্বাদশ বংশধর বলি রাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে আদিত্যতুল্য তেজস্বী পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের নামানুসারে কঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম– এই পাঁচটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয় এবং পাঁচ ভাই পাঁচটি রাজ্য শাসন করেন। মহাভারতের সভাপর্বের ত্রিশতম অধ্যায়ে আছে মহাবীর ভীমসেন পূর্বদিক জয় করতে অগ্রসর হয়ে পুনরাধিপতি বাসুদেব কৌশিকীর ও মহৌজা এই দুই বীরকে 'সংগ্রামে' পরাজিত করে বঙ্গরাজের দিকে ধাবিত হন এবং মহিপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কিকটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করে সমুদ্র ম্লেচ্ছদেরকে পরাভূত করেন। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গদেশীয় রাজন্যগণকে পরাভূত করার কথা বলা আছে।[৩] বেদে বঙ্গ নামের উল্লেখ নেই। কিন্তু 'বয়াংশি' শব্দের ব্যবহার থেকে মনে করার কারণ রয়েছে বৈদিক আর্যরা বাংলাদেশের অধিবাসী 'বঙ্গ' বাসী পরিচিত ছিলেন। গোলাম হোসায়ন সলিম জয়িতপুরী 'রিয়াজ উস সালাতিন' (১৭৬৬-১৭৮৮) নামে ফারসি ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা সম্পর্ক উত্থাপন করেন। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় হযরত নূহ-এর পুত্র ছিলেন হাম, হামের পুত্র হিন্দ, হিন্দের পুত্র বঙ্গ। বঙ্গ ভারতের পূর্বাঞ্চলের যে স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন সে স্থানের নাম হয় বঙ্গ। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, মুসলমান পৌরাণিক কাহিনীটা সাদামাটা। মহাপ্লাবণের নায়ক পয়গম্বর নূহের পুত্র ছিল হাম, হামের পুত্র ছিল হিন্দ এবং হিন্দের দ্বিতীয় পুত্র ছিল বঙ্গ। বঙ্গ বঙ্গে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেন।[৪]

মহাভারতীয় যুগের পর পুরাণেও বঙ্গদেশের কথা জানা যায়। সে সময়ে তন্ত্রাদিগ্রন্থে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রসঙ্গে বলা হয়, এটি তীর্থরাজ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়ে বঙ্গদেশে পূজিত হচ্ছিল।

৩০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ম্যাগাস্থিনিস তাঁর 'Indica' গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে কামরূপ রাজ্যের সীমা সমগ্র পূর্ববঙ্গ নিয়ে পশ্চিম-উত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত দেখিয়েছিলেন।[৫]

খ্রিস্ট জন্মের ৩২৭ বছর পূর্বে আলেকজান্ডরীয় যুগে প্রাক জ্যোতিষের অন্তর্গত চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশকে প্রাচীন ব্রহ্মদেশবাসীগণ 'ক্লিং' বা 'কালেন' অর্থাৎ পশ্চিম দেশ বলতেন। এই কালেন দেশের সামরিক শক্তি এত প্রবল ছিল যে, আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ কোনো অবস্থাতেই তদভিমুখে আসতে পারতেন না।[৬]

পার্গিটার রচিত পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের প্রাচীনকালের মানচিত্রে এতদঞ্চলের ভৌগলিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মানচিত্রে আজকের বাংলাদেশের এতদাঞ্চলের দক্ষিণে সাগররূপের উত্তরে প্রাকজ্যোতিশ ও কিরাতসের অবস্থান চিহ্নিত আছে। লোহিত (ব্রহ্মপুত্র) নদীর অববাহিকায় প্রাগজ্যোতিষ অঞ্চল ও কিরাতস নামে অভিহিত ছিল। পার্গিটা কিরাত সম্পর্কে বলেছেন, It (Kiratades, the term Kirata) was applied to tribes in habitating the Himalaya range and its southern slopes from the Punjub to Assam and Chittagong.[৭]

Lassen কিরাত সম্পর্কে বলেন, By the name Kirradia, Ptolemy designates the land on the coast of further India from the city of Pentapolis, perhaps the present Miskanseri (Mirsarai) in the north, as far as the mouth of the Tokasanna or Arakan.[৮] He Crindle বলেন, By the Cirradioi are meant the kirata a race spread along the mouth's of the Ganges as far as Arakan.[৯]

কুমিল্লা জেলার মধ্যভাগের সমতল-চান্দিনা প্লাবন সমভূমি। তখনকার দিনে গঠিত হয়েছিল ব্রহ্মপুত্রবাহিত পলি দ্বারা। পরে নদীটি পশ্চিমে সরে যায়। অনুমান করা যায় প্রাগজ্যোতিষের পূর্বের অঞ্চল কিরাতসের অধিকাংশ স্থান নিয়ে আজকের কুমিল্লা জেলা গঠিত হয়েছে।[১০]

সম্রাট অশোকের সময় (খ্রিস্টাব্দপূর্ব ২৬০ অব্দ) সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর শাসনাধীনে আসলে বিভিন্ন স্থানে তিনি বৌদ্ধচৈত্য স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের কোনো কোনো স্থানে (রামু, হাইটগাঁও) গৌতমবুদ্ধের অস্থি সম্বলিত চৈত্য স্থাপনের নজির রয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তাঁর সময়কার একটি লিপি থেকে নানা যায় সে, কামরূপ, সমতট প্রভৃতি এলাকার নৃপতিগণ তাঁকে কর দান করতেন।[১১]

হিউয়েন সাঙ-এর সময়ে ভাস্কর ব্রহ্মা নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন। উক্ত রাজ্যের বিস্তৃতি দু' হাজার মাইল অবধি ছিল বলে হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। এর থেকে জানা যায় কমলাঙ্ক (কুমিল্লা), সমতট, কাছাড়, শ্রীহট্ট, জয়ন্তা ও পশ্চিম আসামসহ করোতোয়া নদীর তীর পর্যন্ত এক সম্রাজ্য ছিল। শ্রীচট্টলো/চট্টগ্রাম কোনো কোনো সময় বর্মা, আরাকান ও কোনো কোনো সময়ে কামরূপ ও ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১২]

প্রত্নতত্ত্ববিদ রমেশচন্দ্র দত্ত হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণিত স্থানগুলোকে আধুনিক আসাম, মনিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা শ্রী কেদারনাথ মজুমদার হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবিবরণী অনুযায়ী বঙ্গভূমিকে তৎকালে ছয়টি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন :

(১) পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমভাগ) (২) কামরূপ (ময়মনসিংহের পূর্বভাগসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম) (৩) সমতট (ঢাকা, ফরিদপুর), (৪) কমলাঙ্গ (ত্রিপুরা ও কুমিল্লা), (৫) তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ) ও (৬) কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ)।[১৩]

বার্মার ইতিহাস লেখক কর্ণেল ফাইয়ার হিউয়েন সাঙকে উদ্ধৃত করে কমলাঙ্ককে (কুমিল্লা) রামলঙ্কা এবং চট্টলোকে পেগু প্রভৃতি ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেব এটিকে ভ্রম বা কল্পনা বলে চিহ্নিত করেন।

আর্যদের আগমনের আগে ত্রিপুরার অধিপতি ছিলেন ত্রিপুরাসুর। আর্যরা কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষ) অধিকারের পরে ত্রিপুরা আক্রমণ করলে ঘোরতর যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই যুদ্ধে কৌশলে আর্যরা জয়লাভ করে এবং ত্রিপুরাসুরকে বধ করে। ত্রিপুরাসুরের নামানুযায়ী এই ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন।

১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক চ্যাংহু ভারত ভ্রমণে আসেন। আরব দেশীয় দোভাষ মাহুয়ানের বর্ণনায় জানা যায় এরা সুমাত্রা দ্বীপ হতে একুশ দিনে জাহাজে চড়ে চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হন এবং চট্টগ্রাম হতে নৌকাযোগে পাঁচশ লী দূরে সোনাকং (সোনারগাঁ) পৌঁছেছিলেন।

মেগাস্থিনিসের পর ভার্জিলিয়াস মারো (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৭০-১৯) বা ভার্জিল 'জোর্জিকাস' নামক কাব্যে বঙ্গরিডিদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কে প্রশস্তি বর্ণনা করেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সেকুলাস 'বিবলিওথিকা

হিস্টোরিকা' নামে চল্লিশ খণ্ডের এক বিরাট বিশ্ব ইতিহাস লেখেন। এই বইতে বঙ্গবিডির উল্লেখ আছে। রোমের মহিষী গেইয়াম প্লিনিয়াস সেকান্দাস (২৩-৭৯ খ্রিস্টাব্দ) বা প্লিনি 'হিস্টোরিয়া নেচারালো' নামে ৩৭ খণ্ডের এক বিশ্বকোষ রচনা করেন। এই বিশ্বকোষেও বঙ্গরিডির কথা আছে। পেরিপ্লাস অব দা ইরিত্রিয়ানসি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা বই। একজন অজ্ঞাতনামা মিসরীয় নাবিক গ্রিক ভাষায় নাবিকদের সুবিধার জন্য এই বই লেখেন। এতে গাঙ্গে নামক বন্দরের কথা আছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমদেশীয় কবি ভেলেরিয়াস ফ্লাক্কাস 'আরগন্টিকা' নামক কাব্যে বঙ্গরিডি দেশের বীরদের প্রশংসা করেন। আলেকজান্ডারের জীবনীকার রোমের ঐতিহাসিক কার্টিয়াস রিওফাস (প্রথম শতাব্দী) জীবনীগ্রন্থে বঙ্গরিডির কথা বলেন। তবে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ ক্লোডিয়াস টোলেমিয়াস বা টলেমি ভূগোল বিষয়ে বিখ্যাত এক বই লেখেন। আলেকজান্দ্রিয়ার এই বিখ্যাত টলেমি তাঁর ভূগোল গ্রন্থে 'গাঙ্গে' এবং উপ-মহাদেশের অন্যান্য বহু স্থানের নাম উল্লেখ করেন।[১৪] এর মধ্যে Pentapolis (150^{o}-180^{o}) একটি। কিরাত এবং চট্টগ্রামের মধ্যে তার অবস্থান দেখিয়েছেন। তার Mouth of the River Katabeda (151^{o}-11^{o}) কে Mc Crindle কর্ণফুলী নদী বলে সনাক্ত করেছেন। Barakoura ($152^{o}30'$-16^{o}) ক্রয়-বিক্রয় স্থল (a mart), Yule তাঁর মানচিত্রে এই স্থানটিকে Ramai বা Ramu বলে সনাক্ত করেছেন।[১১] টলেমির আন্তঃগাঙ্গেয় (India Indra Gangem) ভারতবর্ষেরই নক্সা ও বিবরণীতে তদানীন্তন গঙ্গা প্রবাহের সাগর সঙ্গমে পাঁচটি মুখের উল্লেখ করেছেন। মোহনাগুলোর নাম : ১. Kambyson, তারপর Poloura নামে নগর, ২. Mega (great), ৩. Kamberikhon, তারপর Tilogrammon নামে নগর, ৪. Pesudostomon (False mouth) এবং সর্বশেষে পূর্বতম মোহনা ৫. Antibole (Thrown back)। নলিনীকান্ত ভট্টাশালী এই মোহনাগুলোকে যথাক্রমে ১. তাম্রলিপ্ত নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর মুখ, ২. আদিগঙ্গা বা রায়মঙ্গল হাড়িয়াভাঙ্গা মুখ, ৩. কুমার হরিণঘাটা মুখ, ৪. দক্ষিণ সাহাবাজপুর মুখ এবং ৫. সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম মধ্যবর্তী আড়িয়াল খাঁ নদীর নিম্নতম প্রবাহ মুখ বলে মনে করেন।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মনে করেন ১. কালিদাস কথিত কপিলা বা বর্তমান কাসাইর মুখ, ২. ভাগীরথীর সাগর মুখ, ৩. কুমার-কুমারক-হরিণঘাটা মুখ, ৪. পদ্মা-মেঘনার সম্মিলিত প্রবাহ মুখ, ৫. বুড়িগঙ্গা মুখই যথাক্রমে টলেমি কথিত গঙ্গার পঞ্চমুখ।

ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, টলেমির নক্সা ও বিবরণ নানা দোষে দুষ্ট এবং সর্বত্র সকল বিষয় খুব নির্ভরযোগ্য নয়। তাই তাঁর ব্যবহৃত নক্সায় নামগুলো নিশ্চিত করে কোনও স্থান নির্দেশ করে তা বলা শক্ত। তাঁর Megha মেঘনাও হতে পারে। সাহাবাজপুর তো খুবই পরিচিত এবং মেঘনার খুবই কাছে।

গ্রেইয়াস জুলিয়াস সেলিনিয়াস তৃতীয় শতকের একজন লেখক। 'পলিহিস্টর' নামে সমসাময়িক কালের ওপর একটি বই তিনি লেখেন। ঐ বইতেও 'বঙ্গরিডি'র কথা বলা আছে।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত ক্রীট দেশীয় প্রত্নতত্ত্বসমূহ থেকে আমরা তা নিশ্চিত হতে পারি। এ বাণিজ্য অনেককাল আগে থেকে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[১৫] টমাস ওয়াটের মানচিত্রে পূর্বভারতীয় অঞ্চলের তিতাস ও গোমতী নদীর গতিপথ এবং এর দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্রের অবস্থান দেখানো হয়েছে। শ্রীক্ষেত্রের অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন চাঁদপুর ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে শ্রীক্ষেত্র গঠিত ছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেটের জলাভূমিসহ সিলেট জেলাই ছিল তখনকার দিনের শ্রীক্ষেত্র। পর্তুগিজ নাবিক জন ডি ব্যারোসের মানচিত্রে (১৫৬০) আমরা প্রথম ট্রপর অবস্থান দেখতে পাই। নদী তীরে অবস্থিত এই ট্রপকেই ত্রিপুরা বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

স্যামসং ডি আরবিলের মানচিত্রে (১৬৫২) ঢাকার পূর্বে সিলেটের দক্ষিণে এবং বেঙ্গালার উত্তরে ট্রপর অবস্থান দেখানো হয়েছে। 'কস্মিন' ও 'কেওড়' নদী দুটির মধ্যবর্তী এলাকায় এই ট্রপর অবস্থান।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে 'ভন ডেন ব্রুক' একটি মানচিত্র তৈরি করেন। এই মানচিত্রে মেঘনার বর্তমান প্রবাহ ছাড়াও দক্ষিণে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে আর একটি বিশাল ধারা বঙ্গোপসাগরে পতিত হবার চিহ্ন অঙ্কন করা হয়েছে।

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মেজর রেনেলের জরিপ করা মানচিত্রে ত্রিপুরা, চাঁদপুর এবং কুমিল্লার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মেজর রেনেল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল।

অবস্থান

৯০°৩১´ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ৯০°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৩°১০´ উত্তর অক্ষাংশ ও ২৪°১৬ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমার পূর্ব গোলার্ধের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত। সাড়ে ২৩° উত্তর অক্ষাংশ চান্দিনার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। অক্ষাংশেই কর্কটক্রান্তি রেখা।

চট্টগ্রাম বিভাগের অধীন কুমিল্লা জেলার উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ফেনী, পূর্বে ভারত, পশ্চিমে মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুর।

আয়তন ও লোকসংখ্যা

কুমিল্লা জেলার আয়তন ৩০৮৫ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৪০,৩৩,০০০ জন। ২০০১ সালে ৪৫,৯৬,০০০ জন এবং ২০০৮ সালে ৪৯,৩৪,০০০ জন প্রায়।

জলবায়ু

কুমিল্লা জেলা সর্বতোভাবে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কর্কটক্রান্তি রেখা কুমিল্লা জেলার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এ জেলায় বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৮০ ইঞ্চি থেকে ১২০ ইঞ্চি। গ্রীষ্মে কালবৈশাখী এবং বর্ষাকালে বিশেষ করে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত তেমন একটা হয় না। শীতকালটা মোটামুটিভাবে শুষ্ক। গড় তাপমাত্রা ৭৮.৭° ফারেনহাইট। মে মাসে তাপমাত্রার গড় ৮৬° ফারেনহাইট। শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ৬৬° ফারেনহাইট। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে এপ্রিল-মে মাসে, যার পরিমাণ ১০৭° ফারেনহাইট। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ৪২° ফারেনহাইটেও নেমে আসে। কুমিল্লা জেলার আবহাওয়া ও জলবায়ু আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর।

জেলা সৃষ্টি

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি ত্রিপুরাকে দু' ভাগে ভাগ করে। এর এক ভাগের নাম ছিল চাকলা রৌশ-নাবাদ। এর দায়িত্বে থাকেন ত্রিপুরা রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ রেসিডেন্ট। অপরভাগ ছিল ত্রিপুরা ও নোয়াখালী। এই অংশের দায়িত্ব ছিল ঢাকার রাজস্ব কর্মচারীদের হাতে। ১৭৮১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরাইল ব্যতীত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা সদর (বর্তমান কুমিল্লা জেলা), চাঁদপুর জেলা এবং বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা নিয়ে একটি জেলা গঠন করে। এ জেলার নাম দেয় জেলা টিপাড়া (Tippera) অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলা। পুরাতন দলিল দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় ত্রিপুরা জেলা বলতে সমগ্র জেলাকেই বুঝানো হতো। কিন্তু টিপাড়া প্রোপার (Tippera) বলতে চাকলা রৌশনাবাদকেই বুঝাত। ইংরেজদের দলিল দস্তাবেজে এই জেলার নাম রোশনাবাদ ত্রিপুরা দেখা যায়। ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত এটিই ছিল মূলত 'রাজস্ব জেলা'। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের জন্যই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় এ জেলার স্বীকৃতি ছিল।

১৭৯০ সালে এটিকে প্রশাসনিক জেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। এর আগে পর্যন্ত এটি ঢাকা প্রশাসনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩০ সালে ছাগলনাইয়া থানা ব্যতীত নোয়াখালী জেলার বাকি অংশ ত্রিপুরা থেকে আলাদা করা হয়। ১৮৩১

সালে সরাইলকে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া ১৮৭৬ সালে ছাগলনাইয়াকে ত্রিপুরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নোয়াখালীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক অবধি গজারিয়া ত্রিপুরার অধীন ছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে এটিকে ত্রিপুরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঢাকা জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ পাকিস্তান আমলেরও কিছু সময় এ জেলা (কুমিল্লা) ত্রিপুরা জেলা হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬০ সালে এক প্রশাসনিক আদেশে এ জেলার নামকরণ করা হয় কুমিল্লা জেলা। তখন কুমিল্লা জেলায় ৪টি মহকুমা ছিল। কুমিল্লা সদর উত্তর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর। পরে ১৯৮৪ সালে কুমিল্লা সদর উত্তর ও সদর দক্ষিণকে নিয়ে বর্তমান কুমিল্লা জেলা গঠন করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর মহকুমাকে আলাদা জেলায় উন্নীত করা হয়।

ঐ সময় কুমিল্লা জেলায় ১০টি থানা ছিল। যথা : কোতয়ালী, বুড়িচং, বরুড়া, চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, চান্দিনা, দেবীদ্বার, মুরাদনগর, দাউদকান্দি ও হোমনা। এই থানাগুলোকে ১৯৮৩-৮৪ সালে মহকুমা বিলুপ্তির পরে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং রাজস্ব আদায়ভিত্তিক একটি উন্নয়ন প্রশাসন ইউনিট হিসেবে উপজেলাগুলোকে থানার ওপরে স্থান দেয়া হয়। বর্তমানে কুমিল্লা জেলায় ১৬টি উপজেলা রয়েছে।

কুমিল্লা নামের উৎপত্তি

ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক দু'কারণেই স্থানের নামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এখানে দেখবার বিষয় কতটা এলাকা এবং প্রাচীনত্ব নিয়ে নামটি টিকে আছে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট রাজ্যে আসেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কিয়া-মল-ঙ্কিয়া' (Kiamolonkia) নামের এক স্থানের কথা বলেছেন। স্থানটির অবস্থান নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, এ স্থান সমতট রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণভাগে সাগর তীরবর্তী দেশ। ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কামরূপ, কাম্বোজ, কামতা, কুমিল্লা প্রভৃতি নামের কাম বা কম শব্দগুলো আর্যভাষার পদ নয়। এগুলো হচ্ছে অনার্য জাতির নাম। তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যুষিত প্রদেশের নামকরণ হয়েছে।[১৬]

কুমিল্লার অপর নাম কমলাঙ্ক বলে জানা যায়। অতিপ্রাচীনকালে বর্তমান কুমিল্লা জেলার দক্ষিণাংশের সঙ্গে কলিঙ্গদেশের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন এবং এরা মনে করেন এক সময় এটি দ্রাবিড় ভাষাভাষী কলিঙ্গদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাঁদের ধারণায়, কলিঙ্গরা এ স্থানটিকে 'কমলিঙ্ক' নামে অভিহিত করেন এবং এই কমলিঙ্ক নামটিই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে 'কমলাঙ্ক'-এ পরিণত হয়ে থাকবে।[১৭] কলিঙ্গকে এরা কমলিঙ্ক নামের সংক্ষিপ্তরূপ বলে বিবেচনা করেন। বাস্তবে তা নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে

প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য, ভারতবর্ষের পূর্ব বিভাগের কমিলা (কুমিল্লা), চট্টল (চট্টগ্রাম) এবং আরাকান লইয়া দ্রাবিড়দিগের ত্রিকলিঙ্গ রাজ্যের একটি উপ-বিভাগ সৃষ্টি হয়। 'কমিলা' নামটি এখানে স্বতন্ত্র অন্যকোনো নামের বৃহৎরূপ নয়।

ইংরেজ আমলে নামটি 'কুমিল্লা' রূপে ছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ভগচ্চন্দ্র বিশারদ 'ত্রিপুরা সংবাদ' সংস্কৃত গ্রন্থে 'কুমিল্লা নামপুর বিবরণম' পরিচ্ছেদে কুমিল্লা নামকরণের একটি বিবরণ তুলে ধরেন। এতে আছে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধন্যমাণিক্য ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। এসময় গৌড়ের অধীশ্বর হোসেনশাহের সেনানায়ক 'কোমিল্ল' এই স্থান অধিকার করে বসতি স্থাপন করেন। সে থেকে তার নামে কুমিল্লার নাম।

মধ্যযুগে নাথসাহিত্যে 'কমলাঙ্ক' নামটি কোথাও কোথাও 'কমলাক' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলে কুমিল্লা নাম শুধু সদর মহকুমা এবং জেলা শহরেই ব্যবহৃত হতো। জেলার নাম ছিল ত্রিপুরা। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নাম চালু ছিল।

ওপরে বর্ণিত তথ্যাদি থেকে 'কুমিল্লা' নামের উৎপত্তির ধারাবাহিকতাটি এরকম : ক্রিয়া-তল-ক্কিয়া> কমলিঙ্ক> কমলাঙ্ক> কমলাক> কমিলা> কোমিল্ল> কুমিল্লা।

আন্দাজ করা যায় বর্তমান বানানটি ব্রিটিশদের কুমিল্লা = Comilla।

ত্রিপুরা নাম এল কী করে

১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর ত্রিপুরার পরিবর্তে 'কুমিল্লা' নামটি চালু হয়ে যায়।

কুমিল্লার পূর্ব সীমান্তে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। ব্রিটিশ আমলে কুমিল্লা জেলার কিছু অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজমালায় বলা হয়েছে, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্য কিরাতের (ত্রিপুরা রাজ্যের) রাজা ছিলেন। তাঁর বংশের 'ত্রিপুর' নামক এক পরাক্রমশালী রাজার নামে 'ত্রিপুরা' নামের উৎপত্তি।

কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা গ্রন্থের উপক্রমণিকা অংশে বলা হয়েছে 'তদন্ত' কিরাতভূমি 'তৃপুরা আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। এই তৃপুরা শব্দ হতে ক্রমে ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি হয়।

ত্রিপুরার ভূতপূর্ব কালেক্টর Sutherland 'Calcutta Review' পত্রিকায় ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি-ইতিহাস প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাসুর হতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিংবা ত্রিপুরাসুর নির্মিত তিনটি পুরী হতে ত্রিপুরা নামের উদ্ভব;

অথবা ভগবতী ত্রিপুরা সুন্দরী হতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি কিংবা রাজবংশের স্থাপনকর্তার নামানুসারে এই দেশ ত্রিপুরা আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে একমত মনে হয়েছে। স্মার্ট, ক্যাপটেন লেউইন, হান্টার প্রভৃতি ইংরেজ লেখকরা তাঁদের গ্রন্থে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ এই মতকে অযৌক্তিক মনে করেন। তিনি বলেন, অনার্য কিরাতদেরকে আমরা 'তিপ্রা' আখ্যায় পরিচিত করে থাকি। তাদের জাতীয় ভাষায় 'জল'কে 'তুই' বলে। এই 'তুই' শব্দের সঙ্গ 'প্রাহ' যুক্ত করে 'তুইপ্রাহ' শব্দ গঠিত হয়। সে 'তুইপ্রাহ' থেকে তিপ্রা, এবং তিপ্রা হতে ক্রমে তৃপুরা> ত্রীপুরা ও ত্রিপুরা শব্দের উৎপত্তি। তিনি আরও বলেন এই 'তুই' শব্দ সংস্কৃত 'তোয়' শব্দের অপভ্রংশ কিনা তা বিশেষ বিবেচ্য। কারণ ত্রিপুরা জাতির পূর্ব ও দক্ষিণদিকবাসী কুকি, কুইমি, মুর, খেয়াং, বঞ্জুগী ও পংখু জাতি জলকে 'তুই' বা তোয় বলে। কেবল সিন্ধুগণ 'তি' বলে থাকে। সিন্ধুগণ দ্বারা 'তিপ্রা' নামকরণও বিচিত্র নয়। তিনি আরও বলেন, চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত সি-উ-কি গ্রন্থে কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) সাগরবর্তী দেশ বলে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় অনার্য কিরাতগণ এই জল অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী দেশকে 'তুইপ্রা' আখ্যা প্রদান করেছিল।

বার্মার প্রাচীন ইতিহাস মহারাজোয়াং গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্য পট্টিকারা দ্বারা আখ্যায়িত হয়েছে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে ত্রিপুরাকে হুরতং লেখা হয়েছে। প্রাচীন মুসলিম ঐতিহাসিকেরা ত্রিপুরাকে জাজনগর বা জাজীনগর বলেছেন।

অন্যমতে, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীর দেহের একাংশ এ রাজ্যে পতিত হলে এখানে ত্রিপুরেশ্বরী মহাপীঠ গড়ে ওঠে। এর থেকে ত্রিপুরা নামের উদ্ভব।

আরেকটি মত আছে, অনার্য কিরাতগণ ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করতো। এরা পরবর্তীকালে 'তিপ্রা' নামে পরিচিত হয়। তাদের ভাষায় পানিকে বলা হয় 'তুই'। তুই শব্দের সঙ্গে 'প্রা' যুক্ত হয়ে 'তুইপ্রা' যা ত্রিপুরা (তুইপ্রা> তিপ্রা> তৃপুর> ত্রীপুরা> ত্রিপুরা) শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। শেষোক্তটি অধিকগ্রহণযোগ্য বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থে 'ত্রিপুরাসুরের' নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরা + অসুর = ত্রিপুরাসুর। 'আসুর' অনার্য দেবতা। 'পুরাণ' ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে 'অসুর' এর প্রতি নিন্দা আছে, আছে প্রশস্তিও। আর্য গ্রন্থসমূহেও এরূপ লক্ষ করা যায়।

১. Sir Charles Leyll's Principles of Geology- Vol.1. Page-470

২. দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবিরা : সীরাস্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ। বঙ্গাঙ্গ মাগধামৎসাঃ সমৃদ্ধা কাশি কৌশলাঃ

॥ অযোধ্যা কাণ্ড-১০ম সর্গ।

৩. বঙ্গানুত্স্বায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচস্বান্ জয়স্তম্ভান গঙ্গাস্রোতোৎসারেষু সঃ ॥

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ (বাংলা একাডেমী, ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ১৯৯৪), পৃ. ১৩।

৫. Mayaslhanes 'Indica Hlisstrated with a map of Ancient India by J.W.Mc. Crindle MA.

৬. চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেব বর্মা তত্ত্বনিধি, পৃ. ২২।

৭. Journal of Asiatic Society of Bengal (Prkgita) P. 108-109 (1899).

৮. Mc. Crindle, P. 192.

৯. Mc. Crindle, P. 192.

১০. কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, জেলা পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত-পৃ:১

১১. A History of civilization of ancient India, R.C. Datta Paye.501-502.

১২. চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, পৃ: ২৪

১৩. ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, শ্রী কেদারনাথ মজুমদার পৃ:১৬

১৪. ড. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭।

১৫. Mc Crindle, P. 194-195.

১৬. সবুজপত্র শ্রাবণ ও আশ্বিন, ১৩৩৩ বাংলা।

১৭. রাসমোহন চক্রবর্তী ও আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, কুমিল্লার ইতিহাস, পৃ. ৮৮।

ভূতাত্ত্বিক এবং ভৌগোলিক বিবরণ

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন হয়েছে ভূতত্ত্ববিদদের মতে প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন যুগে। কুমিল্লা জেলার প্রাচীন শিলাভূমি পাওয়া গেছে লালমাই পাহাড়ের গভীরে। এটিকে মায়োসীন যুগের শিলা বলে সনাক্ত করা হয়েছে। মায়োসিন যুগের বয়স তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি বৎসর বলে ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা। ভূতত্ত্ববিদদের মতে প্রায় ৬০ কোটি বছরেরও অধিককাল আগের আর্কিয়ান (Archian Rocks) যুগের শিলা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে রয়েছে। তবে তা হাজার হাজার ফুট পলির নিচে। এই পলিমাটি 'টারশিয়ারি' (Tertiary) যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকালের সঞ্চয় বলে এরা মনে করে। টারশিয়ারি যুগের বয়সও ৭ থেকে ৪ কোটি বছর বলে পণ্ডিতদের ধারণা। তাঁদের মতে 'প্যালিওসিন' (Paleocene), প্রায় ৬ কোটি বছরের পুরাতন 'ইওসিন' (Eocene), প্রায় ৪ কোটি বছরের প্রাচীন 'অলিগোসিন' (Oligocene), প্রায় প্রায় ২.৫ কোটি বছরের প্রাচীন 'মাইওসিন' (Miocene) ও প্রায় ১.২ কোটি বছরের 'প্লাইওসিন' (Pliocene) প্রভৃতি যুগ এই চারশিয়ারি যুগের মধ্যে পড়ে।

ধারণা করা হয় সমগ্র বাংলাদেশে প্রাচীন আর্কিয়ান যুগ থেকে শুরু করে কয়লা উৎপাদনকারী 'কারবনিফরাস' (Carboniforous) যুগ পর্যন্ত স্থলভাগে বিদ্যমান ছিল। ধারণা করার কারণ এই যে, বিভিন্ন অঞ্চলে 'গন্ডোয়ানা' (Gondwanas) নামে অধিক পরিচিত 'পারমিয়ান' (Permian) শিলা প্রাচীন আর্কিয়ান শিলার ঠিক ওপরের স্তরেই অবস্থিত। পারমিয়ান যুগের বয়স ২২.৫ থেকে ৩৫ কোটি বছর হবে বলে ভূতত্ত্ববিদদের অভিমত। এ সময় খাল-বিল সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে ২২ থেকে ৭ কোটি বছর আগেকার 'মেসোজয়িক' (Mesojoic Era) যুগে নীলা কয়লায় রূপান্তরিত হয়।

ক্যাম্ব্রিয়ান (Camprian Era) বা জোরাসিক (Jurasic Era) যুগের শিলার নমুনা বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়নি। অলিগোসিন শিলাও বাংলাদেশের কোথাও পাওয়া যায়নি।

ভূতত্ত্বগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বকোণে কতগুলো ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের সৃষ্টি হয় : পূর্বদিকে মায়ানমারের 'আরাকান ইয়োমাই ফোল্ডেড সিসটেম' (Arakan Comai Folded System), উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'শিলং মাসিফ' (Shillong Massif), উত্তর-পশ্চিমে 'হিমালয়ান ফোরডিপ' (Himalayan Foredeep) এবং পশ্চিমে 'ইন্ডিয়ান প্লাটফর্ম' (Indian Platform)।

ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'পূর্ববাংলা একান্তই নবভূমি'। এই ভূমি পদ্মা-

ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা-মেঘনার সৃষ্টি। এই নবভূমির উত্তরে, পূর্বে এবং পূর্ব-দক্ষিণে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণী। এদের অব্যবহিত সানু ও তলদেশ পার্বত্য না হলেও কোথাও কোথাও গৈরিক বালুকাময়, কখনও কখনও বালির শক্ত স্তরময়, যেমন চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা শ্রীহট্ট-কাছাড় জেলার উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশে হালিয়াকান্দি অঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাঞ্চলকে মোটামুটি পুরাভূমির অন্তর্গত বলতেই হয়। পূর্ব বাংলার অন্য সমস্ত ভূমিই জলীয় সমতল ভূমি অর্থাৎ নবগঠিত ভূমি এবং সর্বত্র খালবিল ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। কিন্তু তা হলেও এই নবগঠিত ভূমির দুটি বিভাগ সুস্পষ্ট। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের বহুলাংশের গঠন পুরাতন (Old formation) এবং খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালী ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন (New formation)।

তবে এসব সমতল অঞ্চলের গঠন অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বলে এসব ভূখণ্ডে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় একটি চিহ্ন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ প্রাচীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টলী (৮ম শতক) এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত অগণিত লিপি ও মূর্তি কুমিল্লার প্রাচীন অর্থকেই নির্দেশ করে।[১]

অবিভক্ত বাংলার ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়াকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন ভূতত্ত্ববিশেষজ্ঞরা : (১) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণরায় অঞ্চল, (২) বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, জলপাইগুড়ি, দারজিলিং ও কোচবিহার প্রভৃতি জেলা নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, (৩) বাংলাদেশের খুলনা, বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলা নিয়ে গঠিত দক্ষিণাঞ্চল, (৪) ফরিদপুর জেলা ব্যতীত ঢাকা বিভাগের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, এবং (৫) সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল।

বলাবাহুল্য দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কুমিল্লা জেলার অবস্থান। কুমিল্লা জেলার ভূমিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) লালমাটি দ্বারা গঠিত প্রাচীন-ভূমি, (২) পলি দ্বারা গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ও উঁচুভূমি ও (৩) বিভিন্ন নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত নিম্নভূমি।

লালমাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমির গঠন নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বেশিরভাগ ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন প্রায় ১৮ লক্ষ বছর আগে প্লাইস্টোসিন যুগে শুরু হয়ে প্রায় ১০ হাজার বছর আগেকার হলোসিন যুগে ভূ-গাঠনিক আন্দোলনজনিত কারণে বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মতো কুমিল্লা লালমাই, ময়নামতি এবং চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি এলাকার ভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

তবে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকা বাদ দিলে লালমাইয়ের বাকি এলাকা মূলত সমভূমি অঞ্চল। সেদিক থেকে ভূতাত্ত্বিক নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করে কুমিল্লা জেলার ভূমি অঞ্চলকে তিনটিভাগে ভাগ করা হয়েছে : (ক) লালমাই সমভূমি, (খ) চান্দিনা সমভূমি ও (গ) মেঘনা প্লাবনভূমি।

ক. লালমাই সমভূমি : হবিগঞ্জ জেলার শাহজীবাজার থেকে ফেনী জেলা পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের পশ্চিম দিকটা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। বলা হয় কসবাকে ডান পাশে রেখে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের ডান পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে দীঘলগাঁয়ের কাছ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বাঘমারার কাছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে দত্তসারে শেষ হয়েছে এই অঞ্চলের সীমারেখা। ত্রিপুরা পাহাড়ের পশ্চিমাংশের মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিম্নাংশে জমে জমে কালক্রমে লালমাই সমভূমির সৃষ্টি হয়। এই পাহাড়ে উৎপন্ন নদী ও খাল এবং অসংখ্য ছড়া বর্ষার প্রবল বর্ষণে পলি, কাদা, বালি ও নুড়ি বহন করে নিচে নিয়ে আসে। স্রোতের বেগ কমলে প্লাবিত এলাকায় এগুলো জমতে শুরু করে। এগুলোই কালক্রমে সমভূমির সৃষ্টি করে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।

খ. চান্দিনা সমভূমি : লালমাই সমভূমির পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে প্রলম্বিত চান্দিনা সমভূমি। চান্দিনার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। মরগ্যান এবং ম্যাকিনটায়ার (Morgan & Mcintire) চান্দিনা সমভূমিকে ত্রিপুরা সারফেস (Tippera Surface) নামে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও তিতাসের পলি দ্বারা গঠিত এই সমভূমি।

গ. মেঘনা প্লাবনভূমি : চান্দিনা সমভূমির পশ্চিমে এই অঞ্চলের অবস্থান। মেঘনা প্লাবনভূমি বলা হলেও মেঘনা, তিতাস, ডাকাতিয়া এবং গোমতি নদী বাহিত পলি ও কর্দম দ্বারা এই প্লাবনভূমি গঠিত। এই অঞ্চলের প্রায় সবটাই অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি। বর্ষাকালে বিশাল এলাকা জলমগ্ন থাকে। কখনো কখনো গ্রামগুলোও প্লাবিত হয়।

নদ-নদী

কুমিল্লা জেলার ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং ভৌগোলিক নিয়ামকগুলোর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দুটি নদীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এ দুটি নদী হলো মেঘনা এবং গোমতি। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলো উপনদী ও শাখানদী। রয়েছে অসংখ্য খাল ও বিল। নদী ও উপনদীগুলো ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড় থেকে নির্গত হয়েছে। উপনদী এবং খাল-বিলের ভৌগোলিক প্রভাবও এ জেলার জনজীবনে কম নয়।

মেঘনা নদী

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভন ডেন ব্রুক (Von Den Brouck) যে মানচিত্র তৈরি করেন তাতে দেখানো হয়েছে মেঘনা নদীর বর্তমান প্রবাহ ছাড়াও আরও একটি বিশাল ধারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ দিক থেকে সোজা দক্ষিণে গিয়ে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এতে মনে হয় মেঘনা নদী বহুবার তার গতি পরিবর্তন করেছে। পণ্ডিতেরাও মনে করেন বর্তমান মেঘনা যে ধারায় প্রবাহিত অতীতে তা ছিল না।

ভারতের আসাম ও মেঘালয় পর্বত থেকে অনেকগুলো নদী উৎপন্ন হয়ে সিলেট ও কিশোরগঞ্জ জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের কাছে এসে মিলিত হয়। ভৈরব বাজারে এসে প্রবাহিত ও মিলিত ধারাটির নাম হয়ে যায় মেঘনা। ভৈরব থেকে প্রবাহিত হয়ে এই ধারাটি নরসিংদী পার হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লার মাঝখানে মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুর অবধি এই ধারা চলমান। মুন্সীগঞ্জের কাছে এসে এই ধারার সঙ্গে পদ্মা (গঙ্গা) মিলিত হয়। পরে চাঁদপুরের ওপর দিয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা স্পর্শ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। মেঘনা নদী হোমনা উপজেলার পূর্ব সাগুটিয়া, রাধানগর, চন্দনপুর, উত্তর ও দক্ষিণ জগতপুর, বরকান্তা, গোবিন্দপুর, দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারি প্রভৃতি ইউনিয়নের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। মেঘনা নদীর জলধারার প্রভাবে হোমনা ও দাউদকান্দি এই অঞ্চলগুলো বেশিরভাগ সময় জলনিমগ্ন থাকে। এই অঞ্চলে জীবনযাত্রা মেঘনা নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

গোমতি নদী

গোমতি নদী ত্রিপুরার তিচনা নামক ঊর্ধ্বভাঁজ থেকে উৎপন্ন। ত্রিপুরার ভেতর দিয়ে এটি প্রবাহিত হয়ে বিবিরবাজারে এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বিবিরবাজার কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। বিবিরবাজার থেকে প্রবাহিত হয়ে কুমিল্লা শহরের উত্তর দিক দিয়ে (এক সময় শহরটি গোমতি নদীর তীরে ছিল) এটি জাফরগঞ্জ, দেবীদ্বার ও মুরাদনগর পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকে এরপর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে দাউদকান্দির নিকট কলাতিয়া নামক মেঘনার এক শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে প্রবাহ বিস্তৃত হয়ে মোহনার রূপ নিয়েছে। বর্ষাকালে এই নদীতে প্রচুর পরিমাণে পাহাড়ি পানি নেমে আসে। সঙ্গে আনে পলি ও বালি। উজানে এই নদীর দু' তীরে বাঁধ তৈরি করায় নদীবাহিত পলিমাটি বর্তমানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না বলে নদীর গভীরতা নষ্ট হয়ে ভাটিতে নদীর ধারা অনেক প্রসারিত হয়েছে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের পৃথিবী সূর্যের সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কী করে হল– এ প্রশ্ন প্রায় সব মানুষের। জর্জ গ্যামো নামে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী বলেন, প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়। এই যে ব্যাখ্যা বা থিয়রি একে বলা হয় বিগ ব্যাং (Big Bang)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটি ঘটেছিল বিশ বিলিয়ন বছর আগে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পদার্থ খণ্ডগুলো প্রচুর তাপমাত্রা নিয়ে ঘুরতে থাকে। বড়টিকে ঘিরে ছোটগুলো। আমাদের পৃথিবী এরকম একটি। পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আজকের অবস্থায় আসতে কয়েকশ কোটি বছর লেগে যায়। শিশু-কিশোরদের প্রিয় লেখক এবং বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর বই 'একটুখানি বিজ্ঞানে' বলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্মের পর বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূগঠনের ক্ষেত্রে এ সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীটা যে প্রথমে শক্ত শিলায় পরিণত হয়েছিল এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কালক্রমে এ শক্ত শিলা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতি ভূপ্রাকৃতিক কারণে (ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, ঝড়-বৃষ্টি, প্লাবন) পলিমাটির সৃষ্টি করে। টিকে থাকবার পরিবেশ পেয়ে পানি থেকে সৃষ্ট জীব স্থলভাগে উঠে আসে। ক্রমে গাছ-পালা আর প্রাণীদের আবাসস্থলে পরিণত হয় সবুজ পৃথিবী।*

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১০৩।

* মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে এক সেকেন্ড প্রায় পাঁচশ বৎসর, নিখুঁতভাবে বলতে গেলে ৪৭৫ বৎসর। একদিন হচ্ছে চল্লিশ মিলিয়ন বা চার কোটি বৎসর। আর এক বৎসরে ক্যালেন্ডারে–

ক. বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি : জানুয়ারি ১ তারিখে।

খ. আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি, ছায়াপথ নামের এই গ্যালাক্সির জন্ম সে মাসে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পর পাঁচ মাস সময় লেগে যায় গ্যালাক্সিগুলোর সৃষ্টিতে।

গ. সৌরজগতের জন্ম সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে। গ্যালাক্সিগুলোর জন্মের পর চার মাস সময় লেগেছে সৌরজগতের জন্ম হতে।

ঘ. পৃথিবীর জন্ম সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ। সৌরজগৎ জন্ম নেয়ার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় পৃথিবীর জন্ম।

ঙ. সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে পৃথিবীতে প্রথম আদিম প্রাণের বিকাশ শুরু পৃথিবীর জন্মের মাত্র দু'সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যেই।

চ. প্রাচীনতম পাথরের জন্ম ২ অক্টোবর। এটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ছ. ব্যাক্টেরিয়া এবং নীল সবুজ এলজি উদ্ভব ৯ অক্টোবর।

জ. জন্ম প্রক্রিয়ার জন্য ভিন্ন লিঙের উদ্ভব ১ নভেম্বর।

ঝ. সালোক-সংশ্লেষণ করতে পারে এ-রকম গাছের জন্ম নভেম্বরের ১২ তারিখ।

ঞ. উন্নত প্রাণীর জন্য নিউক্লিয়াসসহ কোষের আবির্ভাব ১৫ নভেম্বর।

মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারে নভেম্বর মাস শেষ হতেই ডিসেম্বরে পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করে–

ডিসেম্বর ১ পৃথিবীতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের শুরু।
ডিসেম্বর ১৬ কেঁচো জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর ১৭ মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিকাশ।
ডিসেম্বর ১৮ সামুদ্রিক প্লাংকটন, শামুক জাতীয় ট্রাইলোবাইটের জন্ম।
ডিসেম্বর ১৯ প্রথম মাছ এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর ২০ পৃথিবীর স্থলভাগ গাছ দিয়ে ঢেকে যেতে শুরু করে।
ডিসেম্বর ২১ পোকা মাকড়ের জন্ম।
ডিসেম্বর ২২ প্রথম উভচর প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর ২৩ বৃক্ষ ও সরীসৃপের জন্ম।
ডিসেম্বর ২৪ ডাইনোসরের জন্ম।
ডিসেম্বর ২৬ স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম।
ডিসেম্বর ২৭ প্রথম পাখির জন্ম।
ডিসেম্বর ২৮ ডাইনোসরের নিশ্চিহ্ন হওয়া শুরু (চার দিন পর!)
ডিসেম্বর ২৯ বানর জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব।
ডিসেম্বর ৩০ বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্ম।

ডিসেম্বর ৩১ পৃথিবীতে প্রথম মানুষের জন্ম। [রাত ১০.৩০ মিনিটে, রাত ১১টায় পাথরের অস্ত্র ব্যবহার, ১১.৪৬ আগুন আবিষ্কার, রাত ১১.৫৯ ইউরোস্কো গুহায় মানুষের ছবি আঁকা, ১১.৫৯.২০ সেকেন্ডে চাষাবাদ শুরু, ৩৫ সেকেন্ডে নগর সৃষ্টি, ৫০ সেকেন্ডে মিশর সভ্যতা, ৫২ সেকেন্ডে ব্যাবিলনের সভ্যতা, ৫৩ সেকেন্ডে কম্পাস আবিষ্কার, ৫৪ সেকেন্ডে লোহার ব্যবহার শুরু, ৫৫ সেকেন্ডে বুদ্ধের জন্ম ৫৬ যিশু খ্রিস্টের জন্ম, ৫৭ হযরত মুহম্মদের জন্ম, ৫৮ মায়া সভ্যতা, ৫৯ নতুন বিজ্ঞানের জন্ম, ৬০ বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশ।

প্রাচীন কালের রাস্তা-ঘাট

প্রাচীন কালে মানুষ পায়ে হেঁটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতো। রাজা বাদশারাও হাতি, ঘোড়া প্রভৃতিতে চড়ে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শোভাযাত্রা করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতেন। রাজা যে পথে চলাচল করতেন তাতো রাজপথ ছিলই আবার যে পথ তিনি নির্মাণ করে দিতেন তাও রাজপথ বলে বিবেচিত হতো। দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে এরকম একটি রাজপথের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙ এবং তাঁর আগে আসা ফা হিয়েন পদব্রজে এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে চলাচল করতে গিয়ে কয়েকটি বড় পথের সাক্ষাত পান। হিউয়েন সাঙ সমতটে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। এসব বর্ণনা দিয়েছেন বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করেই। তাঁর পরিভ্রমণে আন্তর্দেশীয় একটি বড় স্থলপথের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কজঙ্গল (উত্তর রাঢ়, বাকুড়া বীরভূমের কিয়দংশ) হতে গিয়েছেন পুণ্ড্রবর্ধনে (রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর), পুণ্ড্রবর্ধন হতে এক প্রশস্ত নদী পার হয়ে কামরূপ, কামরূপ হতে সমতট (ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল ও চব্বিশ পরগণার নিম্নভূমি), সমতট হতে তাম্রলিপ্তি, (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর), তাম্রলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিবাদ জেলার কালসোনা) এবং কর্ণসুবর্ণ হতে উড্র, কঙ্গদো ও কলিঙ্গ। পুণ্ড্রবর্ধন হতে কামরূপ, কামরূপ হতে সমতট পর্যন্ত দুটি সুদীর্ঘ পথ যে ছিল হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বঙ্গদেশ হতে পূর্বাভিমুখী একটি গুরুত্বপূর্ণ পথের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পথটি পূর্ব বাংলার ত্রিপুরা (বর্তমান কুমিল্লা জেলা) লালমাই-ময়নামতি (প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য) অঞ্চল হতে আরম্ভ করে সুরমা ও কাছাড় উপত্যকার (বর্তমান শ্রীহট্ট শিলচর) ভেতর দিয়ে লুসাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে মণিপুরের ভেতর দিয়ে উত্তর ব্রহ্মাদেশ ভেদ করে মধ্য ব্রহ্মদেশে পাগান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পট্টিকেরা রাজ্যের সঙ্গে ১১শ ও ১২শ শতকে ব্রহ্ম দেশের পগান রাষ্ট্রের খুব ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই দু' রাজ্যের মাঝখানে ছিল উল্লিখিত পথটি। তবে শ্রীহট্ট ঘুরে লুসাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে বার্মায় যাতায়াতের এই দীর্ঘ পথ তখনকার মানুষ কেন বেছে নিয়েছিল তা বোধগম্য নয়। কেননা কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আরাকানে যাবার একটি সহজ রাস্তাও বহুদিনের পুরনো। পণ্ডিতেরা মনে করেন এটি অতি সম্প্রতি কালের রাস্তা। কিন্তু ইতিহাসে জানা যায় দক্ষিণবাহী এই পথ চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের ভেতর দিয়ে নিম্নবার্মা বা প্রাচীন শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনুমানিক নবম থেকে একাদশ শতকে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আমলে এই রাস্তা নির্মিত হয়ে থাকবে। মধ্য যুগেও এই রাস্তা চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ আমলে শাহ্ সুজার সড়ক বলে রেনেলের

মানচিত্রে বিশাল প্রশস্ত এক রাস্তা চট্টগ্রাম অতিক্রম করে বার্মা গিয়ে পৌঁছেছে।

তাম্রলিপ্তি হতে আরাকান, বার্মা, মালয়, যবদ্বীপ হয়ে সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে সংযোগকারী একটি রাস্তার পরিচয় পাওয়া যায় একাদশ শতকে ও মধ্যযুগে। পণ্ডিতেরা মনে করেন এ পথটি সম্ভবত চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত ছিল। চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্র উপকূল হয়ে আরাকান এবং নিম্ন বার্মায় যাওয়া-আসার রাস্তার কথা বহু চীনা পরিব্রাজক উল্লেখ করেছেন। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের একটি লিপি মালয় উপদ্বীপে পাওয়া গেছে। এতে লেখা আছে রক্তমৃত্তিকা থেকে সমুদ্র পথে তিনি মালয়ে গিয়েছিলেন। ড. রায় মনে করেন এটি মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অথবা চট্টগ্রাম জেলার রাঙামাটি হতে পারে। শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। আমরা অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি এবং চট্টগ্রামের রাঙামাটি কেন, কেন নয় লালমাই। সে সময় কোনও রাঙামাটি বিখ্যাত জায়গা ছিল না। বিখ্যাত জায়গা ছিল লালমাই। রক্তমৃত্তিকা> লালমাটি> লালমাই) লালমাই-ময়নামতি থেকে স্থলপথে বঙ্গেপসাগরের দিকে অর্থাৎ চট্টগ্রামে যাওয়ার সহজ পথ ছিল। ড. রায় নিজেও এই বইয়ে আর এক স্থানে উল্লেখ করেন যে, হিউয়েন সাঙ-এর লো-চো-মো-চাই (রত্তমত্তি = রক্তমৃত্রিকা)। কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাটি বা লালমাই পাহাড়ও হতে পারে (এটাই কি শ্রীচন্দ্রের রামপাল ও ধূল্লালিপির লোহিতগিরি?) বৃহত্তর চট্টগ্রামের রাঙামাটি স্থানটি না হওয়ার কারণ এই যে, এটি সমুদ্র থেকে বেশ দূরে এবং পাহাড়ি পথ বড় বন্ধুর। সেখানে প্রাচীন কীর্তির কোন নিদর্শনও নেই। মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত লালমাই থেকেই সমুদ্র পথে মালয় গিয়েছিলেন।

খনিজ সম্পদ

ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক থেকে কুমিল্লা জেলার কোন কোন অংশ খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরের গঠন থেকে জানা যায় কুমিল্লা অঞ্চলে ৬টি উর্ধভাঁজের পরিচয় রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এগুলো সহজ ভাঁজ এবং হিমালয় পর্বতের তৃতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে সৃষ্ট। ভাঁজগুলো হলো : কচুয়া, দাউদকান্দি, তিতাস, বাখরাবাদ, লাইমাই ও কলাতিয়া। এই ভাঁজগুলোর মধ্যে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাখরাবাদের এই ভাঁজ থেকেই প্রচুর গ্যাস আহরিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও এ জেলার নোয়াপাড়া-দত্তসার (চৌদ্দগ্রাম) এলাকায় গ্লাস তৈরির বালি (Silikands) পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি লেন্সে ৩ লাখ টন গ্লাস বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সকল গ্লাস বালি ত্রিপুরা পাহাড়ের পাদদেশের সমভূমির ভূগর্ভে প্রচুর পরিমাণে স্তূপীকৃত অবস্থায় জমা আছে। এই বালিগুলো মূলত ভূগর্ভের পুরানা নদী-নালার বক্ষে পড়ে আছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার খুব বেশি দিনের নয় ৫০ শতকের। তবে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় ৬০-এর দশকে। বাংলাদেশের এই গ্যাস কবে থেকে মজুদ হয়ে আছে তা আমাদের জানা নেই। হয়তো বহুকাল আগে, পৃথিবী সৃষ্টিকাল

এখানে দেখা যায় বাখরাবাদ গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৯ সালে। এর থেকে বর্তমানেও গ্যাস উত্তোলন চলছে। এই গ্যাস জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউরিয়া সারের কাঁচামাল হিসেবে এই গ্যাসের ব্যবহার হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, শিল্প-কারখানা চালনা, মোটরগাড়ি চালনা ছাড়াও এই গ্যাস রন্ধন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাখরাবাদ থেকে চট্টগ্রামে গ্যাস লাইন সম্প্রসারণ করা হয়। এর ফলে চট্টগ্রামের শিল্প-কারখানায় গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত হয়। সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদনের আগে একচেটিয়াভাবে কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাখরাবাদের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাখরাবাদ গ্যাসের ভূমিকা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এই গ্যাসকে আরও অনেক কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে গ্যাসের ব্যবহার থেকে অপচয় রোধ করতে হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই গ্যাসের রিজার্ভ নিশ্চিত করতে হবে।

Natural Gas Reserves And Production

Reserve volume as on Nov,2005

SL NO	Fields	Discovery Year	Reserve Estimate		GIIP	Recoverable	Cumulative Production	Net Remaining Recoverable
			By	Year	PRV+ PROB	PRV+ PROB	Volume in BCF	Volume in BCF
A. Under Production								
1	Bakhrabad	1969	IKM	1992	1498 6	1049 0	648 9	400 1
2	Beanibazar	1981	IKM	1992	243 1	170 2	38 3	131 9
3	Habiganj	1963	HCU	2001	5139 0	3852 3	1 309 7	2 542 6
4	Jalalabad	1989	OXY	2000	1195 0	836 5	292 2	544 3
5	Kailashtila	1962	HCU	2001	2720 1	1903 3	353 9	1 549 4
6	Meghna	1990	IKM	1992	170 6	119 6	34 8	84 8
7	Narshingdi	1990	IKM	1992	307 2	215 1	61 5	153 6
8	Rashidpur	1960	HCU	2001	2002 0	1401 2	371 4	1.029 8
9	Sangu	1996	C/S	1997	1031 0	848 5	351 1	497 4
10	Saldanadi	1996	Bapex	1996	165 8	116 1	43 7	72 4
11	Sylhet	1955	PPL	1971	683 9	478 7	179 2	299 5
12	Titas	1962	HCL	2001	7325 0	5127 5	2468.7	2 658 8
13	Fenchuganj	1988	PB	1988	404 0	282 8	21 0	261 8
14	Maulavibazar	1997	Unocal	2000	448 9	359 6	27 1	332 5
15	Feni	1981	N/B	2000	185 2	129 6	52 3	77 3
Sub Total - A					23519 4	16 890 0	6,253 8	10 636 2
B. Non Production								
16	Begumganj	1977	PB	1984	46 7	32 7	0 0	32 7
17	Kutubdia	1977	PB	1985	65 0	45 5	0 0	45 5
18	Semutang	1969	PB	1981	227 0	150 3	0 0	150.3
19	Shahbazar	1995	Bapex	1996	664 3	465 6	0 0	465 6
20	Bibiyana	1998	D&M	2000	3144 5	2 400 8	0 0	2,400 8
Sub Total - B					4147 5	3 094 9	0 0	3,094 9
Sub Total – A +B					27666 9	19,984 9	6,253 8	13,731 1
C. Production Suspended								
21	Chattak	1959	N/B	2000	577 0	473 9	25 8	448.1
22	Kamta	1981	N/B	2000	71 8	50 3	21 1	29 2
Sub Total - C					748 8	524 2	46 9	477 3
Grand Total (A+B+C) in BCF					28 415 7	20 509 1	6,300 7	14 208 3
Grand Total (A+B+C) in TCF					28 415	20 509	6 558	13 952

C/S= Cairn/Shell N/B= Niko/Bapex

Reserves Based on HCU/NPD

Source · Petrobangla, Ministry of Power Energy and Mineral Resources

7.10 Category-wise number of new gas connection

Category	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	Year					
Power	4	6		3	2	2
Fertilizer	-	-	-	-	-	-
Industry	169	222	245	340	294	341
Commercial	414	460	630	595	721	881
Tea Garden		1	1	2	3	1
Brick Field	4	4	6	16	-	-
CNG Station	-	-	-	39	37	21
Domestic	75215	99684	107330	105610	97565	168938
Captive power				13	94	-
Total	75806	100377	108233	106618	98716	170184

Source Petrobangla Ministry of Power. Energy and Mineral Resources

7.11 Quantity And Value Of Production Of Natural Gas By Gas fields

(Qty in million cubic metre and value in '000' Taka)

Name of gas fields	2001-2002		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
Titas	3639	7496340	3800	7828006	3941	8118460	4210	13737230	4384	15120416
Habiganj	2432	5020220	3692	5545520	2980	613800	3007	981184	2814	9705486
Bakhrabad	354	72940	358	737480	358	737480	359	1171417	368	1234742
Feni	-							646074	303	1045047
Sylhet	54	111240	54	111240	56	115360		267566	163	562187
Kailastila	783	1161980	836	1722160	676	1392560	564	1840332	562	
Narshingdi	159	327540	157	323420	184	379040	215	701545	201	693249
Rashidpur	1059	2181540	1090	2245400	1034	2130040	904	2949752	813	2804037
Meghna	98	77760	66	135960	45	92700	34	110942	31	106919
Salda	140	288400	176	362560	160	329600	159	518817	152	524248
Beani Bazar	127	261620	220	453200	257	529420	214		179	617371
Sangu	1380	2842800	1467	3022020	1480	3048800	1341	437583	1573	5425277
Jalalabad	859	1769540	1010	2080600	1625	3347500	1961	6366711	1842	6353058
Fanjuganj					25	51500	338	110289	458	1579642
Moulovi Bazar							207	675441	1088	3752512
Total	11087	22839220	11926	24567560	12821	26411260	13783	44973929	14921	51462529

Source Petrobangla, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources

(I) ঘাস ও লতা গুল্ম

প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত ছোট ছোট গাছ জন্মে সেগুলো বুনো গাছপালা। সমস্ত গাছের মধ্যে কুমিল্লায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। ঘাসের মধ্যে দুর্বা (Cynodon dactylon), মুথা (Cyperus rotundas), চোরাকাটা (Chrysopogon aciculatus) ইত্যাদি বরেন্দ্র এলাকায় প্রধান। এছাড়াও অন্যান্য প্রধান প্রধান বুনো গাছের মধ্যে আছে কুঁচ (Colocasia esculenta), ভুই আকড়া (Evolvulus numularius), কাটানটে (Amaranthus spinosus), আপাঙ বা বিলাইখামী (Achyranthes aspera), গোহুড (Oplimenus compositus), হেলেঞ্চা (Enhydra fluctuans), ছোট কালকেসুন্দা (Cassia sophera), হাতিশুড় (Heliotropium indicum), বেরেলা (Sida cordifolia), ওল (Amorphophallus campanulatous), মুক্তাঝুরী (Acalypha indica), থানকুনী

(Centella asiatica), শেয়ালয়ার কাটা (Argemone mexicana), নটেশাক (Amaranthus viridis), কানশিরা বা ঢোলপাতা (Commelina bengalensis), হলুদ (Curcuma longa), বড় বির্নিশি (Fimbristylis dichotoma), ডোরাবিয়ারী (Setaria verticillata), গোথ বেগুন (Solanum torvam), আমরুল (Oxalis corniculata), ক্ষুদি ওকড়া (Chrozophora rotteir), বন ক্রোটন (Croton bonplandianum), লেয়ারি (Dichanthium annulatum), কেশুটি বা কেওটি (Eclipta alba), আলুঘাস (Glinus lotoides), বেনা বা গন্ধমূল (Vetiveria zizanioides), ঘেটকচু (Typhonium trilobatum), কন্টিকারী (Solanum surattense), ঈশ্বরমূল (Aristolochia indica), শতমূলী (Asparagús racemosus), তেলাকুচা (Coccinia cordifolia), ধুন্দল (Luffa cylindrica), অপরাজিতা (Clitoria tarnetea), স্বর্ণলতা বা আলোকলতা (Cuscuta reflexa), বিছুটি (Tragia involucrata), মাকাল (Trichosanthes bracteata), কলমি (Ipomea apuatica), বন কলমি (Ipomea maxima), মেটে আলু (Discorea alata)।

(II) ছোট গাছ বা গুল্ম

ছোট গাছ বা গুল্ম এক কালে কুমিল্লা অঞ্চলে প্রচুর ছিল বর্তমানে দেখা যায়, এমন ছোট গাছ বা গুল্মের মধ্যে প্রধানত ঢোল কলমি (Ipomea fistulosa), দাঁতুন গাছ (Glycosmis arborca), রং চিতা (Pedilanthus tithymaloides), জামালগোটা (Croton tiglium), তেসরামনসা (Euphorbia antiquorum), ফণিমনসা (Opuntia dillenii), এগেভ বা কান্ডালা (Agave americana), ঘেটু (Clerodendrum viscosum), নিশিন্দা (Vitex negundo), ভেরেন্ডা (Ricinus communis), সাদা ধুতুরা (Datura fastuosa), কালো ধুতুরা (Datura metel), বনবরই (Zizyphus oenoplca), শ্বেত আকন্দ (Calotropis procera), নোনা আতা (Anona reticulata), আতা বা শরিফা (Anona squamosa), কার্পাস (Gosyipium barbadense varacuminatum), পেঁপে (Carica papaya), লালকাটা (Caesalpinia crista), লাল ভেরেন্ডা (Jatropha gossypifolia), পেয়ারা (Psidium guajava), মানকচু (Alocasia indica), কুমারিয়া লতা (Smilax roxburghiana) অন্যতম।

(III) গাছ বা বড় বৃক্ষ

বর্তমানে বড় বৃক্ষরাজি কুমিল্লা অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায় না। তাল (Borassus flabellifer), নিম (Azadirachta indica), আম (Mangifera indica), কাঁঠাল (Artocarpus heterophyllus), খেজুর (Phoenix sylvestris) ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এ ছাড়াও বড় গাছের মধ্যে সজিনা (Moringa oleifera), চাম (Artocarpus chaplasha), কামিলা (Lannea coromandelica), বাবলা (Acacia

nilotica), খয়ের (Acacia catechu), বনবাঁশ বা বেরুয়া বাঁশ (Bambusa arundinacea), বড়বাঁশ (Bambusa balcooa), তল্লাবাঁশ (Bambusa longispiculata, Btulda), পিটালী (Trewia polycarpa), ডুমুর (Ficus hispida), মাদার (Erythrina variegata), শ্যাওড়া (Streblus asper), কুল (Zizuphus mauritiana), তেঁতুল (Tamarindus indica), বেল (Aegle marmelos), শিরিষ (Albizsia lebbeck), বান্দর লাঠি (Cassia fistula), চালতা (Derris indica), কদবেল (Feronia limonia), কদম (Anthocephalus chinensis), শিমুল (Bombax ceiba), জাম্বুরা (Citrus grandis), নারিকেল (Cocus nucifera), ফলসা (Grewia asisatica), জাম (Syzygium cumini), লিচু (Lithci chinensis), কাঁচাকলা (Musa paradisisaca), অশ্বত্থ (Ficus religiosa), বট (Ficus bengaslensis), মহুয়া (Madhuca indica), গাব (Diospyros peregrina), আমড়া (Spondias pinnata), অন্যতম।

(IV) কুমিল্লা অঞ্চলে বিলুপ্ত প্রায় গাছপালা

কুমিল্লা অঞ্চলের অনেক ছোট বড় গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা হবার পথে। বনবসতি বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি কাঠ হিসাবে বড় বড় গাছ কেটে উজাড় করা হচ্ছে।

যে সকল গাছ প্রায় বিলুপ্তির পথে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তেঁতুল (Tamarindus indica), কদবেল (Feronia limonia), হরিতকি (Terminalia chebula), কাঠবাদাম (Terminalia catappa), অর্জুন (Terminalia arjuna), ফসলা (Grewia asiatica), আমলকি (Phyllanthus embelica), হিজল (Barringtonia acutangula), দেশি গাব (Diospyrose peregrina), কালোকদম (Andina cordifolia), শ্যাওড়া (Streblus asper), পানিয়ালা (Flacourtia jangomas), বেউচি (Flaconurtia indica), সামী (Prosopis spicigera), পিরালু (Randia uliginosa)।

কুমিল্লা অঞ্চলের বনে জঙ্গলে প্রচুর ঔষধি গাছপাওয়া যেত। সেসব গাছের পাতা ও বাকলের রস ও অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন রোগের জন্য খেত এবং মালিশ হিসেবে ব্যবহার করত। ঔষধি গাছপালা থেকে কবিরাজগণ ঔষধ তৈরি করত। শিশুদের পেটের ক্রিমি থেকে শুরু করে বৃদ্ধদের বাতের ঔষধ পর্যন্ত তৈরি হত এ সকল গাছপালার সংগৃহীত নির্যাস থেকে। এমনকি গরু-বাছুর-ছাগলের অসুখেও এ সকল গাছের রস ব্যবহার করা হত। এ সমস্ত ঔষধি গাছ এ অঞ্চলের এক মহামূল্যবান সম্পদ। তবে অনেক প্রজাতির গাছ প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়েছে এবং অচিরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা। বিলুপ্তপ্রায় গাছের মধ্যে উলট্ চণ্ডাল (Gloriosa superba), কুচ (Abrus precatorius), আইখ্যা বা আকলা

(Alangium salvifolium), আমলকি (Phyllanthus embelica), স্বর্ণগন্ধা (Rauwolfia sarpentina), বাসক (Adhatoda vasica), বিলাই আঁচড়া (Mucuna pruriens), বিছুটি (Tragia involucrata)। অন্যান্য ঔষধি গাছের মধ্যে কালমেঘ (Andrographis paniculata), তুলসী (Ocimum sanctum), থানকুনি (Centella asiatica), লাল ধুতুরা (Datura metel), তেলাকুচা (Coccinia cordifolia), লজ্জাবতী (Mimosa pudica), আকন্দ (Calotropis procera), অপাং (Achyranthes aspera), নিশিন্দা (Vitex nigunda), ঘোড়া নিম (Melia sempervirens), অর্জুন (Terminalia arjuna), বহেড়া (Terminalia belerica), হরিতকি (Terminalia chebula), মুক্তাঝুরি (Acalypha indica), শতমূলী (Asperagus racemosus), অশোক (Sarca indica), পুণর্নভা (Boerhaavia repens), গন্ধভাদুলি (Paederia foetida) ও কুচি বা কুরুচি (Holarrhera anti-dysenterica) প্রজাতিসমূহের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(V) ফসলি উদ্ভিদ

ধান (Oryza sativa) ও পাট (Corchorus capsularis) এবং C. olitorius) ছিল এ অঞ্চলের প্রধান ফসলি উদ্ভিদ যার মধ্যে ৮৩.৪ শতাংশ জমিতে আউশ, আমন ও বোরো ধান হত। এছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন– গম (Triticum aestivum), যব (Hordeum vulgare), ভুট্টা (Zea mays), কাউন (Setaria italica), বাজরা (Penenisetum typhoideum), জোয়ার (Sorghum vulgare), বিভিন্ন ধরনের ডাল যেমন খেসারি (Lathyrus sativus), মসুর (Lens culinaris), মুগ (Phaseolus aureus), বুট (Cicer arietinum) ইত্যাদি, তেলবীজ জাতীয় উদ্ভিদ যেমন– সরিষা (Brassica oleracea, B. alba, B. napus, B. nigra, B. juncea, B. campestris) তিল, তিসি (Linum usitatissimum) এবং ইক্ষু (Saccharum officinarum), মেস্তা (Hibiscus cannabinus), তামাক (Nicotiana tabacum) ও পান চাষ হত। আলু (Solanum tuberosum), চাষ এ এলাকায় অনেক পরে আসে এবং পরবর্তীতে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

শালবন

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তির মধ্যে শালবন বিহার অন্যতম। একটি বৌদ্ধবিহারের নামকরণ করা হয়েছে শালবনের নামে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে এখানে শালবন ছিল। এখনও এ বিহারের আশেপাশে শালগাছের বাগান রয়েছে। বস্তুত লালমাই ও ময়নামতি এক কালে শালবনে পরিপূর্ণ ছিল। এই শালবন অতীতে সমৃদ্ধতর ছিল এতে সন্দেহ নেই। শালবনকে আশ্রয় করে নিশ্চয়ই অন্যান্য বনাজী বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মেছিল। এটি কষ্ট কল্পনা নয়।

শালগাছ ঘরের খুঁটি, লাঙ্গলের ঈস প্রভৃতি গৃহনির্মাণ ও চাষাবাদের সামগ্রীতে ব্যবহৃত হয়। কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এই গাছের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই গাছের খুঁটি তুলনামূলকভাবে শক্ত। শালবনের প্রসঙ্গে অন্যান্য গাছ গাছড়ার পাশাপাশি এখানকার পশু-পাখির কথা এসে যায়। এখানে শালবন এতো ঘন ও গভীর ছিল যে, সিংহ, বাঘ, হাতি এসব প্রাণীও এখানে বসবাস করতো। তার প্রমাণস্বরূপ পোড়ামাটির ফলকে এসব বন্য পশুর ছবি রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস : প্রাচীন যুগ

কুমিল্লার ইতিহাস কতটা প্রাচীন নিশ্চিত করে বলা শক্ত। আমরা ইতিহাস বলতে সাধারণত রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ইতিহাসকেই বুঝি। তবে নতুন ধারায় জনমানুষের ইতিহাস খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা খুবই সাম্প্রতিক কালের। প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধানে প্রাচীন কালের নিদর্শনকে সহায়ক বলে গণ্য করা হয়। মানুষের অস্থি-মজ্জা, নরকঙ্কাল, ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং প্রাচীন লিপি থেকে আন্দাজ করা হয় নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কারা বসবাস, আধিপত্য বিস্তার কিংবা রাজত্ব করেছেন। সম্প্রতিকালে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানায় সিন্ধু সভ্যতার মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার মতো বাঙালি সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে সেগুলো চারটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতা বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। ধারণা করা হয়, প্রথম যুগে এখানে মানুষ বাস করতে শুরু করে খ্রিস্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে থেকে। এছাড়া মনে করা হয় মহাভারতের যুগে যে পঞ্চপাণ্ডব এতদঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রথম যুগ তাঁদের সময়কার। ড. অতুল সুর মহাভারতীয় কাল সম্বন্ধে বলেছেন, বাকবিতণ্ডায় প্রবেশ না করেও আমরা মহাভারতের কাল নিরূপণ করতে পারি। 'বৃহৎসংহিতা'র গণনানুসারে ৬৫৩ কল্যব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে ১৪১৪ বঙ্গাব্দে ৫১০৮ কল্যব্দ চলছে। সে হিসেব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাঙ্কের সময় ছিল ৪৫৫৫ বৎসর পূর্বে বা খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে।[১]

মহাভারতে বর্ণিত আছে ঐ সময় পঞ্চপাণ্ডবেরা পুণ্ড্রবর্ধনের মহারাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে পরাজিত করেন এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মিত্র বলে কথিত বঙ্গদেশের রাজাকেও পরাজিত করেন।

মহাভারতের সভ্য পর্বে দেখা যায়, পূর্ব দিগ্বিজয়ী দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে পরাজিত করে বঙ্গদেশের নরপতি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করেন। এর পরে পূর্ব দিকে আরও ধাবিত হয়ে তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সূক্ষ্ম ও সমুদ্র তীরবাসী ম্লেচ্ছগণের অধিপতিদের পরাজিত করেন। পুণ্ড্র ও বঙ্গ কোমরাই সবচেয়ে পরাক্রান্ত ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের এক রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ করে মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। জরাসন্ধের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী বন্ধন শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের পক্ষে শঙ্কা ও চিন্তার কারণ হয়েছিল।

এক বঙ্গরাজ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে কৌরবপক্ষের দুর্যোধনের সহায়ক হয়েছিলেন। ভীষ্ম পর্বে দুর্যোধন-ঘটোৎকচ যুদ্ধে এই বঙ্গরাজ যথেষ্ট বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দক্ষিণ বিজয়ী সহদেবের বিজয় বৃত্তান্তে ত্রিপুরা বিজয়ের উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এরকম :

ত্রৈপুরংস বশেকৃত্বা রাজানামমিতৌজ সং
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরম্।

তবে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মনে করেন এটি সঠিক নয়। তাঁর বিবেচনায় পঞ্চপাণ্ডবের সহদেব একলাফে ত্রিপুরা থেকে পশ্চিম সাগরের সৌরাষ্ট্রে উপনীত হতে পারেন না। মতভেদ থাকলেও বিষয়টি বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। বঙ্গদেশের রাজা সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করে ভীম আরও পূর্বদিকে ধাবিত হয়ে তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সূক্ষ্ম ও সমুদ্রতীরবাসী ম্লেচ্ছগণের অধিপতিদের পরাজিত করেন। এ তথ্যের মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মহাভারত যুগে এতদঞ্চলে রাজ্য ছিল, রাজাও ছিলেন। তাই রাজ্য শাসনও হয়েছে।

তারও আগে জানা যায় চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুপ বংশে 'বলি' নামে এক নরপতি ছিলেন। বলিরাজ পত্নী মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে পাঁচটি পুত্র লাভ করেন – অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সূক্ষ্ম ও পুণ্ড্র। বঙ্গ বঙ্গদেশের শাসন অধিকার লাভ করেন। তাঁর নামানুসারেই এই বঙ্গের নামকরণ বলে মনে করা হয়।

পুণ্ড্রদের পরে বহু শতাব্দী এতদঞ্চল কে শাসন করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ধারণার ওপর পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেছেন। কৈলাস চন্দ্র সিংহের 'রাজমালা'য় পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে সূক্ষ্মদেশ অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই রাজ্যসমূহের ভৌগোলিকত্ব কিংবা ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা নিতান্ত সুকঠিন। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ শকাব্দের ষষ্ট শতাব্দে 'কমলাঙ্ক' আখ্যা দ্বারা পরিচিত ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে কমলাঙ্ক রাজ্যের স্থিতি স্থান নির্দেশ করেছেন। শকাব্দের দশম শতাব্দীতে কুমিল্লার পশ্চিম দিকস্থ পট্টিকারা নামক স্থানে 'কমলাঙ্ক' রাজ্যের রাজধানী ছিল।[২]

প্রাচীন সমতট রাজ্য ও কুমিল্লা

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট রাজ্যের উল্লেখ আছে।[৩] এই লিপিটি খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর। ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ বৃহৎসংহিতাতেও সমতটের উল্লেখ রয়েছে।[৪] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতটকে সমুদ্র তীরবর্তী নিম্ন আদ্র ভূমিখণ্ডরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রাচীন সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান কুমিল্লা তার প্রমাণ আছে। কুমিল্লার নাম তখন ছিল কমলাঙ্ক।[৫]

নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার আশ্রাফপুর গ্রামে খড়গ রাজবংশের দুটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রশাসন দুটিতে একটি স্থানের নাম রয়েছে 'জয়কর্মান্ত' ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী জয়কর্মান্তকে 'বড়কামতা' গ্রাম বলে সনাক্ত করেছেন।[৬] বড় কামতা কুমিল্লা শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত।

আশ্রাফপুর লিপি দুটিতে ৪ জন রাজার নাম রয়েছে। নৃপতিধিরাজ খড়গোদ্যম, (পুত্র) জাতখড়গ, (পুত্র) দেবখড়গ এবং (পুত্র) রাজরাজ (ভট্ট)। ত্রিপুরা জেলার দেউল বাড়িতে প্রাপ্ত সর্বানী দেবী (দুর্গা) নামক একটি মূর্তির পাদপিঠে দেবখড়গের স্ত্রী এবং রাজরাজ ভট্টের মায়ের নাম উৎকীর্ণ আছে। সেঙচি রাজভট্ট নামে সমতটের এক রাজার নাম বলেছেন এবং ইৎ সিঙ দেববর্মা নামে পূর্বদেশের এক রাজার তথ্য দিয়েছেন। এই রাজবংশের অন্তত একটি জয়স্কন্ধবার ছিল 'জয়কর্মান্তবাসক' বা 'বড়কামতা'য়। অনুমান বর্তমান ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চল এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, খড়গবংশীয় রাজারা প্রথমে বোধ হয় বঙ্গে রাজত্ব করতেন, পরে সমতটে রাজ্য বিস্তার করে থাকবেন। তিনি আরও বলেন, সেঙচি সমতটের রাজভট্ট নামে যে রাজার উল্লেখ করেছেন আশ্রাফপুর পট্টলির রাজরাজ ভট্ট একই ব্যক্তি।[৭]

রাজরাজ ভট্টের অন্যতম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়। শুধু ত্রিপুরাই নয় মধ্য বাংলার কিছু অংশ এবং ত্রিপুরা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতটের অংশ ছিল।

ত্রিপুরার সঙ্গে সমতট রাজ্যের সম্পর্কের কথা পরবর্তী সময়েও জানা যায়। সমতট রাজ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করা না গেলেও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, ত্রিপুরা জেলা নিশ্চিতরূপে সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৮] চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় তাঁর আগমণকালে সমতট রাজ্য বেশ বিস্তৃত ছিল। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী এ রাজ্যের পরিসীমা ৩০০০ লী অর্থাৎ প্রায় ৮০০ কিলোমিটারের অধিক। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, সপ্তম শতাব্দীতে সমতট রাজ্য উত্তরে নিম্নতর ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন অববাহিকা দ্বারা, পূর্বে চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রাম দ্বারা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল । এছাড়া পশ্চিমসীমা পুরাতন গঙ্গার একটি শাখা দ্বারা নির্ধারিত থাকতে পারে। ড. নীহার-রঞ্জন রায় বলেন, সমতট নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কিয়দংশ এবং ত্রিপুরা অঞ্চল-এর কেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও সমতটের রাজা সমুদ্রগুপ্তের আদেশ পালন করতেন এবং তাঁকে যথোচিত সম্মান কর, উপহার দান করতেন।[৯]

ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত সপ্তম শতকের একটি পট্টলিতে দেখা যায় বাঙালির আদি ইতিহাসে আরও একটি সামন্ত রাজবংশের পরিচয় আছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা একজন অধিমহারাজ ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মহাসামন্ত শিবনাথ, শিবনাথের পুত্র

শ্রীনাথ, শ্রীনাথের পুত্র ভবনাথ, তার পরে লোকনাথ। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টলিতে লোকনাথেরই সমসাময়িক জনৈক নৃপতি জীবধারণের উল্লেখ আছে। এই জীবধারণ ছিলেন রাত বংশের রাজা। রাতবংশ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত জানা যাবে।

গুপ্তদের শাসনাধীনে কুমিল্লা

গুপ্তদের শাসনামলের প্রথম দিকে সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর প্রায় সকল জনপদই গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রত্যন্ত স্বাধীন রাজ্য ছিল সমতট। ড. রায় বলেছেন প্রত্যন্ত রাজ্য হলেও সমতটের রাজা সমুদ্রগুপ্তের আদেশ পালন করতেন তাঁকে যথোচিত সম্মান ও করোপহার দান করতেন। তিনি একই জায়গায় আবার বলেন, এলাবাদ-লিপির সাক্ষ্য যদি প্রামাণিক হয় তা হলে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সমতট ছাড়া বাংলাদেশের আর সকল অংশেই সমুদ্রগুপ্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রানুগত্য স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। সমতটের তখনকার রাজা কে ছিলেন তা জানা যায়নি, তিনি কী কৌশলে নিজের রাজ্যকে স্বাধীন রাখতে পেরেছিলেন তাও জানা যায় না। তিনি স্বাধীন থেকেও কেন গুপ্তসম্রাটের আদেশ পালন করেছেন, কী ধরনের সম্মান ও করোপহার গুপ্তসম্রাটকে দান করেছেন এসব বিষয়ও অজানা রয়ে গেছে। তা হলেও সে সময়ে পরাক্রমশালী গুপ্তসম্রাটদের আমলে সমতটে একজন স্বাধীন নৃপতি রাজ্য শাসন করেছেন তা গৌরবেরই কথা।

কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময়ের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায় কুমিল্লার সাচারে। এর থেকে অনুমান করা হয় চতুর্থ শতাব্দীতেই বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তবে তা নিশ্চিত হয় আরও পরে। গুনাইঘরে বৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় ৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই সমতট গুপ্ত অধিকারের অন্ত ভুক্ত হয়েছিল। গুনাইঘরের প্রাচীন নাম ছিল 'গুণিকাগ্রহার'।

গুনাইঘর তাম্রশাসনে ষষ্ঠ শতকের বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায় এই শতাব্দীর প্রথম দশকে সামন্তরাজা রুদ্রদত্তের অনুরোধে শিব ধর্মাবলম্বী মহারাজ বৈন্যগুপ্ত মহাযানী বুদ্ধসংঘ পরিচালিত বৌদ্ধবিহারে কিছু ভূমি দান করেন। বিহার সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি বোধিস্বত্ব অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। তাম্রশাসনে বৌদ্ধ আচার্য শান্তিদেব এবং জীৎসেনের নাম উল্লেখ আছে। তাম্রশাসনের বর্ণনা মতে জমিটি যে স্থানে অবস্থিত তার নাম 'উত্তরমণ্ডল'।

বৈন্যগুপ্তের দু'জন সামন্তের নাম পাওয়া যায়। একজন রাজা রুদ্রদত্ত, আরেকজন মহাসামন্ত বিজয়সেন। তাঁদের দুজনকে গুনাইঘর পট্টলিতে মহারাজাই বলা হয়েছে। মহারাজা আখ্যা পেলেও এরা যে ভূমি দান করতে পারতেন না তার

প্রমাণ গুনাইঘর লিপির সাক্ষ্যে রয়েছে। তবে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এদের একজন এতদঞ্চলের মহারাজা ছিলেন।

রাজা গোপচন্দ্রদের সমতট শাসন

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়াতে পাঁচটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এগুলো থেকে জানা যায় বৈন্যগুপ্তের পরেই গোপচন্দ্র বাংলাদেশের স্বাধীন নৃপতি হন। এটি অনুমান ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। গোপচন্দ্র ৩৩ বছর এবং তার পর ধর্মাদিত্য ৩ বছর ও সমাচারদেব ১৪ বছর রাজত্ব করেন। এরা মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করতেন বলে স্বাধীন এবং পরাক্রান্ত ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।[১০] অনেকে মনে করেন কোটালিপাড়ার তাম্রশাসন থেকে আন্দাজ করা যায় কুমিল্লাসহ এতদাঞ্চল গোপদের রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়েছিল। তাম্রশাসন থেকে জানা যায় গোপচন্দ্র বর্ধমান থেকে শুরু করে ত্রিপুরা অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রা থেকে জানা যায় সমাচারদেবের পরও পৃথুজবীর, সুধন্যা, বাতাসী প্রভৃতি রাজাগণ এতদাঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের শাসন

কেউ কেউ মনে করেন গৌড়রাজ শশাঙ্কের অভ্যুদয়ের ফলে গোপচন্দ্রের রাজ বংশের রাজাদের পতন ঘটে। তাঁদের যুক্তি এই যে, রাজা শশাঙ্কের নামাঙ্কিত মুদ্রা শালবন বিহারে পাওয়া গেছে। কাজেই সমতট অঞ্চলে শশাঙ্কের রাজ্য বিস্তার অমূলক নয়। শশাঙ্কের প্রথম পরিচয় মহাসামন্ত রূপে। কেউ কেউ মনে করেন তিনি গুপ্ত রাজাদেরই মহাসামন্ত ছিলেন। ৬০৬-৬০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে কোনো এক সময় তিনি গৌড়ের স্বাধীন রাজা হন। কর্ণসুবর্ণে তার রাজধানী ছিল। বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক বলে বর্ণনা করেছেন। দেবগুপ্তের পরাজয় ও হত্যাকারী রাজ্যবর্ধনকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেছেন বলে বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙ মনে করেন। রাজ্যবর্ধন হর্ষবর্ধনের ভাই। শশাঙ্ক ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে মৃত্যুবরণ করে থাকবেন। শশাঙ্কের প্রতি হিউয়েন সাঙ ক্ষুব্ধ ছিলেন। শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কেটে ফেলেছেন এবং বৌদ্ধমূর্তিটি অন্য মন্দিরে সরিয়ে রেখেছেন। এই পাপের ফলে শশাঙ্ক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থেও এই কাহিনী নিয়ে একটি গল্প আছে।

সমতটের ভদ্র বংশের রাজা

হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আছে তাঁর গুরু এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আচার্য শীলভদ্র ছিলেন সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশজাত। সে ব্রাহ্মণ রাজবংশ সমতটে রাজত্ব করতেন বলেও ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ রয়েছে। কামরূপ

রাজ ভাস্করবর্মার নিধানপুর তাম্রশাসনে জ্যেষ্ঠভদ্র নামে একজন সামন্ত রাজার উল্লেখ আছে। তাঁকে সমতটের ভদ্র রাজবংশের রাজা বলে কেউ কেউ মনে করেন।

বঙ্গ ও সমতটের খড়্গ রাজবংশ

চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিঙ এবং সেং চি-র ভ্রমণ বিবরণীতে প্রথম বৌদ্ধ খগড় রাজাদের কথা জানা যায়। এ দু'জন পরিব্রাজক সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমতট ভ্রমণে আসেন। সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদে সমতটের খড়্গ বংশের আরও পরিচয় পাওয়া যায় আশ্রাফপুরের দু'টি তাম্রশাসনে। এ তাম্রশাসন থেকে জানা যায় নৃপতিরাজ খড়্গোদ্যম, তাঁর পুত্র রাজা জাতখড়্গ, জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ এবং দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ (ভট্ট) সমতটে রাজত্ব করেছিলেন। কুমিল্লা শালবন বিহারে রাজপুত্র বলভট্ট নামক এক নৃপতির একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে এই বলভট্টের ৩টি স্বর্ণ মুদ্রাও সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রশাসনের রাজপুত্র বলভট্ট এবং মুদ্রার রাজা বলভট্ট অভিন্ন ব্যক্তি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। লিপিপাঠ থেকে দেখা যায় দেবখড়্গ বলভট্টের পিতামহ ছিলেন। রাজভট্টের নামের সঙ্গে বলভট্টের নামের একটি সাদৃশ্য রয়েছে। এছাড়া দেবখড়্গ রাজভট্টের পিতা ছিলেন তাও জানা যায়। এসব তথ্যের প্রেক্ষিতে বলভট্টকে কেউ কেউ রাজভট্টের পুত্র বলে মনে করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় খড়্গ বংশের রাজা ৪ জন নয়, ছিলেন ৫ জন। তাঁদের রাজধানী ছিল জয়কর্মান্ত বা কর্মান্তবাসক (বড়কামতা)।[১১] ইতিহাসে তাঁদের পরিচয় খড়্গ রাজবংশ।

সেঙ চি-র বিবরণে রাজভট্টের কথা উল্লেখ আছে। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী রাজভট্ট সমতটের একজন বৌদ্ধ রাজা। ইৎ সিঙ দেববর্মার কথা বলেছেন। পূর্বদেশ বা সমতট ছিল এ রাজার রাজ্য। দেববর্মা এবং দেবখড়্গ এক ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। তবে তাম্রশাসনে যে দেবখড়্গের উল্লেখ রয়েছে তিনি ইৎ সিঙ-এর ভ্রমণকালে সমতটের রাজা ছিলেন। পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেন দেববর্মা ও দেবখড়্গ একই ব্যক্তি হতে পারেন আবার নাও পারেন। কিন্তু সেঙ চি কথিত রাজভট যে আশ্রাফপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত রাজরাজভট্ট এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। এ বংশের অন্তত একটি জয়স্কন্ধাবার ছিল কর্মান্তবাসক বা জয়কর্মান্ত (বড়কামতা)।[১২]

কিন্তু কারা এই খড়্গবংশের রাজা, তাঁদের জাত-পরিচয় কী? ড. রায় মনে করেন খড়্গ দেশজ কোনও উপান্ত বা উপধি বলে মনে হয় না। খড়্গ বংশের রাজারা কোনো পার্বত্য কোমের প্রতিনিধি হলেও হতে পারেন। ইতিহাসে জানা যায় নেপালে খড়ক বা খর্ক নামে এক রাজবংশ ছিল। এরা নিজেদেরকে ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন। ষোড়শ শতকে এ রাজবংশের রাজা দ্রব্যসাহ গুর্খা অঞ্চল দখল করে গুর্খা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ড. আর.সি. মজুমদার মনে করেন প্রাচীন খড়্গ

বংশের সঙ্গে এ রাজবংশের কোনো সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। এটি নিশ্চিত করে বলা শক্ত। সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের সাধারণ মানুষের নামের সঙ্গে খড়্গ উপাধি ধারণ করতে দেখা গেছে এবং তা তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমিদানের ক্ষেত্রসীমার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া দেবখড়্গের আশ্রাফপুর তাম্রশাসনে ভূমি মালিকদের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তার সর্বশেষ ভূমি মালিক সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৩.১ পাটক ভূমি এক সময় শ্রীউদীর্ণ খড়্গ দান করেছিলেন। অধুনা ভোগ করছেন শক্রক নামক এক ব্যক্তি। এতে খড়্গদের স্থানীয় বাসিন্দা বলেই মনে হয়। এরা স্বাধীন রাজা ছিলেন কিনা এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ড. রায় মনে করেন খড়্গ বংশ বোধ হয় স্বাধীন রাজবংশ ছিল না। রাজরাজভট্টের আশ্রাফপুর লিপিতে আছে প্রদত্ত ভূমিখণ্ড ইতিপূর্বেই জনৈক 'বৃহৎপরমেশ্বর' কর্তৃক দান করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন খড়্গরা উক্ত বৃহৎপরমেশ্বরের সামন্ত বংশ ছিলেন। এ মতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কিছু যুক্তি রয়েছে। প্রথমত বৃহৎপরমেশ্বর রাজরাজভট্টের পূর্বপুরুষও হতে পারেন। দ্বিতীয়ত খড়্গরা যে স্বাধীন এবং পরাক্রমশীল রাজা ছিলেন তাঁদের উপাধিতে তার প্রমাণ রয়েছে। এরা নৃপাধিরাজ, অধিমহারাজ, পরমেশ্বর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেছেন। তৃতীয়ত স্বাধীন রাজাদের মতই এরা ভূমিদান করেছেন সে তথ্য দেবখড়্গের তাম্রশাসনে রয়েছে। দেবখড়্গ নিজেই ভট্ট, ব্রহ্মবীর, স্বামী এবং একটি বুদ্ধ সংঘকে ভূমি দান করেছেন। এছাড়া লোকনাথের পট্টলি থেকে অনেকে মনে করেন এরা সামন্ত রাজবংশের সামন্ত রাজা হিসেবে খড়্গ বংশীয় নৃপাধিরাজদের অধিরাজত্ব স্বীকার করতেন।

খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশের রাজারা প্রায় সমসাময়িক। এরা আবার সকলেই সমতটে রাজত্ব করেছিলেন। কার পরে কে সমতটে অধিকার লাভ করেন এ কথা বলা শক্ত। ড. রায় মনে করেন এরা সকলেই সামন্ত রাজ ছিলেন। তাঁর মতে এদের বৃহৎপরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ কারা ছিলেন তাও জানা যায় না। তবে তিনি মনে করেন খড়্গ বংশ প্রথমে বঙ্গে রাজত্ব করতেন। পরে রাজা দেবখড়্গ সমতটে রাজ্য বিস্তার করেন। ড. রায় যে এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কথাতেই। তিনি বলেন খড়্গদের সামন্ত হিসেবে অথবা তাঁদের অবসানের পর আর কারো সামন্ত হিসেবে লোকনাথ সমতটের অধীশ্বর হন। লোকনাথকে পরাজিত করে রাত বংশীয় রাজা শ্রী জীবধারণ নিজ বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের ঘটনা এটি।[১৩]

খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশের সময়কাল সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদে হলেও হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় তাঁদের কারো কথাই বলা হয়নি। বরং তাঁর পরে আসা চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিঙ এবং সেং-চি-র বর্ণনায় তাঁদের কথা জানা যায়। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকের এবং মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। সপ্তম শতকে গৌড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিণ

বঙ্গে শশাঙ্ক যে গৌড়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খড়্গ এবং রাত বংশের রাজারা তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা তা প্রমাণ করা কঠিন। তবে কেউ কেউ আন্দাজ করেন খড়্গ এবং রাত বংশীয় রাজারা গোড়ায় তার সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়তন্ত্র বিনষ্ট হলে সামন্ত রাজারা একে একে স্বাধীন হয়ে যান। এরা স্বীকার করেন সপ্তম শতকের শেষ এবং অষ্টম শতকের প্রথমদিকে বঙ্গ ও সমতটের স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। কিন্তু ঘন ঘন রাজবংশ পরিবর্তন ও প্রবল সামন্তাধিপত্য দেখে মনে হয় পরবর্তীতে স্বাতন্ত্র্যের মূল শিথিল হয়ে পড়েছিল। বঙ্গ এবং সমতট এ সময় এরপর পর থেকে বহুবার বহিশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র সপ্তম শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত খড়্গ ও রাত বংশের একনায়কত্বে সামগ্রিক ঐক্য বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশ এবং সুসংহত রাষ্ট্র পরিচালনায় খড়্গ এবং রাত বংশের রাজাদের কৃতিত্ব ইতিহাসে স্বীকৃত।

বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহাসিক তিব্বতি লেখক লামা তারানাথের মতে খড়্গ বংশের পতনের পর বঙ্গ রাষ্ট্র (সমতটসহ) চন্দ্র বংশীয় রাজাদের করায়ত্ব হয়। তার আগে পর্যন্ত বঙ্গ ও সমতটে খড়্গ বংশীয় রাজারা রাজতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে দেউলবাড়ি নামক স্থানে একটি ধাতুময়ী সর্বাণী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় রাজা দেব খড়্গের স্ত্রী প্রভাবতী এই মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন।[১৪] তাঁদের পুত্রের নাম রাজরাজ বা রাজা রাজভট্ট।

আশ্রাফপুর তাম্রশাসন এবং দেউলবাড়ি মূর্তি লেখ থেকে জানা যায় খড়্গ বংশীয় রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাম্রশাসনগুলোতে বুদ্ধবন্দনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে দেখা যায় খড়্গোদ্যম সুগত (বুদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিবশতই পৃথিবীতে এরা বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের তাম্রশাসনগুলোয় ধর্মচক্রের সিল রয়েছে। বিহারে ভূমিদান করেছেন পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনা করে, রত্নত্রয়ের সেবার জন্য এবং ত্রিবিধ ভবভয় দূরীকরণের জন্য।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে বুদ্ধ নৃপতি দেবখড়্গের মহিষী প্রভাবতী ছিলেন ব্রাহ্মণ্য দেবী সর্বাণীর উপাসিকা। দুর্গার অপর নাম সর্বাণী। দেবী সর্বাণী মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী স্বামী দেবখড়্গ তাঁর হিন্দু পত্নীর উপাসনার জন্য সর্বাণী দেবীর উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবী মূর্তিকে হেমলিপ্ত বা স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দেন।

দেবখড়্গের আশ্রাফপুর তাম্রশাসনে দেখা যায় রাজা বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেছিলেন। দানকৃত সম্পত্তির মধ্যে রাণী প্রভাবতীর সম্পত্তিও ছিল। ভূমি

বিন্যাসের আলোচনায় এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। খড়গদের আমলে সমতটে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় ছিল বলে মনে করা হয়।

সমতটে লোকনাথের বংশ

সমতটে খড়গদের প্রায় সমসাময়িক কালে (ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে) দুটি রাজবংশের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি লোকনাথের বংশ, আরেকটি রাত বংশ। কুমিল্লায় প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে সামন্তরাজ লোকনাথ এবং তাঁর বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এ নাথবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন অধিমহারাজা। তাম্রশাসনে তাঁর নামের 'নাথ' উপাধি আছে মাত্র, বাকিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর পরবর্তী রাজা শিবনাথ। তিনি একজন সামন্ত রাজা। তাঁর পরে আরো দুজন রাজার নাম আছে। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কিছুই বলা নেই।[১৫]

লোকনাথের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় লোকনাথের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষ শর্মা সুববঙ্গ বিষয়ের অরণ্যময় ভূমিতে অনন্ত নারায়ণের (শায়িত বিষ্ণু) এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরের কাছেই চতুর্বেদ বিশারদ দু'শতাধিক ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করা হয়। এই তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় লোকনাথ তাঁর পরমেশ্বর (মহারাজা, সম্রাট?) কর্তৃক প্রেরিত এক সৈন্যদলকে পরাজিত করেছিলেন।

এই তাম্রশাসন থেকেই জানা যায় রাজা শ্রীজীবধারণ তাঁর রাজ্য বা রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নেন। সম্রাট বা পরমেশ্বর থেকে লোকনাথ সে রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন এবং শ্রীজীবধারণ যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁকে রাজ্য ফেরৎ দিয়ে চলে যান।

এই তামশাসনেই উল্লেখ আছে জয়তুঙ্গবর্ষ এবং লোকনাথের মধ্যে যুদ্ধ হয়। জয়তুঙ্গবর্ষের সামন্ত জীবধারণ সে যুদ্ধেও রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

এর থেকে মনে হচ্ছে লোকনাথ এবং শ্রীজীবধারণ সামন্তরাজা ছিলেন জয়তুঙ্গবর্ষ ছিলেন মহারাজা। তাহলে সম্রাট বা পরমেশ্বর কে ছিলেন তা প্রশ্নই থেকে যায়। জয়তুঙ্গবর্ষ সম্পর্কে অন্য কোনো তথ্য জানা যায় না। তিনি মহারাজা হলে তাঁর রাজ্য এবং রাজধানী কোথায় ছিল তাও জানা যায় না।

লোকনাথ তাঁর তাম্রশাসনে যে সন উল্লেখ করেছেন তাও সুস্পষ্ট নয়। অংকে লিপিবদ্ধ সনটির অর্ধেক ভেঙ্গে গেছে, টিকে আছে শুধু '৪৪'। অক্ষর বিচারে পণ্ডিতেরা মনে করেন লোকনাথ সপ্তম শতকের লোক। কেউ কেউ মনে করেন তিনি খড়গদের সামন্তরাজা ছিলেন। তাঁর তাম্রশাসন থেকে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে– একটি হ'ল তাঁর মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মার তথ্য। তিনি লোকনাথের মহাসামন্ত হলে তখন লোকনাথের স্বাধীন রাজা থাকারই কথা। অন্য বিষয়টি হ'ল অরণ্যময়

এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আগমণ এবং বসতি স্থাপন– যা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সমতটের রাত বংশ

লোকনাথেরই সমসাময়িক শ্রীজীবধারণ এক রাজবংশের রাজা ছিলেন। কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার কৈলান গ্রামে আবিষ্কৃত একটি পট্টলিতে এ বংশের দু' রাজার কথা জানা যায়। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, এই সামন্ত রাজাদের সময় সপ্তম শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সম্ভবত সমতটেশ্বর প্রতাপোপনতসামন্তচক্র শ্রীজীবধারণ রাত। তাঁর পুত্র ছিলেন সমতটেশ্বর পঞ্চমহাশব্দ (অর্থাৎ যিনি একাধারে মহাপ্রতীহার, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাঅশ্বশালাধিকৃত, মহাভাণ্ডাগারিক এবং মহাসাধনিক) শ্রীধারণ রাত। তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শ্রীজীবধারণ এবং শ্রীধারণ দু'জনেরই 'সমতটেশ্বর' উপাধি ছিল।[১৬] শ্রীধারণ সমতটসহ অনেক দেশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু সামন্ত উপাধি থেকে মনে হয় প্রথমে তিনি সামন্তরাজ ছিলেন। পিতার অধীনে সামন্তরাজ কিংবা খড়্গদের সামন্ত থাকতে পারেন। শ্রীধারণের পুত্র ছিলেন যুবরাজ শ্রীবলধারণ রাত। শ্রীধারণের ব্যক্তি চরিত্র সম্বন্ধে ড. রায় বলেন, তিনি ছিলেন পরম কারুণিক এবং একাধারে কবি, অধুরচিত্র রচয়িতা, সপ্তবিদ্যা পারঙ্গম, নানা বিদ্যা ও কলায় পারদর্শী। তাঁর পুত্র বলধারণও সপ্তবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা এবং হস্তি ও অশ্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি মনে করেন খড়্গ রাজবংশীয় রাজারা প্রথমদিকে রাজা শশাঙ্কের সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর এরা স্বাধীন নৃপতি হন। তিনি আরও মনে করেন হিউয়েন সাঙ-এর গুরু শীলভদ্র রাত রাজবংশের সদস্য হতে পারেন।

শ্রীধারণ রাতের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ক্ষীরদা নদী পরিবেষ্টিত দেবপর্বত এই রাজবংশের রাজাদের রাজধানী ছিল।[১৭] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার দেবপর্বতকে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণভাগে বললেও ময়নামতি পাহাড়ের উত্তরভাগই দেবপর্বত বলে চিহ্নিত। এই রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

রাজমালার ত্রিপুর

কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' গ্রন্থে দেখা যায় চন্দ্র বংশের মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রকে সাম্রাজ্যের শাসনভার প্রদান করলে তাঁর অন্য পুত্র মহাবল দ্রুহ্য কিরাত ভূমিতে এসে উপনীত হন এবং কতিপয় প্রধান কিরাত নরপতিকে পরাজিত করে 'কুপল' নদীর তীরে ত্রিবেগ নাম্নী নগরী নির্মাণ পূর্বক সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর রাজ্যের পরিসীমা পূর্বে মেখলীদেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে আচড়ঙ্গ নামক এক রাজ্য। সেই দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর। তিনি

কিরাত নাম বাদ দিয়ে তাঁর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম রাখেন ত্রিপুরা। তিনি অত্যাচারী রাজা ছিলেন বলে ইতিহাসে জানা যায়। ত্রিপুরার অত্যাচারিত প্রজাগণের শিব আরাধনায় ত্রিশূলবিদ্ধ হয়ে ত্রিপুরের মৃত্যু হয়।[১৮]

গুপ্তাধিকারের সময়ে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা

গুপ্ত যুগের তাম্রশাসন থেকে তখনকার ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক জীবনধারায় হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সহাবস্থান, সহমর্মিতা এবং উদারনৈতিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসনে উল্লেখ রয়েছে মহারাজা রুদ্রগুপ্তের অনুরোধে শিবধর্মাবলম্বী হিন্দু নরপতি মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্ত মহাযানী বৌদ্ধ সংঘ পরিচালিত বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেছেন এবং বৈন্যগুপ্ত মনে করেছেন বৌদ্ধ বিহারে ভূমি দানের দ্বারা তাঁর পিতামাতা ও নিজের পুণ্য বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক কিংবা ষষ্ঠ শতকেই এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বসবাসের কথা তাম্রশাসন থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। খড়্গ রাজবংশের সময় রাজা দেবখড়্গের স্ত্রী প্রভাবতী ধাতুময়ী সর্বাণী (দূর্গা) মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।[১৯] তিনি সঙ্গত কারণেই ব্রাহ্মণ্য দেবী সর্বাণীর উপাসিকা ছিলেন। কিন্তু আশ্রাফপুর তাম্রশাসন ও দেউলবাড়ির মূর্তিলেখ থেকে জানা যায় খড়্গ বংশের রাজারা সকলেই বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। দুটি তাম্রশাসনেই বুদ্ধ বন্দনা রয়েছে। বৌদ্ধ রাজার স্ত্রী হয়েও তখন প্রভাবতী স্বাধীনভাবে হিন্দু ধর্ম পালন করেছেন।

তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহারাজ দেব খড়্গ তাঁর হিন্দু পত্নীর উপাসনার জন্য সর্বাণী (দূর্গা) মন্দিরই শুধু তৈরি করেননি, দেবীর মূর্তিকে সোনার পাত দিয়েও মুড়িয়ে দেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমতটে বৌদ্ধ ধর্ম যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বিবরণ থেকে তা স্পষ্ট। তাঁর বৃত্তান্ত মতে সমতট রাজ্যে ৩০টির অধিক বৌদ্ধবিহার ছিল এবং এগুলোয় ২ হাজারের অধিক ভিক্ষু (শ্রমণ) বাস করতেন। বৌদ্ধরা হীনযানী বা স্থবিরবাদী ছিলেন। রাজধানীর নিকট একটি অশোক স্তূপ ছিল। একটি সংঘারামে নীল স্ফটিকে নির্মিত আড়াই মিটার উঁচু বিরাট আকার বিস্ময়কর বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। হিউয়েন সাঙ এই মূর্তির অলৌকিক শক্তির কথা বলেছেন। পুণ্য বা মানত পূরণের আশায় বহু লোক এই মূর্তিকে দর্শন করতে আসত।

এই চৈনিক পরিব্রাজক সমতটে ১০০টি হিন্দু দেব মন্দির দেখেছিলেন। এতে দেখা যায় অতীতে হিন্দু রাজত্বের কারণে বৌদ্ধ রাজাদের সময়েও হিন্দু ধর্মের আধিপত্য ছিল। এই সময়ে তিনি সমতটে বহু দিগম্বর জৈন সন্নাসী দেখেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

এর থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় সপ্তম শতাব্দীতে সমতট রাজ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন– এই তিনটি প্রধান ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এরা সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করেছেন।

সে সময় এখানকার জমি-জমা খুব উর্বর ছিল। চাষাবাদ হতো, প্রচুর শস্য ও ফল-ফুল জন্মাতো। অনুকূল আবহাওয়া এবং সমতটে বসবাসকারী প্রীতিকর লোকজন হিউয়েন সাঙের ভালো লেগেছে। এরা যে পরিশ্রমী, বিদ্যানুরাগী এবং বিদ্যা চর্চায় আত্মনিবেদিত সে কথাও তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। এখানকার মানুষ ও মাটির প্রতি সম্ভবত হিউয়েনসাঙ-এর শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক টান ছিল। কারণ এই সমতটের গৌরব মহাস্থবির শীলভদ্র যিনি হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষাগুরু, সমতটের অধিবাসী ছিলেন।[২০]

মহাস্থবির শীলভদ্র

সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্র বৌদ্ধ জগতে একজন বাঙালি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর নাম শীলভদ্র। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বলেছেন, এই শীলভদ্র জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছিলেন। সমতটের ব্রাহ্মণ এক রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়।

হিউয়েন সাঙ ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে নালন্দায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি ৫ বছর অধ্যয়ন করেন। শীলভদ্র তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। শীলভদ্র সম্বন্ধে তিনি বলেন, ভারতের নানা স্থানে জ্ঞানান্বেষণে ঘুরে ঘুরে অবশেষে নালন্দায় এসে স্থিতি লাভ করেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ধর্মপালকে গুরু হিসেবে বরণ করেন। এখানে বৌদ্ধ ধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাধারায় তাঁর গভীর জ্ঞান লাভ ঘটে এবং জ্ঞান ও জীবন চর্চার খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শীলভদ্রের বয়স যখন মাত্র ৩০ বছর তখন দক্ষিণ ভারত হতে এক ব্রাহ্মণ আচার্য নালন্দায় আসেন আচার্য ধর্মপালের সঙ্গে বিতর্কের জন্য। ধর্মপাল শীলভদ্রকে আদেশ করেন বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে। শীলভদ্র অচিরেই সে ব্রাহ্মণ আচার্যকে বিতর্কে পরাজিত করে আপন মত প্রতিষ্ঠা করেন। মগধের রাজা সন্তুষ্ট হয়ে শীলভদ্রকে একটি গ্রামের রাজস্ব পুরস্কার দিতে চাইলেন। শীলভদ্র প্রথমে তা গ্রহণ করতে রাজি হননি। পরে তা গ্রহণ করেন। কিন্তু সে অর্থ নিজে ভোগ না করে এর দ্বারা একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং বাৎসরিক রাজস্ব সে বিহারে দান করে দেন। কালক্রমে শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের (মহাবিহার) মহাআচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সময়ে নালন্দায় ১০ হাজার শ্রমণ বাস করতো। এদের মধ্যে শীলভদ্রই ছিলেন সকল শাস্ত্র ও সূত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত ১৮টি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ছাড়াও বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শীলভদ্র প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি নিজে মহাজন

ধর্মাবলম্বী হলেও বৌদ্ধ ধর্মের সকল শাখার সকল শাস্ত্রে এবং জন্মগত ভাবে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সকল বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বিনীত শ্রদ্ধায় মহাবিহারের সকল শ্রমণেরা তাঁকে 'সধর্মের ভাণ্ডার' বলে সম্ভাষণ করতেন। হিউয়েন সাঙ শীলভদ্রের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সে সময় হিউয়েন সাঙ-এর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। শীলভদ্রের অনুরোধে রাজা শীলাদিত্য হর্ষবর্ধন সে ব্রাহ্মণকে ৩টি গ্রামের ভূমি রাজস্ব দান করেছিলেন। শীলভদ্র রচিত একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'আর্য-বুদ্ধ-ভূমি-বাখ্যান'। এই গ্রন্থটি তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

গুপ্তদের সময়ে এবং গুপ্ত উত্তরকালে এতদঞ্চলে যে জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা হতো হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনা থেকে তা নিশ্চিত হওয়া গেছে। তবে লক্ষ করার বিষয় এই যে, গুপ্ত বংশের রাজকীয় পট্টলী কিংবা খড়গ বংশের মূর্তিলেখ কোনটিই প্রাচ্য ভাষা কিংবা প্রাকৃতে নয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে। সপ্তম শতকের লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টলী, কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর পট্টলী প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত সংস্কৃত ভাষাতেই শিক্ষাদান করতেন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক প্রাচ্য-প্রাকৃতে লেখা হলেও বৌদ্ধ আচার্য এবং ব্রাহ্মণ আচার্যদের মধ্যে বিতর্কের ভাষা ছিল সম্ভবত সংস্কৃত। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগে বাঙালি পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সঙ্গে ভালো করে আত্মীয়তা স্থাপন করতে পারেনি। চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন পঞ্চম শতকের তাম্রলিপ্তিতে বসে অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করেছেন। সমতটে অবস্থান করেননি। বস্তুত শীলভদ্রের আমলেই সমতট অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বেড়ে যায়। শীলভদ্র আনুমানিক ৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

সমতটের বৌদ্ধ দেব বংশ (সপ্তম-অষ্টম শতক)

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর আবিষ্কৃত নানা উপকরণ থেকে দেব বংশের সমতট শাসনের ইতিহাস জানা যায়। তাঁদের সময় সপ্তম শতকের শেষ এবং অষ্টম শতকের মধ্যভাগ বলে মনে করা হয়। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়কে কেন্দ্র করে দেব বংশের রাজারা সমতটে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের আদি পাল রাজদের এরা সমসাময়িক ছিলেন বলে মনে করা হয়। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের শালবন বিহারে আবিষ্কৃত ৪টি এবং আনন্দ বিহার থেকে প্রাপ্ত ১টি তাম্রশাসন থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে দেব বংশের ৪ জন রাজা প্রায় ১০০ (একশত) বছর সমতট শাসন করেন। রাজারা হলেন (১) শ্রী শান্তিদেব, (২) শ্রী বীরদেব, (৩) শ্রী আনন্দদেব এবং (৪) শ্রী ভবদেব। কেউ কেউ মনে করেন সমতট রাজ্য তখন সম্ভবত কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত ছিল। এই রাজাদের শাসন কেন্দ্র ছিল বর্তমান কুমিল্লার শহরাঞ্চলে। ময়নামতি দেব পাহাড়ে ছিল তাঁদের রাজধানী।

শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন এবং শ্রীহট্ট তাম্রশাসনেও দেব পর্বতের উল্লেখ আছে। তাম্রশাসন মতে, দেব পর্বত পূর্ণতোয়া ক্ষীরদা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। শ্রীহট্ট তাম্রশাসনে দেব পর্বতকে ক্ষীরদা নদীর মণিসদৃশ বলা হয়েছে।[১৭] কৈলান তাম্রপটে বলা হয়েছে দেবপর্বত ক্ষীরদা নদীর দ্বারা পরিখাবৎ পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ নদীর জলে হাতিরা জলক্রীড়া করত। এছাড়া নদীর উভয় তীর নৌকা দ্বারা সুসজ্জিত থাকতো। নদীটি এখন আর নেই।

শালবন বিহারে আবিষ্কৃত প্রথম শাসনলিপি থেকে ৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন শ্রী শান্তিদেব, তাঁর পুত্র শ্রী বীরদেব এবং তাঁর পুত্র শ্রীআনন্দদেব। মনে করা হয় লিপিটি আনন্দদেব প্রদান করেছিলেন। শাসনলিপির বিপরীত দিকে শ্রী ভবদেবের অনুমোদন আছে। তাঁর শাসনকাল উল্লেখ আছে দ্বাদশ শাসন বর্ষ, ১৩ ভাদ্র। দেবদের রাজকীয় উপাধি 'শ্রী ভঙ্গলমৃগাঙ্কশ্য'। এছাড়া 'পরম সৌগত' অভিধাও সকল তাম্রশাসনে আছে। এরা সকলেই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা ছিলেন। কারণ, তাঁদের উপাধি ছিল পরমভট্টারক, পরমেশ্বর এবং মহারাজাধিরাজ। আনন্দদেবের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে তিনি ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেছেন। লিপিতে রাজধানীর নাম আছে বসন্তপুর। তাহলে কি এরা পুরাতন রাজধানী দেব পর্বত অন্য কারো কাছে হারিয়ে ফেলেছিলেন ? ময়নামতির আনন্দ বিহার আনন্দদেবের নামে নামকরণ হয়েছে। শাসনলিপি ও মুদ্রাসমূহের অক্ষরের সাদৃশ্য বিবেচনা করে কেউ কেউ মনে করেন গুপ্তদের শেষাংশে তাঁদের আবির্ভাব। আনন্দদেবের তাম্রশাসনের ওপরিভাগে যে সিলমোহর আছে তাতে ধর্মচক্র এবং দুটি উপবিষ্ট মৃগের মূর্তি রয়েছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায় দেব রাজাদের আমলের তাম্রশাসন, সীলমোহর ও মুদ্রা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, একটি আবিষ্কার ইতোমধ্যে ঘটেছে যা অর্থবহ ও যার আলোচনা ও উল্লেখ অপরিহার্য। কুমিল্লা জেলার ময়নামতি উৎখননের ফলে কয়েকটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার ভাণ্ডার (Hord) আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রকাশিত বিবরণ থেকে মুদ্রাগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের সুবর্ণ মুদ্রাগুলোর সঙ্গে গুপ্ত-উত্তর বাংলায় প্রচলিত অপেক্ষাকৃত পাতলা ওজনের (নকল) স্বর্ণমুদ্রার কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের মুদ্রা সপ্তম শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাগুলোর বামপাশে দণ্ডায়মান একটি নারীমূর্তি, ডানদিকে দণ্ডায়মান নরমূর্তি, খুব সম্ভব রাজারাণী অথবা রাজা ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি এগুলো। অনেকগুলো মুদ্রার একদিকে গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে দণ্ডায়মান মূর্তির বাম হাতের নিচে ছোট্ট এক লাইন একটি লেখ (পাঠোদ্ধার হয়নি), তবে অন্য একটি মুদ্রায় 'বলভট' বলে এক ব্যক্তির নাম লেখা আছে। আর একটিতে আছে 'ভঙ্গলমৃগাঙ্কুশ'। ময়নামতির বিবরণ লেখক এফ এ খান দেব বংশীয় রাজাদের সিলমোহর ও তাম্রশাসন উৎকীর্ণ 'শঙ্গল মৃগাঙ্ক' পাঠটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন এ পাঠ যথার্থ নয়। শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত 'অভিনবমৃগাঙ্কুশ'।[২১]

তাহলে এটা নিশ্চিত যে ত্রিপুরা বা বর্তমান কুমিল্লা অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোষকার হেমচন্দ্র তাঁর অভিধান 'চিন্তামণি' (১২শ শতক)-তে বঙ্গ ও হরিকেলি জনপদকে এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, "চম্পাস্ত প্রজ্ঞা বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়াঃ"। চীনা পরিব্রাজকরা বলেছেন প্রাচ্য দেশের পূর্বতম সীমায় হরিকেল দেশ অবস্থিত। অষ্টম শতকে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেলকে ৩টি স্বতন্ত্র জনপদ বলা হয়েছে। তিন জনপদেই অসুরবুলি ছিল বলে বলা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'রুদ্রাক্ষমাহত' এবং 'রোগচিন্তামণিকোষ'– দুটি পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট ও হরিকোলা নামক জনপদ দুটিকে এক ও সমার্থক বলা হয়েছে।

রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জুরী' গ্রন্থে (৯ম শতক) হরিকেলী জনপদের নারীদের খুব স্তুতিবাদ করা হয়েছে এবং তাদেরকে পূর্বদেশবাসিনী বলা হয়েছে। শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে তাঁর পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবকে আগে হরিকেল এবং পরে চন্দ্রদ্বীপের রাজা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। তবে মনে রাখা দরকার যে কোথাও কোথাও হরিকেলকে বেঙ্গল হরিকেলও বলা হয়েছে।

দেববংশীয় রাজা ভবদেবের সীলমোহর ও তাম্রশাসনে যা লেখা আছে দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে তার পাঠ 'শ্রীঅভিনবমৃগাঙ্ক'। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সন্দেহ নেই দক্ষিণপূর্ব বাংলায় এই 'নকল' গুপ্ত-উত্তর স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল দেব বংশের রাজত্বের আমলে, অষ্টম শতকে। লালমাই-ময়নামতিতে যে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে প্রশ্ন উঠেছে এ মুদ্রা এল কোথা থেকে। রৌপ্য বিদেশ হতে আগত। আমাদের দেশে রূপা আমদানী বহু আগে বন্ধ হয়ে গেছে। গুপ্তদের সময়ই রূপার অভাব। ড. রায় বলেন, আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত। এ রূপা এসেছে আরাকান থেকে। বর্মা ও এশিয়া জাত রূপা। আরাকানের সাথে ময়নামতির ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এই বাণিজ্য লালমাই-ময়নামতি, পট্টিকেরা নগর ও রাজ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎস এবং তা অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই।[২২]

এই বইয়েরই অন্যত্র 'একটি নতুন রাজবংশ দেব বংশ (আনু. ৭৫০ খ্রি.)' শিরোনামে এক নিবন্ধে তিনি বলেন, ঠিক সপ্তম শতাব্দীতে নয়, কিন্তু অক্ষর সাক্ষ্যে মনে হয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে এই সমতট মণ্ডলেই পট্টিকের (পট্টিকের কুমিল্লা শহরের অদূরবর্তী ময়নামতি) অঞ্চলে আর একটি নতুন রাজবংশের খবর ইতোমধ্যে জানা গেছে। এই রাজবংশের রাজা ভবদেব ছিলেন পরম সৌগত ও তিনি ছিলেন পরম ভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ। আমার ধারণা এই রাজবংশ মাৎস্যন্যয় পর্বেরই অন্যতম একটি সংকেত। এই দারুণ রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের সময় ক্ষুদ্র কোনো অঞ্চলের অধিপতিও স্বাধীন মহারাজাধিরাজ দাবী করলে এতে

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লালমাই পূর্ব-বাংলার পূরাভূমির একটি অংশ। এই অংশে কুমিল্লা শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে ময়নামতির নাতিউঁচু পাহাড় এবং উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় ১০/১১ মাইল তার বিস্তার। এরই একটি অংশে শালবনে ঢাকা বিস্তৃত একটি উঁচু ঢিবিতে গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাশেষ। দুটি স্থানীয় রাষ্ট্রাধিপতি আনন্দদেব ও ভবদেবের নামাঙ্কিত দুটি তাম্রশাসন, ভবদেব মহাবিহার মুদ্রিত একটি লাল বেলে পাথরের সিলমোহর এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু রৌপ্য মুদ্রা যাতে মুদ্রিত আছে 'পট্টিকের' শব্দটি। সন্দেহ নেই পটিকের, পট্টিকের, পট্টিকেরা, পট্টিকেরক, পইটকেরা সমস্তই সমার্থক। একটি নতুন স্থানীয় রাজবংশ এভাবে বাঙালির ইতিহাসে সংযোজিত হলো। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেবের তাম্রশাসনটির বিবরণ থেকে জানা যায়, ভবদেবের পিতা ছিলেন আনন্দদেব ও পিতামহের নাম ছিল বীরদেব। ভবদেবের আরেকটি নাম ছিল 'অভিনব মৃগাঙ্ক'। ভবদেবের প্রধান কীর্তি তাঁর নিজের নামে 'ভবদেব মহাবিহার' প্রতিষ্ঠা। শালবন বিহারের এই ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বিধায় স্থানীয় জনসাধারণ তাকে শালবন বিহার বলে। ভবদেব সমগ্র সমতট অঞ্চলের অধিশ্বর ছিলেন কি না বলা কঠিন। কিন্তু রাজ্যের পরিধি যে বেশ বিস্তৃত ছিল তা অনুমান করা যায়। তার রাজধানী ছিল চণ্ডীমুড়া পাহাড়ের ওপর দেবপর্বত নগরী। চণ্ডীমুড়া পাহাড় ময়নামতি শৈল শ্রেণীর প্রায় দক্ষিণতম প্রান্তে।[২৩]

হরিকেলের বৌদ্ধ রাজগণ

হরিকেল বলতে পূর্ববঙ্গকে বুঝায়। তবে সিলেটের নামান্তরকে কেউ কেউ হরিকেল বলেছেন। কিন্তু হরিকেল রাজ কান্তি দেবের তাম্রশাসন সিলেটে নয় চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে এই রাজবংশের ৩ জন রাজার নাম আছে। এরা হলেন– ভবদত্ত, তাঁর ছেলে ধনদত্ত, ধনদত্তের ছেলে কান্তিদেব। পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম যেখানেই এই রাজবংশের রাজাদের উত্থান ঘটুক না কেন তাঁদের রাজ্য বিস্তার এই তিন অঞ্চলেই ঘটেছিল এতে সন্দেহ নেই। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে হরিকেলকে একটি মণ্ডল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাক্ষ্য থেকে মনে হয় হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটের সংলগ্ন কিছু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ডাকারনব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি একত্র করলে হরিকেল বা হরিকোলা যে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা স্বীকার করতে আপত্তি থাকার কারণ নেই। আর কান্তিদেবের লিপি সাক্ষ্যে মনে হয় সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামও হরিকেলভুক্ত থাকা কিছু বিচিত্র নয়।[২৪]

চন্দ্র রাজবংশ

কুমিল্লা জেলার ভাড়েল্লা গ্রামে প্রাপ্ত এক প্রস্তর মূর্তির পাদপিঠে লড়হচন্দ্র (আনুমানিক দশম শতাব্দীর শেষাংশ) নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, ত্রিপুরা অঞ্চলেই তাঁর আধিপত্যের বিস্তার ছিল এবং তিনি ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ঢাকা জেলার রামপাল ও উখল্লা, ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর ও কেদারপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত ৪টি লিপি থেকে চন্দ্র বংশের ৪ জন রাজার কথা জানা যায়। পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র (পত্নী শ্রী কাঞ্চনা) এবং শ্রীচন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র হরিকেলের অধিপতি ছিলেন ও চন্দ্রদ্বীপ ছিল তাঁদের রাষ্ট্রকেন্দ্র। লিপি প্রমাণ হতে মনে হয় শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চল তাঁদের রাজ্যের অধিভুক্ত ছিল।

তবে প্রত্নপ্রমাণে নিশ্চিতভাবে দেখা যায় রোহিতাগিরির চন্দ্র রাজবংশ সমতটেরই রাজবংশ। এই বংশের ৭ জন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায় : (১) পূর্ণচন্দ্র (২) সুবর্ণচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৪) শ্রীচন্দ্র (৫) কল্যাণচন্দ্র (৬) লড়হচন্দ্র ও (৭) গোবিন্দচন্দ্র।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। পুত্র শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনে তাঁকে মহারাজাধিরাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ করেছেন। চন্দ্রদ্বীপ ও সমতট তাঁর পূর্ণ অধিকারে ছিল।

তাম্রশাসনে আরো জানা যায় ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পিতা সুবর্ণচন্দ্র এবং পিতামহ পূর্ণচন্দ্র রোহিতগিরিতে রাজত্ব করতেন। এই রোহিতগিরি কোথায় তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কেউ কেউ মনে করেন লালমাই-ময়নামতি পাহাড়েই রোহিতগিরি। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন হতে জানা যায় ত্রৈলোক্যচন্দ্র লালম্বী অধিকার করেছিলেন। কুমিল্লার লালমাই পাহাড় যে লালম্বী পণ্ডিতরা এ বিষয়ে একমত। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে। কুমিল্লা জেলার চারপত্র মুড়াতে লড়হচন্দ্রের ২টি এবং তাঁর ছেলে গোবিন্দচন্দ্রের ১টি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তিনটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত সমতট মণ্ডলের অন্তঃপাতি শ্রীপট্টিকেরকে এই দু' নৃপতি ভূমিদান করেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর আহমেদ হাসান দানী চন্দ্র বংশের রাজাদের রাজত্বকাল নিম্নরূপ বলে দেখিয়েছেন :

১. পূর্ণচন্দ্র
২. সুবর্ণচন্দ্র
৩. ত্রৈলোক্যচন্দ্র ৯০০-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
৪. শ্রীচন্দ্র ৯২৯-৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ

৫. কল্যাণচন্দ্র ৯৭৫-১০০০ খ্রিস্টাব্দ
৬. লড়হচন্দ্র ১০০০-১০২০ খ্রিস্টাব্দ
৭. গোবিন্দচন্দ্র ১০২০-১০৫০ খ্রিস্টাব্দ

তিনি মনে করেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তী ৪ জন নৃপতি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিলেন, এরা প্রায় ১৫০ বছর সমতট ও আশেপাশের জায়গা রাজত্ব করেছেন।[২৫] পূর্ণচন্দ্র এবং সুবর্ণচন্দ্রের রাজত্ব সম্বন্ধে কেউই বিস্ত ারিত কিছু জানাতে পারেননি। রোহিতগিরির অধিপতিদ্বয় তাই সকলের কাছেই কৌতূহলের বিষয়।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ত্রৈলোক্যচন্দ্র থেকে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত চন্দ্র রাজাদের কাল নির্দেশ করেছেন এভাবে :

১. ত্রৈলোক্যচন্দ্র ৮৭৫-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ
২. শ্রীচন্দ্র ৯০৫-৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
৩. কল্যাণচন্দ্র ৯৫৫-৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
৪. লড়হচন্দ্র ৯৮৫-১০১০ খ্রিস্টাব্দ
৫. গোবিন্দচন্দ্র ১০১০-১০৩৫ খ্রিস্টাব্দ

ড. রমেশ চন্দ্রের হিসাবে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নবম শতাব্দীতেই রাজসিংহাসন লাভ করেন। আর শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাল একাদশ শতাব্দীর শুরুতে।[২৬]

সমতটের চন্দ্র রাজবংশের রাজাদের অন্তত ৪ জন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মহারাজাধিরাজ অভিধা, অন্যদের পরমসৌগত, পরমেশ্বর, পরভট্টারক প্রভৃতি অভিধা থেকে সহজেই ধারণা করা যায় তাঁদের প্রবল প্রতাপ।

এরা সবাই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে লড়হচন্দ্রের তাম্রশাসন দুটিতে (চারপত্র মুড়ায় প্রাপ্ত) দেখা গেছে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণের কথা কেউ কেউ মনে করলেও তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসনে তাঁকে বুদ্ধের উপাসকই বলা হয়েছে। তাঁর দুটি তাম্রশাসন ও সীলমোহরেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক ধর্মচক্রই ব্যবহৃত হয়েছে। গোবিন্দচন্দ্র ও লড়হচন্দ্রের ৩টি তাম্রশাসনে ভূমি দানের কথা বলা আছে। বড়কামতার ৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ভাড়েল্লা গ্রামে প্রাপ্ত শীর্ষমূর্তির পাদদেশে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তা হতে জানা যায় কর্মান্ত (বড়কামতা) শাসক কুসুমদেবের পুত্র ভবদেব এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ছিল লড়হচন্দ্রের রাজত্বকাল এবং ভবদেব ছিলেন লড়হ চন্দ্রের সামন্ত।

রাজেন্দ্রচোলের 'তিরুমলয়গিরি' লিপি থেকে জানা যায় তিনি 'বঙ্গাল' দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবকে পরাজিত করেছিলেন। প্রফেসর দানী বলেন, এটি

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১০২০ থেকে ১০২১ খ্রিস্টাব্দে। গোবিন্দচন্দ্র কমপক্ষে আরও ২০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন বলে তাঁর ধারণা। এতে মনে হয় তিনি তাঁদের রাষ্ট্রকেন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ কিংবা ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চল থেকে পরাজিত হয়ে সরে এসে সমতটে বাকি সময় রাজত্ব করেন। লামা তারানাথের বিবরণীতে গোবিন্দচন্দ্রের পরে ললিতচন্দ্র নামক এই বংশের আর একজন নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত গোবিন্দচন্দ্রের পরেই চন্দ্র বংশের পতন ঘটে। এ বংশের পতনের কারণ জানা না গেলেও কেউ কেউ বর্মন রাজশক্তির অভ্যুদয় এবং কেউ কেউ পাল রাজাদের দোর্দণ্ড প্রতাপকে দায়ী করেন।

চন্দ্রাধিপত্য

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় পাল বংশের রাজারা শাসনাধিপত্য বজায় রাখেন। এরা প্রায় চারশত বৎসর রাজত্ব করেছেন। সমতটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় রাজ্য শাসন করেন চন্দ্রবংশের রাজারা। ঐতিহাসিকভাবে জানা মতে এরা প্রায় দেড়শত বছর রাজত্ব করেন। প্রাচীন বাংলার শাসন-ইতিহাসে চন্দ্রদের অবস্থান দ্বিতীয়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, তাঁদের মধ্যে দু'জনের (পূর্ণচন্দ্র এবং সুবর্ণচন্দ্র) শাসন মেয়াদের কথা আমরা জানি না। তাঁদের সময় পঞ্চাশ বছর ধরলে চন্দ্রদের শাসনকাল দুশ' বছরে দাঁড়ায়।

তাঁদের উদ্ভব হয়েছিল রোহিতগিরি থেকে। এই রোহিতগিরি কোথায় এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন এটি বিহারের অন্তর্গত বর্তমান রোহটাসগড়। কিন্তু ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন রোহিতগিরি কুমিল্লার লালমাই পাহাড়। লালমাটি থেকে লালমাই। রোহিত হচ্ছে লোহিত এবং লোহিত মানে লাল। তাঁর মতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এই লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন বলেন, পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রই বোধহয় এই রাজবংশের প্রথম পুরুষ যিনি বৌদ্ধ ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, কিন্তু এই বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র। তবে তিনি মনে করেন স্বাধীন নরপতি না হলেও পূর্ণচন্দ্র যে একজন স্থানীয় প্রভাবশালী প্রধান ছিলেন এমন অনুমানে কোনও বাঁধা নেই।[২৭]

রাজা পূর্ণচন্দ্র এবং সুবর্ণচন্দ্র স্বাধীন রাজা না থাকলে সামন্ত রাজা ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করে নিজের প্রভাবকে আরও বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। তখনকার দিনে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা আমরা সবাই জানি। এ দু'জন রাজার রাজ্যশাসনের পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া গেলেও এদের উত্থান সহজেই অনুমান করা যায়। চন্দ্র রাজাদের ভিত রচনা করেছিলেন এ দু'পথিকৃৎ। তাই চন্দ্রাধিপত্যে

তাঁদের অবদান স্বীকার করে আমরা তাঁদের শাসনের আনুমানিক কালকে গুরুত্ব দিতে চাই। সিলেট জেলার পশ্চিমভাগ গ্রামে রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে খননের ফলে ময়নামতি পাহাড়ের চারপত্র মুড়ায় পাওয়া যায় তিনটি তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনে লড়হচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের নাম রয়েছে। এখানে পাওয়া আর একটি তাম্রশাসন থেকে আর এক রাজা শ্রীবীর-ধরদেবের কথা জানা যায়। তিনিও ভূমিদান করেছিলেন। সে সময় শুধু স্বাধীন রাজারাই ভূমিদান করতে পারতেন। তাম্রশাসনটির লিপি সাক্ষে; মনে হয় শ্রীবীর-ধরদেব একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোনও এক সময় সমতট মণ্ডলের ময়নামতি অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁর নামের সাথে চন্দ্রদের নামের মিল নেই। অর্থাৎ তিনি 'চন্দ্র' পদবী ব্যবহার করেন নি। এর থেকে তাঁকে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বংশধর বলতে কেউই চাইবেন না। আমরাও তাঁকে আলাদা রাজবংশের স্বাধীন রাজা বলার পক্ষপাতি।

রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র বিভিন্ন দিকে রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। হরিকেল (সিলেট) অঞ্চলে তাঁর প্রভুত্ব ছিল। সমতটের তিনি একচ্ছত্র অধিকারী। ড. রায় মনে করেন, তখন এই সমতটের রাজধানী ছিল ক্ষীরদা নদী (কুমিল্লার শহরোপান্তে গোমতী নদীর শাখা খিরা বা খিরানাই নদী) তীরবর্তী দেবপর্বত। এই দেবপর্বত ছিল দেববংশীয় রাজা ভবদেব এবং রাজা কান্তিদেবের রাজধানী। দেবপর্বতের অবস্থিতি ছিল লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের ওপর। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের কিছুকাল আগে কম্বোজ রাজাদের হাতে দেবপর্বত বিধ্বস্থ হয়েছিল এরকম একটি ইঙ্গিত শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের আগে সুবর্ণ কিংবা পূর্ণচন্দ্রের কালে কি তাহলে কম্বোজদের হাতে ময়নামতির পতন ঘটেছিল? এটি এ বংশের আগেও হতে পারে। ধ্বংসলীলা ছাড়া কম্বোজরা আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন ইতিহাসে রেখে যায়নি। এই কম্বোজদের বিতাড়িত করেছিল কে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও দেবপর্বত থেকে বঙ্গের বিক্রমপুর কিংবা চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থানান্তর করার মধ্যে এই ধারণা সুস্পষ্ট যে দেবপর্বত রাজধানীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কম্বোজদের বিতাড়িত করবার পরও দেবপর্বতে রাজধানীর অনুকূল অবস্থা ছিল না। এটাও হতে পারে যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কিংবা শ্রীচন্দ্র রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নতুন অধিকৃত এলাকায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য রাজধানী স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এরা বঙ্গে এবং চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এরকম প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর করতলগত ছিল। পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন থেকে জানা যায় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সমতটমণ্ডলের সমগ্র অঞ্চলও এ রাজ্যভুক্ত ছিল। ইদিলপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ফরিদপুর অঞ্চল

অর্থাৎ ঢাকা ও ফরিদপুর চন্দ্রদের অধিকারে চলে যায়। পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন থেকে আরও মনে হয় শ্রীচন্দ্র কামরূপে বিজয়াভিযান পাঠিয়েছিলেন। লড়হচন্দ্রের প্রথম ময়নামতি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তিনি গৌড়দের পরাজিত করেছিলেন।

এ রাজবংশের রাজা কল্যাণচন্দ্র ম্লেচ্ছ এবং গৌড়দের অপমানিত করেছিলেন বলে জানা যায়। ড. রায় মনে করেন তিনি হয়তো পিতা শ্রীচন্দ্রের সঙ্গে কামরূপ প্রাগজ্যোতিষ এবং গৌড় অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং ম্লেচ্ছ বলতে দীনেশচন্দ্রের মতো মেচ কোম ও কম্বোজ বলতে কোচ কোমকে বুঝিয়েছেন। লড়হচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষদের সকল উপাধিই ধারণ করেছিলেন (পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ)। এসব থেকে তাঁর প্রতাপ এবং আধিপত্য বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধিকবার বারাণসী এবং প্রয়াগে গিয়েছিলেন। পট্টিকেরকে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজা শ্রীচন্দ্র সিলেট অঞ্চলে একটি বিরাট দেবস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের এসব কীর্তি এবং ভূমি প্রদান নিঃসন্দেহে চন্দ্রবংশের রাজাদেরকে সমকালে গৌরবের আসনে বসিয়েছে। এই বংশের শেষ প্রতাপশালী রাজা গোবিন্দচন্দ্র শিব ভট্টারকের নাম করে নট্টেশ্বর ভট্টারকের উদ্দেশ্যে পেরনাটন বিষয়ে (সমতট মণ্ডলে) সাহরতলাক গ্রামে ভূমিদান করেন। ড. রায় মনে করেন গোবিন্দচন্দ্রই চন্দ্রবংশের শেষ রাজা এবং চোলসম্রাট রাজেন্দ্রচোলের কাছে পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তিনি আরও মনে করেন এই গোবিন্দচন্দ্রই মধ্যযুগীয় ময়নামতি গানের রাজা। তবে তাঁর মতে চন্দ্রবংশের পতনের কারণ রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ বিজয় নয়, কলচুরিরাজ কর্ণের বঙ্গ বিজয়াভিযানের ফল। কর্ণ দাবী করেছেন তিনি পূর্বদেশের এক রাজাকে বিষম যুদ্ধে পরাজিত ও পরাভূত করেছিলেন। এই রাজা গোবিন্দচন্দ্রই হওয়া সম্ভব।

চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে সমতট অঞ্চলে কম্বোজদের অভিযানের কথা জানা যায়। জানা যায় এরা দেবপর্বত ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আরও জানা যায় রাজেন্দ্রচোল অভিযান পরিচালনা করে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেছিলেন। এছাড়া চন্দ্রবংশের পতন হয়েছিল কলচুরিরাজ কর্ণের বঙ্গাভিযানে। এই তিনটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে কোনও শাসন পরিচালনা করেছিল কী না এ ব্যাপারে ইতিহাস নীরব রয়েছে। ড. রায় অবশ্য বলেছেন রাজেন্দ্রচোল পূর্বভারতে রাজ্য বিস্তার করতে আসেননি। তাঁর অভিযান ছিল আলেকজান্ডারের মতোই সাময়িক দিগ্বিজয়াভিযান। কলচুরিরাজ কর্ণের অভিযানের ফলে যদি গোবিন্দচন্দ্রদের চন্দ্রবংশের পতন হয়ে থাকে তাহলে ধরে নেয়া স্বাভাবিক যে কলচুরিরাজ কর্ণরা কিছুকাল হলেও পূর্বদেশ অর্থাৎ সমতট অঞ্চল শাসন করেছিলেন। লামা তারানাথ এই বংশের আর এক রাজা ললিতচন্দ্রের কথা বলেছেন। গোবিন্দচন্দ্রের পরে তাঁর আবির্ভাব। কিন্তু এ রাজার কোনও তাম্রশাসন বা কীর্তির পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

লামা তারানাথের চন্দ্রবংশ কাহিনীতে আছে পালদের আগমণের আগে প্রাচীন বাংলাদেশে একটি চন্দ্রবংশ সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছে। সমসাময়িক কালে বার্মায় আর একটি চন্দ্রবংশ সুদীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেছে। প্রাচীন বাংলাদেশ সংলগ্ন আরাকানে আরাকানী চন্দ্রবংশের রাজাদের ইতিহাস ঐতিহাসিকদের অনেক আগেই জানা। আরাকানের রাজধানী বৈশালী এবং মধ্য বার্মার পগান এই রাজবংশের কীর্তি ধারণ করে আছে। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজা আনন্দচন্দ্র (আনুমানিক ৭০৩ খ্রিস্টাব্দ) বৈশালীর নিকট সীথাউং নামক স্থানের এক স্তম্ভগাত্রে তাঁর বংশের চব্বিশজন রাজার উল্লেখ এবং একুশজনের নাম লিপিবদ্ধ করান। স্তম্ভটিতে আনন্দচন্দ্রসহ চন্দ্রবংশের সকল রাজার প্রশংসা করা হয়েছে।

আরাকানের চন্দ্রবংশের সঙ্গে সমতটের চন্দ্রবংশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। ড. রায়ও মনে করেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কারণ রয়েছে। আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রচুর ধাতুমুদ্রা পাওয়া গেছে। দু'দেশের মুদ্রার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের মত্যে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে যেগুলো লালমাই-ময়নামতির নতুন আবিষ্কৃত মূর্তির মতই।

আরাকানী এবং রোহিতগিরির চন্দ্রবংশের রাজাদের সম্পর্কসূত্রে ড. নীহার-রঞ্জন রায় নতুন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পট্টিকেরা অংশে আমরা বার্মার এক রাজকুমারীর সঙ্গে পট্টিকের রাজার এক রাজপুত্রের প্রণয়ের কথা বলেছি এবং তার পরিণামও ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা করেছি। ড. রায় বলেন পগানরাজ আনাউরহথা (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর আরাকান জয় এবং অধিকার করেন। তাঁর রাজ্যের সীমা পট্টিকের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কারো কারো মতামতের আলোকে তিনি বলেন এই রাজ্যের সীমা প্রতিবেশী রাজ্য পট্টিকেরে চলে আসে এবং এখানে নতুন এক চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। এই বংশই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার, বঙ্গ-বঙ্গালের চন্দ্রবংশ। তবে এই মতের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। কারণ পট্টিকেরার রাজবংশ স্বাধীন সার্বভৌম রাজবংশ ছিল। বার্মা থেকে তাঁদের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এছাড়া বার্মার ইতিহাসে দেখা যায় যে পট্টিকেরা রাজবংশের রাজপুত্রের সন্তান এবং তাঁর বংশধরেরা বার্মায় প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেছেন। এদের মধ্যে পট্টিকেরার যুবরাজের আলং সন্তান ৭৫ বছর রাজত্ব করেন। ড. রায়ও মনে করেন এই অনুমানের যুক্তি ও সাক্ষ্য সম্মত কোনও কারণ এখনও দেখতে পাওয়া যায় না। আনাউরহথার আরাকান বিজয় ১০৪৪ খ্রিস্টাব্দের আগে হতে পারে না। শ্রীচন্দ্রের রাজবংশ তার অনেক আগেই সমতটমণ্ডলে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় (পট্টিকের যার অন্তর্ভুক্ত) সুপ্রতিষ্ঠিত। উল্লেখ্য, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময়কালই ৮৭৫-৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই আরাকানী চন্দ্রবংশ এখানে এসে চন্দ্রবংশের পত্তন করেছে তা মানা যায় না।

ড. রায় স্বীকার করেছেন লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের উৎখননের ফলে চন্দ্রবংশসহ অন্যান্য রাজাদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে এতে করে বাঙালির ইতিহাস নতুন করে লেখবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন এ গ্রন্থের (বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব) পূর্ববর্তী সংস্করণে যা লেখা ও ছাপা হয়েছিল তার প্রায় সবটাই নতুন করে লিখতে হয়েছে। কোনও প্রাচীন রাজবংশের আবিষ্কার অতীতে বোধ হয় কখনোই এমনভাবে পুরো ইতিহাসকে পাল্টে দেয়নি। চন্দ্র বংশের দেড়-দু'শ' বছরের ইতিহাস শুধু সমতট বা পট্টিকেরা নয়, সমস্ত বাংলাদেশ তথা বাঙালির ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়। পালদের কথা বাদ দিলে (কারণ এরা সমতটে খুব অল্প সময়ই রাজত্ব করেছেন) চন্দ্রবংশের রাজারাই ইতিহাসের সেরা রাজবংশ।

ময়নামতি ও রাজা গোপীচন্দ্র

তাম্রশাসন কিংবা কোনো মুদ্রায় নয় ষোড়শ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে লেখা নাথ-সাহিত্যে রাণী ময়নামতি, তাঁর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্র এবং তাঁদের পূর্ববর্তী রাজা হিসেবে মানিকচন্দ্র, তলিকচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র প্রমুখের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা নাথসাহিত্যের কারণে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। তাঁদের আগের ও পরের রাজাদের নাম, পরিচয়, রাজত্বকাল গবেষণা করে বের করতে হলেও নাথ সাহিত্যের রাজা-রাণীদের নাম এখনও লোকদের মুখে মুখে। কেউ কেউ মনে করেন চন্দ্র বংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও নাথসাহিত্যের গোপীচন্দ্র একই ব্যক্তি। লক্ষ করলে দেখা যাবে চন্দ্র বংশের প্রথম দু' রাজার নামও (পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র) নাথসাহিত্যের তালিকায় শোভা পাচ্ছে। তাহলে চন্দ্র বংশ ও নাথ-সাহিত্যের গোপীচন্দ্রদের বংশ কি অভিন্ন? এটি আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

পাল বংশের রাজত্ব

বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল বংশের রাজত্বকাল এক গৌরবজনক অধ্যায়। বহু ঘটনা এবং ইতিহাস পালদের রাজত্বকে নিয়ে। তাঁদেরকে 'বঙ্গেশ্বর', 'বঙ্গাধিপতি' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করলেও বহুকাল আগে পর্যন্ত সমতটে তাঁদের রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার উপায় ছিল না। সম্প্রতি কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার অন্তর্গত মন্দুক গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্তির শিলালেখ থেকে জানা যায় গোপাল নামে এক নৃপতির প্রথম রাজ্যাঙ্কে এটি উৎকীর্ণ। এই গোপাল পাল বংশের দ্বিতীয় গোপাল (৯৪০-৯৬০ খ্রিস্টাব্দ) বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

খালিমপুর লিপিতে ৩টি শ্লোকে পাল বংশের রাজা ধর্মপালের বংশ পরিচয় আছে। প্রথম শ্লোকটি দয়িত বিষ্ণুর, দ্বিতীয় শ্লোকে বপ্যট ও তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে মাৎস্যন্যায় দূর করবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করিয়েছিলেন। ধর্মপাল তাঁরই পুত্র। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনো এক

সময়ে গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতকে তৃতীয় পাদে গোবিন্দ পালের সময় এ বংশের বিলুপ্তি ঘটে। সুদীর্ঘ চার শত বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্ন একটি রাজবংশের রাজত্ব খুব কম ইতিহাসেই দেখা যায়। এই গোপাল কে ছিলেন তা জানা যায় না। তাঁর বংশ পরিচয় নিয়ে, তাঁর ক্ষমতায় আরোহন নিয়ে, পণ্ডিতদের মধ্যকার বিতর্ক আজও শেষ হয় নি। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন গোপাল দেবের কূলগৌরব কিছু ছিল বলে মনে হয় না, তেমন দাবিও তাদের থেকে করা হয় নি। হয়তো তিনি একজন সামন্ত নায়ক ছিলেন। অথবা ছিলেন না। প্রকৃতিপুঞ্জ কারা যারা তাঁকে নির্বাচন করেছিল? অভিধানে প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে প্রজা। তখন প্রজাগণই কি সম্মিলিতভাবে গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিলেন? প্রকৃতি অর্থ যদি রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী বা বিশিষ্ট ব্যক্তি হয় তাহলে এরা কি গোপালকে নির্বাচন করেছিলেন? তা মনে হয় না। বরং মনে হয় সামন্ত নায়কেরাই বহু বছর নৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়-এ উৎপীড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত সকলে একত্রিত হয়ে এই নির্বাচনটি সম্পন্ন করেছিলেন।

যারাই গোপালকে রাজ ক্ষমতায় বসাক না কেন তখন অত্যাচারিত হয়েই এ পথ বেছে নেয়। 'অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র হরিভদ্র কৃতটীকায় ধর্মপালকে 'রাজভটাদি বংশপতিত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খালিমপুর লিপির 'ভদ্রাত্মজা' শব্দ কেউ কেউ ধর্মপালের মাতা দেজাদেবীর বিশেষণ বলে মনে করেছেন। পণ্ডিতদের মধ্যে এ দু' পদের অর্থ নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। চেষ্টাটা পাল বংশের রাজকীয় আভিজাত্য প্রমাণের দিকেই। তাদের উদ্ভব কোথায় এ নিয়েও মতভেদের শেষ নেই। তিব্বতি লেখক লামা তারানাথ ধর্মপালের সঙ্গে সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতে' ধর্মপালকে 'সমুদ্রকুলদ্বীপ' উদ্ভব বলেছেন। ধনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমুদ্রের সঙ্গে ধর্মপালের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। ড. রায় বলেন সমুদ্রাশ্রয়ী ও জলনিধিদূর্গ নির্ভর গৌড়জনকের সঙ্গে কিংবা সামুদ্রেক বা সমুদ্রাশ্রয়ী আদি অস্ট্রেলীয় পলিনেশীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলার পাল বংশের কোনো সম্বন্ধের ইঙ্গিত এসব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে পাল বংশকে বলা হয়েছে 'দাসজীবীনঃ'। আবুল ফজল বলেছেন কায়স্থ। তবে এরা বাঙালি ছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর ভাষায়, পালদের জন্মভূমি বরেন্দ্রী দেশ। ভোজদেবের গোয়ালিয়র লিপিতে পাল রাজকে বলা হয়েছে বঙ্গপতি। লামা তারানাথ বলেছেন পুণ্ড্রবর্ধনের কোনো ক্ষত্রিয় বংশে গোপালের জন্ম। পরে তিনি ভঙ্গলের (বঙ্গালের) রাজা নির্বাচিত হন। গোপাল এ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও এই বংশের রাজা ধর্মপালের সময়েই তা শুধু রাজ্য নয় সাম্রাজ্যে রূপ নেয়। সমতট অঞ্চল পাল বংশের আধিপত্যে এ সময়েই চলে যাবার সম্ভাবনা বেশি। তবে দ্বিতীয় গোপাল, মহীপাল প্রমুখ পাল রাজাদের বাইরে অদ্যাবধি কোনো তাম্রশাসন বা শিলালিপি না

পাওয়ায় তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে ভাণ্ডারি বাড়ির একটি প্রাচীন জলাশয় পরিষ্কারকালে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিলেখে বলা আছে নৃপতি মহীপাল দেবের রাজত্বের ৩য় বর্ষে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত বিলকিন্দ নিবাসী লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব বণিক তাঁর মাতাপিতার ও নিজের পুণ্যফল বৃদ্ধির জন্য এই নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চাঁদপুর জেলার নারায়ণপুর গ্রাম থেকে একটি গণেশ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তির পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় মহীপাল দেবের রাজত্বের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে বণিক বুদ্ধমিত্র এ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটি শিলালিপি থেকেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে দ্বিতীয় গোপাল এবং প্রথম মহীপাল সমতট তথা কুমিল্লা অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কুমিল্লার অদূরবর্তী ফেণীর কেন্দ্রস্থল 'মহীপাল' নামটি সম্ভবত পালরাজা মহীপালের নামেই হয়ে থাকবে।

গোপালের পুত্র ছিলেন ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০ খ্রিস্টাব্দ), ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ), দেবপালের পুত্র বিগ্রহপাল, বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল ৫৪ বছর রাজত্ব করেছিলেন, নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপাল (৯১৭-৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) এবং তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল (৯৫২-৯৭২ খ্রিস্টাব্দ) গোপালের পুত্র মহীপাল (৯৭২-১০২৭ খ্রিস্টাব্দ), মহীপালের পুত্র নয়পাল (১০২৭-১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ), নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল (১০৪৩-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ), বিগ্রহপালের তৃতীয় পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-১০৭১ খ্রিস্টাব্দ), দ্বিতীয় সুরপাল (১০৭১-১০৭২ খ্রিস্টাব্দ) এবং রামপাল (১০৭২-১১২৬ খ্রিস্টাব্দ) পালবংশের রাজা হন।

রামপাল মাতুল মথনের মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে পরিণত বার্ধক্যে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। সেই সঙ্গে পাল বংশের সুদীর্ঘ চারশত বছরের পতাকাও যেন বিসর্জিত হয়ে যায়। রামপালের পুত্র কুমারপাল (১১২৬-১১২৮ খ্রিস্টাব্দ), কুমারপালের পুত্র তৃতীয় গোপাল (১১২৮-১১৪৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং তৃতীয় গোপালের পর রামপালের আরেক পুত্র মদন পাল (১১৪৩-১১৬১ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্ব করলেও মদন পালই পাল রাজবংশের শেষ রাজা।

পালদের এই চারশত বৎসর রাজত্বকালে সবচেয়ে বড় ঘটনা কৈবর্ত্য বিদ্রোহ। এ সময় কৈবর্ত্যদের নেতা ছিলেন দিব্য কৈবর্ত্য। তিনি পালদের পরাজিত করে বরেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব স্থাপন করেন। দ্বিতীয় মহীপাল স্বীয় ভ্রাতা সুরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করে কৈবর্ত্য বিদ্রোহ দমন করতে গেলে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। 'রামচরিতে' সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যকে পাল রাষ্ট্রেরই একজন নায়ক কর্মচারী বলেছেন। তার বিদ্রোহের কারণ জানা যায় না। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁকে

পছন্দ করতেন না। তাই তাঁকে 'কুৎসিৎকৈবর্ত্যনৃপ' এবং তাঁর বিদ্রোহকে 'অনিকধর্মবিপ্লব' বলেছেন। বরেন্দ্র ভূমি অধিকার করলেও সমতট অঞ্চলে কৈবর্ত্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না।

রাজ্য পালের পুত্র দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে গৌড়ে কম্বোজদের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাদের আক্রমণে তিনি রাজ্যহারা হন। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট) তাম্রশাসনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতাপশালী চন্দ্রবংশের নৃপতি শ্রীচন্দ্র (৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) কামরূপ জয় করে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং গোপালকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্ণিত তাম্রশাসনটিতে আরো বলা হয়েছে ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৯০০-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) সমতটের লালম্বী পাহাড় অধিকার করেছিলেন। তখন কম্বোজদের আগমণ বার্তা পাওয়া গিয়েছিল। তাদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সম্ভবত দ্বিতীয় গোপাল শ্রীচন্দ্রের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তার স্মৃতি ও সম্মান রক্ষার্থে মূর্তির লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। মন্দুকে এখনও বহু প্রাচীন কীর্তির ধংসাবশেষ ঢিবিরূপে বিরাজমান।

দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র প্রথম মহীপাল (৯৭২-১০২৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব হলো পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার। সমস্ত বঙ্গদেশ পালদের হস্তচ্যুত হয়ে মগধ অঞ্চলেই পালদের শাসন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। মহীপাল হৃত উত্তর ও পূর্ববঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। ত্রিপুরা জেলায় তার তৃতীয় ও চতুর্থ রাজ্যাঙ্কের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। লিপি দুটি বিলকিন্দ গ্রামবাসী (বাইলকান্দী গ্রাম) দু বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একটি বিষ্ণু ও একটি গণেশ মূর্তি, মূর্তির পাদপিঠে এ তথ্য উৎকীর্ণ।

মহীপালের রাজত্বের নবম বর্ষে উৎকীর্ণ বাণগড় লিপি থেকে জানা যায় উত্তর বঙ্গ তখন তার অধিকারে ছিল এবং রণক্ষেত্রে বহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষকে নিবৃত্ত করে অনধিকারী কর্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করে রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করে অবনিপাল হয়েছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও সমতট অধিকার করেন। সে সময় বাঘাউড়া ও নারায়ণপুরে যথাক্রমে ৯৯১ ও ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মূর্তিলিপি উৎকীর্ণ হয়। এসময় সমতটে কল্যাণচন্দ্র অথবা লড়হচন্দ্রের রাজত্ব চলছিল। এরা উভয়ই ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রতাপশালী নৃপতি। এদের সময় মহীপালের রাজধানী বিক্রমপুর অধিকার সম্ভবপর ছিল না বলে অনেকে মনে করেন। পরবর্তী সময় গোবিন্দচন্দ্রের আমলেও তাঁদের রাজ্য দখল করা অসম্ভব ছিল বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন। বাগাউড়া ও নারায়ণপুরে যে মহীপালের কথা লিপিতে উল্লেখ আছে ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার তাঁকে দ্বিতীয় মহীপাল বলেছেন। কেউ কেউ এ বক্তব্য সমর্থনও করেন। তবে এটি সম্ভব নাও হতে পারে।

মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়েও সমতটভূমি পালদের অধীনেই ছিল।

মহীপালের পৌত্র বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (১০৪৩-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকেরা রাজ্য গড়ে ওঠে। এই পট্টিকেরা রাজ্যের সমসাময়িক পগানের (বার্মা) আনাহউরহথাহ বা অনিরুদ্ধের রাজবংশের কয়েক পুরুষের রাষ্ট্রীয় ও বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে।[২৮] এছাড়া চন্দ্র বংশ ও পরে বর্মণদের রাজত্বকালে পালরা এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

বর্মণ রাজবংশ

ঢাকা জেলার বেলাব (বর্তমান নরসিংদী জেলায়) গ্রামে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে সমতট অঞ্চলে বর্মণদের রাজ্য বিস্তারের কথা জানা যায়। ইতিহাসে জানা যায় যাদব বংশীয় এই বর্মণ রাজারা কলিঙ্গ দেশের সিংহপুর নামক স্থান থেকে একাদশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ববঙ্গে এসে আধিপত্য স্থাপন করেন। বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা এই বংশের প্রথম রাজা। রামপালের কাছে কৈবর্তরাজ দিব্যের পরাজয় ঘটে থাকলেও জাতবর্মা দিব্যকে পরাজিত করেন এরকম দাবী রয়েছে। তিনি রামপালের সমসাময়িক। মহীপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় জাতবর্মা সে সুযোগে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জায়গা দখল করে নেন। জাতবর্মার পর তার পুত্র মহারাধিরাজ হরিবর্মা রাজা হন। বিক্রমপুরে তাঁদের রাজধানী ছিল। তাঁর সান্ধিবিগ্রহিক (মন্ত্রী) ছিলেন ভট্টভবদেব। বেলাব লিপিতে সিদ্ধোল গ্রামের উল্লেখ আছে। এই সিদ্ধোল গ্রামেই পণ্ডিত এবং মন্ত্রী ভট্টভবদেবের জন্মভূমি। ভূবনেশ্বর লিপিতে ভবদেবভট্ট তাঁর জন্মভূমি সিদ্ধোল গ্রামে বলেছেন। হরিবর্মার পর তাঁর ভাই শ্যামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন। তাঁর পুত্র ভোজবর্মা এই বংশের শেষ রাজা। ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী মনে করেন বর্মণ রাজদের সময় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।[২৯] পাল রাজশক্তি দুর্বল হলেই সমতটে তাঁদের রাজ্যবিস্তার ঘটে। বেলাব তাম্রশাসনটি রাজা শ্যামলবর্মার। তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে বেলাব তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। এই তাম্রশাসনে পরম বৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বর্মণ রাজারা স্বাধীন ও পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলজী গ্রন্থ থেকে জানা যায় শ্যামলবর্মার আমলেই বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমণ ঘটে। সমতটভূমিসহ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সামাজিক বর্ণবিন্যাসের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমিকা সবচেয়ে বড়। এর আগে সমতট ভূমিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সমাজের অনভিজাতমনা ভেদবৈষম্যহীন সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

সেন বংশ

বর্মণদের পরে অন্যান্য স্থানের মতো সমতটেও সেনদের রাজ্যবিস্তার ঘটে। ১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেনরা বঙ্গদেশ শাসন করেছেন। সেন বংশের রাজারা নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়েছেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র, ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয় ও কর্ণাট ক্ষত্রিয়। তাঁদের পূর্ব পুরুষ বীরসেনকে চন্দ্রবংশীয় ও পুরাণ কীর্তিত বলে দাবী করা হয়েছে। সেন রাজত্বের প্রথম রাজা বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেন রাঢ় বঙ্গের গঙ্গাতীরে দিন কাটিয়েছেন। ধারণা করা হয় পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন এবং তার পুত্র বিজয়সেন নিজেদের ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সামন্তসেনের পুত্র হেমন্ত সেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত চক্রের বিদ্রোহের ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে সামন্তাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন ক্রমে পূর্ববঙ্গের দিকে এসে বর্মণবংশীয় রাজাদের হাত থেকে পূর্ববঙ্গ কেড়ে নিয়েছিলেন। রাজকীয় লিপিতে তার সাক্ষ্য রয়েছে। সেন বংশের গোড়ার দিকে সমস্ত লিপিরই উৎস্য 'বঙ্গবিক্রমপুরভাগে'।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন (আনু: ১১৫৯-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর আমলেই সেন রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা পর্যন্ত। বল্লালসেন বাংলার ইতিহাসে নানা কারণে আলোচিত ব্যক্তি। তিনি সমাজে বর্ণ প্রথা চালু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর তিনি নিজেও বর্ণ প্রথার বলি হয়েছিলেন। 'অদ্ভূতসাগর' নামে তাঁর একটি অসমাপ্ত বই আছে। এর আগে তিনি 'দানসাগর' নামে আরেকটি বই লেখেন। এই বই শেষ করার আগেই পুত্র লক্ষণসেনের হাতে রাজ্যভার ও গ্রন্থ শেষ করবার দায়িত্ব অর্পণ করে স্বপত্নীক গঙ্গ-যমুনা সঙ্গমে নিরঞ্জনপুরে গমন করেন। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে দু'জনেই জলে ঝাঁপ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন।

লক্ষণসেন (১১৭৯-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ৬০। তিনিও পিতার মতো রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে নিজের শক্তিক্ষয় করেছিলেন। গয়া ও কাশী বিজয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। একথা সবারই জানা যে মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী প্রায় বিনা বাধায় সমস্ত বিহার ও বাংলা জয় করেন। ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতেরা মনে করেন ভ্রান্তিপূর্ণ যুদ্ধকৌশল এবং স্থানীয় আত্মকর্তৃত্বের ব্যধি অর্থাৎ সমান্ততন্ত্র সেন রাজত্বকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

মুসলমানদের কাছে রাজ্যের পশ্চিমাংশের অধিকার হারিয়ে নদীয়া বদ্বীপ পরিত্যাগ করে লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গ চলে আসেন।[৩০] সেখানে অল্পকাল রাজত্ব করে তিনি পরলোক গমন করেন (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ)। ঐতিহাসিক মিনহাজ এ তথ্য দেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় লক্ষণসেন ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

জীবিত ছিলেন। ভাওয়াল ও মাধাইনগরের লিপি দুটি তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গে সরে এসেছিলেন। কারণ নদীবহুল পূর্ববঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থান গৌড় বরেন্দ্রের মুসলমান নরপতি ও সেনা নায়কদের অগ্রাভিযানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া এতদঞ্চলে শক্তি সংগ্রহ করে লক্ষণ সেন ও তাঁর বংশধরেরা তুর্কী শাসকদের প্রতিহত করেছিলেন এমন সাক্ষ্য ইতিহাসে রয়েছে। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন, তাঁর বই লেখার সময়ে সেন রাজারা বঙ্গে রাজত্ব করছিলেন। লিপি প্রমাণ হতেও নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, সেন রাজারা পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে আরও অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষণসেনের পরে বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। এরা দুজনই 'সর্গম-যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র' বলে নিজেদের পরিচয় দান করেছেন। তাঁদের রাজত্বকালে তুর্কী আক্রমণ ও পরাজয়ে কোনো গ্লানি স্পর্শ করে নি। ড. রায় বলেন সেন রাজারা যেভাবে তাদের লিপিতে সর্বপ্রকার ঔপধিক আরম্ভ ও চিরাচরিত রীতি ও অভ্যাস বজায় রেখেছেন তাতে মনে হয় না মুসলমান বিজয়ের যথার্থ ঐতিহাসিক ইঙ্গিত এরা যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও এই সংকটময় বৈপ্লবিক আবর্তনের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এতে মনে হয় এখানে তাদের অভ্যন্তরীণ শাসন খুব সংহত ছিল। মুসলমান সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন, মালিক সাইফউদ্দিন বলবন এবং ইয়াজউদ্দিন বলবন কয়েকবার পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করেও সফল হন নি। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা মতে সেন রাজারা ১২৬০ খ্রিস্টাব্দেও পূর্ববঙ্গ শাসন করেছেন। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের তাম্র শাসনে বিক্রমপুর ও দক্ষিণবঙ্গে ভূমিদানের কথা বলা আছে। বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের চতুর্দশ বৎসরে এবং পরে আরো একটি প্রদত্ত হয়েছিল। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের ৩য় বৎসরের। এ দু ভাই কমপক্ষে ২৩ বৎসর করে পূর্ববঙ্গ শাসন করেছেন এমন প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেশবসেনের মৃত্যু হয় আনু: ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে।

কেশবসেনের মৃত্যুর পরে আরও কয়েকজন সেন রাজার নাম আবুল ফজলেব আইন-ই-আকবরী এবং রাজাবলী গ্রন্থে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে মাধবসেন, শূরসেন, মধুসেন, সূর্যসেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতেরা মনে করেন স্বতন্ত্র ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা এসব রাজার নাম বা কীর্তিকাহিনী সমর্থিত নয়। তবে এদের মধ্যে মাধবসেন ও শূরসেনের নাম একান্ত অনৈতিহাসিক নাও হতে পারে। সেনবংশীয় কোনও কোনও রাজপুত্র স্থানীয় সামন্তরূপে রাজত্ব করে থাকতে পারেন।

পূর্ববঙ্গেও সেন রাষ্ট্রের ভিত এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ১২২১ খ্রিস্টাব্দের আগেই কোনো এক সময় পট্টিকেরা রাজ্যে (ত্রিপুরা জেলা) রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষণসেনের জীবিতাবস্থাতেই সম্ভবত মেঘনার

পূর্বতীরে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে এক দেব বংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়া ক্রমান্বয়ে মুসলিম শক্তিও রাজ্যের বিস্তৃতি বাড়াতে থাকে। এসব কারণেই সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজুদ্দিনের 'তৎকাত-ই নাসিরী' (১২৬০ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত) গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের প্রশংসা রয়েছে। রায় লখ্‌মনিয়া মহৎ রাজা (Great Gac) ছিলেন। হিন্দুস্তানে তাঁর মতো সম্মানিত রাজা আর কেউ ছিল না। তাঁর হাত কারো ওপর কোনও অত্যাচার অবিচারে অগ্রসর হতো না। এক লক্ষ কড়ির কমে তিনি কাকেও কিছু দান করতেন না।

সেনরাজবংশের রাজকবিরাও এ রাজ্যের রাজাদের নানা প্রশংসা করেছেন। লক্ষ্মণসেন নিজে একজন সুকবি ছিলেন এবং তাঁর কয়েকটি শ্লোক 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ধোয়ী, সরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ মিশ্র ভারত প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্য এখনও বিখ্যাত ও খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু ড. নীহাররঞ্জন রায় কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, সভাকবিরা সেন রাজাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও এই স্তুতি ও চাটুবাদ রাজসন্তুষ্টির জন্যই। এরা কখনই বাংলাদেশে জনপ্রিয় শাসক ছিলেন না। এদের রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার নয়, বাঙালিরও নয়। পাল রাজারা যতটা বাঙালি জনগণের হৃদয়ের নিকটবর্তী হয়েছিলেন সেন রাজারা তা কখনো পারেননি। লামা তারানাথের বর্ণনায় গোপাল নির্বাচনের কাহিনী কিংবা মহীপাল, যোগীপাল, ভোগীপালদের নিয়ে জনগণের যে পালাগান তা তাদের জনপ্রিয়তারই লক্ষণ। ধান বানতে গিয়েও মহীপালের গান গায় বাঙালিরা। পাল বংশকে বাঙালি ভালোবেসেছিল। তাদের গৌরবকে নিজেদের গৌরব মনে করেছিল। তার কারণও আছে। সেন রাজবংশ বাঙালি ছিলেন না। দক্ষিণের কর্ণাট থেকে তারা এদেশে আসেন ও বাঙালি জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। বর্মণ রাজবংশও কিন্তু অবাঙালি। কলিঙ্গ থেকে আগত।

ত্রিপুরা রাজাদের শাসন

'রাজমালা' গ্রন্থের লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ পাল ও সেন আমলে ত্রিপুরাধিপতিদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অস্পষ্ট কিছু ধারণা দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজাদের গৌরবগাঁথা বর্ণনার পাশাপাশি তাঁদের রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস অসমর্থিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি পঞ্চদশ শতকে লেখা কাব্য 'রাজমালার' ওপর নির্ভর করেছেন। তাহলেও উল্লিখিত সময়ে ত্রিপুরা রাজাদের রাজ্যশাসন এবং রাজ্যবিস্তারে কমপক্ষে নিজেদের রাজ্য বহিঃশত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার একটা প্রয়াসতো ছিলই। রাজাদের মধ্যে মহারাজ সেং-থুম পা বিশেষ পরাক্রমশালী

নরপতি ছিলেন। তিনি মিহিরকুল (প্রাচীন কমলাঙ্ক বা পট্টিকের রাজ্য) জয় করে মেঘনার তীর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিস্তার করেছিলেন বলে রাজমালায় উল্লেখ রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে হিরাবন্ত নামে জনৈক ধনবান সামন্ত বাস করতেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান কর্মচারী ও বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। হিরাবন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। তাকে ধরবার জন্য মহারাজা সেং-থুম পা তিন জন সেনাপতিসহ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ত্রিপুরার সৈন্যগণ গঙ্গাতীরে উপনীত হলে হিরাবন্ত গৌড়েশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়াধিপতি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বৃহৎ একদল সৈন্য ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গৌড়সৈন্যরা ত্রিপুরা সীমানায় উপনীত হলে মহারাজ সেং-থুম পা শত্রু সৈন্যদের শক্তি বেশি বিবেচনা করে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাণী স্বামীকে রণবিমুখ দেখে স্বয়ং সেনাপতিকে আহ্বান করে বলেন, তিনি নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কূলগৌরব রক্ষা করবেন। যুদ্ধের জন্য প্রচুর সাজ-সজ্জা হলো। পরদিন প্রত্যুষে রাণী হস্তিতে আরোহণ করে রণক্ষেত্রে গমন করবেন। এমন সময় মহারাজও বাধ্য হয়ে রাণীর পেছন পেছন যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে উভয়পক্ষেই মহারক্তস্রোত বয়ে গেল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিপুরার রাণী বিজয়ী হলেন। রাজমালা কাব্যের প্রবীণ কবি বীরেন্দ্র এই রানীর নাম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই বিজয়ী রাণী সম্পর্কে বলেন, ভারতীয় মহিলাকূলমধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।[৩১]

পট্টিকেরা রাজ্য

কোটবাড়িতে (লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে অবস্থিত) রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব নামক একজন নৃপতির একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় হরিকেলদেব পট্টিকেরা নগরে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের জন্য কিছু ভূমি দান করেছেন। এই তাম্রশাসনে সহজযানপন্থী তাঁর এক কর্মচারীর পরিচয় রয়েছে। রাজা এটি তার ষোড়শ রাজ্যাঙ্কে (১২২০ খ্রিস্টাব্দে) প্রদান করেন। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে তিনি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন ত্রিপুরা অঞ্চলে পট্টিকের রাজ্যে আবার (পূর্বেও ছিল) কতকটা প্রাধান্য লাভ করে। রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেব নামে এক নরপতি সেখানে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন (১২০৪-১২২০ খ্রিস্টাব্দ)। বর্তমান কুমিল্লা শহরের ৫ মাইল পশ্চিমে ময়নামতি পাহাড় অঞ্চলেই ছিল তাঁর রাজধানী। প্রাচীন পট্টিকেরা বার্মার ইতিহাসে বর্ণিত পট্টিকর, আদি ব্রিটিশ যুগের পট্টিকারা পরগনা এবং বর্তমান পট্টিকের এক ও অভিন্ন। বার্মার ইতিহাসে যে পট্টিকেরা রাজ্যের উপাখ্যান রয়েছে তা থেকে জানা যায় প্রাচীন ব্রহ্ম রাজ পরিবার ও পট্টিকেরা রাজ পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এর থেকে দু রাজপরিবারের যোগাযোগ এবং প্রাচীন বাংলা ও বার্মার সম্পর্ক চিহ্নিত হয়। এ যোগাযোগ রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়সহ শুধু দু দেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্ক নয়, সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় অনেক দেশের সঙ্গে নৌবাণিজ্যের ইঙ্গিত করে।

বার্মার ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' এবং 'হন্নানযাজাবিন' (Hmannan Yazawin)-এ বর্ণিত আছে পট্টিকারা রাজ্যের জনৈক রাজকুমার বার্মায় গিয়েছিলেন। বার্মার তৎকালীন রাজা ক্যানঝিল্বার (১০৮৪ থেকে ১১১২ খ্রিস্টাব্দ) কন্যা সুয়েনথির সঙ্গে তার প্রণয় হয়। রাজা তাঁর একমাত্র কন্যাকে রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। রাজামাত্য এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এর বিরোধিতা করেন। এরা 'কাল' বা বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিতে চাননি, কারণ এই রাজপুত্রই একদিন বার্মা শাসন করবে বলে তাদের আশঙ্কা। কিন্তু কালক্রমে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মেলামেশার ফলে রাজকুমারী এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। এ অবস্থায় রাজকুমারের জীবননাশ ঘটে। ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করা হয়।

তাদের পুত্র সন্তান অলংসিথু পট্টিকেরার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। এই 'আলং' শিশু ৭৫ বৎসর বার্মা শাসন করেছেন। তাঁর বংশধরেরা ২০৬ বৎসর বার্মায় রাজত্ব করে। অলংসিথুর পুত্র নরথু পট্টিকের এক রাজকুমারী এবং তার বিধবা মাকে হত্যা করেন। রাজকুমারী সুয়েনথির প্রেমোপাখ্যানের ওপর ভিত্তি করে বর্মী ভাষায় বহু কাব্য ও নাটক লেখা হয়েছে। সে সব নাটক এখনো বার্মায় মঞ্চস্থ হয়।

আরাকানী ইতিবৃত্তে কাহিনীটি অন্যভাবে আছে। মারওয়া রাজ্যের জনৈক রাজা পটেইক্করা তার দু কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ যথাক্রমে আরাকান ও তম্পদ্বীপের রাজার কাছে পাঠান। আরাকানের সেনাপতি তম্পদ্বীপের জন্য প্রেরিত রাজকুমারীকে পগানের রাজা নরথুর কাছে প্রেরণ করেন এবং নরথুকে অনুরোধ করেন যেন রাজকুমারীকে তম্পদ্বীপে পাঠানো হয়। কিন্তু নরথু রাজকুমারীকে তম্পদ্বীপে না পাঠিয়ে নিজের অন্তঃপুরে বন্দি করেন। নরথুর মাতা– যার দেশ পট্টিকেরা, পুত্রকে বাধা দেন, পুত্র মাতা এবং রাজকন্যাকে হত্যা করেন।

বার্মা এবং আরাকানী কাহিনীতে প্রথম দিকে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তবে শেষটা একই রকম। কন্যার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পট্টিকেরার রাজা ৮ জন সৈন্যকে ভিক্ষুর ছদ্মবেশে বার্মায় পাঠান প্রতিশোধ নেবার জন্য। এরা পগানে রাজাকে আশীর্বাদের ছলে রাজপ্রাসাদে তরবারি দিয়ে হত্যা করেন। পরে এরাও যুদ্ধ করে এবং শত্রুর হাতে নিহত না হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এই গল্পটি চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে এখনো প্রচলিত আছে। কুমিল্লায় অবশ্য শোনা যায় না।

১১৪১ শকাব্দের একটি তাম্রশাসনে জানা যায়, রণবঙ্কমল্ল নামক এক নরপতি কমলাঙ্ক, পট্টিকারা প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। মহারাজোয়াং গ্রন্থে যে পট্টিকারা রাজবংশের উল্লেখ আছে কৈলাসচন্দ্র সিংহ মনে করেন রণবঙ্কমল্ল সে বংশের নরপতি।[৩২]

কাহিনীগুলোতে যাই থাকুক না কেন, তা থেকে পট্টিকারা রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে বার্মা রাজাদের দীর্ঘ কালের সম্পর্কের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে নানা ভাঙ্গাগড়া ছিল। প্রীতিকর অধ্যায় যেমন রয়েছে তেমনি অপ্রীতিকর অধ্যায়ও রয়েছে। প্রাপ্ত মুদ্রা এবং অন্যান্য নিদর্শনাদি থেকে মনে হয় এসম্পর্ক শুধু রাজকীয় পর্যায়ে নয়, দু'দেশের মধ্যে, দু'দেশের জনগণের মধ্যেও বিস্তৃত ছিল।

পট্টিকেরা দেববংশ

সমসাময়িক কালে মেঘনার পূর্ব তীরে আর একটি স্বাধীন রাজ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশ দেববংশ নামে পরিচিত। প্রাচীন ইতিহাসে এদের 'দেবান্বয় গ্রামণী' বলা হয়েছে। দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে পুরুষোত্তমদেবের পুত্র মধুমথন বা মধুসুগন্ধ প্রথম স্বাধীন রাজার আখ্যা গ্রহণ করেন। এই বংশের রাজা দামোদরদেবের ৩টি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে মিহিরকূলে। এগুলো থেকে জানা যায় বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেব ১২৩১-১২৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাম্রশাসনে 'সকল ভূপাল চক্রবর্তী' এবং 'হরিরাজচানুর মাধব' অভিধা দুটি থেকে মনে হচ্ছে দামোদরদেব একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে অধিপত্য বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে এ বংশের আরেক রাজা দশরথদেব তাঁর রাজ্য আরো বিস্তৃত করেছিলেন এবং বিক্রমপুরে রাষ্ট্রকেন্দ্র গড়ে ঢাকা অঞ্চলকেও তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। কুমিল্লা জেলার পাকানোড়া নামক স্থানে ও ঢাকা জেলার আদাবাড়িতে দশরথ দেবের দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। কেউ কেউ তাঁকে দামোদরদেবের পুত্র বলে মনে করেন এবং তাঁর আবির্ভাব কাল সেন বংশের বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের পরে চিহ্নিত করে বলেন, তিনি বিক্রমপুর কেন্দ্রভিত্তিক পূর্ববঙ্গ সমতট রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।[৩৩]

ঢাকা জেলার আদাবাড়ি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, দশরথ দেব গৌড় রাজ্যও লাভ করেছিলেন।

প্রশাসন ও সমাজচিন্তার বিকাশ (গুপ্ত যুগ থেকে সেন আমল)

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে ভূমিদানপত্রে 'ভুক্তির' উল্লেখ রয়েছে। 'ভুক্তি' মানে বিভাগ। প্রত্যেক 'ভুক্তি' কতকগুলো বিষয়ে, বিষয় কতকগুলো মণ্ডলে, মণ্ডল কতকগুলো বিথিতে এবং বিথি কতকগুলো গ্রামে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাট ভুক্তির শাসনকর্তা নিজেই নিযুক্ত করতেন বলে মনে হয়। তাকে উপরিক মহারাজা বলা হ'ত। কুমার, অমাত্ত, আযুক্তক, বিষয়পতি প্রভৃতি রাজ কর্মচারীদের নাম পাওয়া যায়।

বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে দু সামন্ত নরপতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাসামন্ত বিজয়সেনকে মহারাজ বলা হয়েছে সেখানে। তাঁকে আবার বলা হয়েছে দূতক,

মহাপতিহার, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকরণপৌরিক, পুরপালপৌরিক এবং পাট্যুপৌরিক। রাষ্ট্র প্রতিনিধি হচ্ছে দূতক। পতিহারের সহজ অর্থ দ্বাররক্ষক বা শান্তিরক্ষক। মহাপিলুপতি মানে হস্তিসৈন্যের অধ্যক্ষ। পঞ্চাধিকরণের অর্থ পাঁচটি অধিকরণের প্রধান কর্মকর্তা, পুরপালদের যিনি কর্তা তিনি পুরপালকৌরিক, পাট্যুপৌরিক কী ছিলেন তার অর্থ জানা যায় না।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে দুটি ভুক্তি বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায় : পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তি। ভুক্তি অন্তত ৩টি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। যেমন– কোটিবর্ষ বিষয় (দামোদরপুরে পট্টলিতে), খামাইপাড়া বিষয় (দনাইসহ পট্টলিতে) ও পঞ্চনগরী বিষয় (বৈগ্রাম পট্টলি)। গুপ্তদের পাহাড়পুর পট্টলিতে দক্ষিণাংশ বিথি ও নাগিরট্যমণ্ডলের উল্লেখ রয়েছে। গ্রামের উল্লেখ আছে বহু জায়গায়। 'গুণিকাগ্রহার' গ্রাম গুণাইঘর লিপির গ্রামের নাম।

প্রথম কুমারগুপ্তের আমলে গুপ্তপতিদের বলা হতো উপরিক। কিন্তু বুধগুপ্তের রাজত্বকালে তাদের বলা হয়েছে উপরিক মহারাজ। উপরিক হচ্ছেন ভুক্তির সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। উপরিকের অধিকরণ সম্পৃক্ত কয়েকজন রাজকর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায় মল্লসারুল লিপিতে : ভোগ পতিক, পেত্তলিক, চৌরোদ্ধরণিক, আবসথিক, হিরণ্যসমুদায়িক, ঔদ্রঙ্গিক, ঔর্ণস্থানিক, কার্তাকৃতি্ক, দেবদ্রোণীসম্বন্ধ, কুমারমাতা, অগ্রহারিক, তদায়ুক্তক, বাহনায়ক ও বিষয়পতি। বিষয়পতি বিষয়বি-ভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী ছিলেন। উপরিকদের বিষয়পতি নিযুক্ত করতেন। বিষয়াধিকরণে বিষয়পতির কর্মস্থলের লোক বলে মনে হচ্ছে। তিনি একজন পদস্থ কর্মচারী বিষয়াধিকরণের কর্ম নির্বাহের জন্য একটি মণ্ডপ বা সভাগৃহ ছিল। অধিকারণ মণ্ডপে বসতেন। এটি বিচারাধিকরণও হতে পারে। তিনি ভূমিদান বা বিক্রয় কর্ম শুধু নয় বিষয়-শাসন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার রাষ্ট্রকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এতে বিচারিক ক্ষমতা তারই হাতে ছিল বলে মনে হয়। দামোদরপুর পট্টলিতে বিষয়ের প্রতি সহায়করূপে বিষয় আধিকরণ গঠন করছেন নগর সৃষ্টি, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ ও প্রথম স্বার্থবাহ। প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব মাটির সিলমোহর পাওয়া গেছে তাতে শ্রেষ্ঠ স্বার্থবাহ, কুলিক নিগম বা শ্রেষ্ঠী নিগম এরূপ পদ উৎকীর্ণ আছে। অধিকরণগণ সভার সদস্য ছিলেন বলে মনে হয়। কেউ কেউ মনে করেন উপদেষ্টা ছিলেন। তবে শাসনকার্যে তাদের ভূমিকা ছিল অচ্ছেদ্য। বিষয়াধিকরণের সভ্যদের প্রয়োজন মতো সাহায্য করবার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তর ছিল। ভূমি দান, বিক্রয়, এসব ব্যাপারে দলিলপত্র সংরক্ষণ, ভূমির মাপ-যোগ, সীমা নির্দেশ, মালিকানা নিশ্চিতকরণ এ দুপ্তর থেকেই হতো বলে মনে হয়। পট্টিকৃত তাম্রশাসন প্রস্তুতও এ দপ্তরের কাজ ছিল। বিথি বিভাগেরও নিজস্ব একটি অধিকরণ (সভা) ছিল। অধিকরণ সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন মহত্তর, ৩

জন খাড়গী ও ১ জন বাহনায়কের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের প্রধান ছিলেন গ্রামিক। সেখানেও শাসন ভার নির্বাহ করতেন ব্রাহ্মণ, মহত্তর কিংবা কুটুম্ব।

সপ্তম শতাব্দীতে লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসনে 'সান্ধিবিগ্রহিক উপাধিধারী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তদের পরেও শশাঙ্ক কিংবা রাত, খড়গ, দেব, চন্দ্র প্রভৃতি বংশে রাজ্য শাসনে উল্লিখিত শাসন ব্যবস্থাই লক্ষ করা গেছে। লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টলিতে বিষয়ের পতিং, সাধিকরণাং-দের উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁদের আমলে বীথি বা গ্রামাধিকরণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। সপ্তম শতকে সান্ধিবিগ্রহিক নিশ্চয়ই দুটি দেশের যুদ্ধ, সন্ধি ও শান্তি সম্পর্কিত উচ্চ পদের রাজকর্মচারী ছিলেন।

পালদের সময়ে সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয়। কারণ এরা চারশত বছর রাজত্ব করেছেন। এ সময় থেকে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজে অভিষিক্ত হতে শুরু করেন। যুবরাজ দূতকের কাজ করেছেন। এ সময় থেকে রাজমহিষীরাও রাজকর্মে অংশ নিতে শুরু করেন। রাজকীয় মহিমা ও মর্যাদার সীমার মধ্যে মহিষীরও একটা স্থান ছিল।

পাল আমলে সামন্ততন্ত্র খুব সুদৃঢ় হয়। এ সময় রাজন, রাজন্য, রানক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতি ঔপধিক রাজপদউপজীবীদের সাক্ষাত মেলে। পালদের সময়ে আমরা একজন রাজকর্মচারীর সাক্ষাত পাই যাঁর পদবী হচ্ছে মন্ত্রী বা সচিব। মন্ত্রী বা সচিবদের পদগুলো বংশানুক্রমিক ছিল। পাল ও চন্দ্র বংশের লিপিগুলোতে মন্ত্রী-সচিবের বাইরেও ছিল রাজামাত্য, মহাকুমারামাত্য, দূত, মহাসেনাপতি, মহাপতিহার, মহাদণ্ডনায়ক, মহাদৌঃসাধসাধনিক, মহাকর্তাকৃতিক, মহাক্ষপটলিক, মহাসর্বাধিকৃত, রাজস্থানীয় এবং অমাত্য। রাজপুত্রেরই পরেই রাজামাত্য উল্লেখ হতো মনে হয় মন্ত্রী বা সচিবের পরেই ছিল এদের স্থান। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে আরও কয়েকজন পরিচালক থাকতেন। তাদের উপাধি ছিল অধ্যক্ষ এবং কাজ ছিল রাজকীয় ও সামরিক বিভাগের হস্তি, অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি পশু রক্ষণাবেক্ষণ। এছাড়া নৌ-অধ্যক্ষ ও বলাধ্যক্ষ প্রভৃতি সামরিক কর্মচারীর পরিচয় পাওয়া যায়। ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও পুরোহিতের পরিচয়ও আছে।

বিচার বিভাগের মহাদণ্ডনায়ক, ধর্মাধিকার, দণ্ডনায়ক, দাশাপরাধিক প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজস্ব বিভাগে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, পরিকর প্রভৃতি করের পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিক, বিষয়পতি, মণ্ডলপতি, দাশগ্রামিক ও গ্রামপতিরা এই কর আদায় করতেন। ভোগ কর আদায় করতেন ভোগপতি। আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতেন মহাধ্যেপটলিক। পালদের সময় পুস্তপালের উল্লেখ নেই। বরং ক্ষেত্রপ-এর উল্লেখ আছে। শান্তি রক্ষার জন্য দাণ্ডপাষিক, দাণ্ডিক, দণ্ডশক্তি খোল (গুপ্তচর) এবং অঙ্গরক্ষক, এরা এই বিভাগের কর্মচারী। মহাসেনাপতি,

সেনাপতি, নৌবল, বলাধ্যক্ষ প্রভৃতি সেন আমলে দেখা গেছে। মহাভ্যয়োপতির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

গমাগমিক, দূত, প্রৈষণিক, খণ্ডরক্ষক, রবঙ্গ প্রভৃতি পদেরও পরিচয় আছে। সেনরা পালদেরই রাজউপাধিগুলো ব্যবহার করেছেন। তার বাইরেও কিছু উপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, শিরোরক্ষিক, শূলপানি, মহামাণ্ডলিক, রাজন্যক, রানক, মহামন্ত্রী প্রভৃতি। এই সময় 'করণ' থেকে 'কেরাণীর' পরিচয় পাওয়া যায়। এদের একজন মহামহত্যক, একজন মহাসন্ধিবিগ্রহিক ও আরেকজন মহারাজের সঙ্গে কাজ করতেন।

লক্ষণসেনের সময় বৃহদউপরিক, মহাভূগিক বা মহাভূপতিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকাষ্টিক, মহাকরণ্যধ্যক্ষ, মহাপুরোহিত এসব রাজপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। ভুক্তি বিষয়ের পাশাপাশি মণ্ডল, খাড়িমণ্ডল ইত্যাদির পরিচয় রয়েছে। এখানে ভুক্তির পরে মণ্ডল, এর পর বিষয়। মণ্ডলের পরে এখানে খণ্ডল রয়েছে। আবার কোথাও রয়েছে চতুরক। সম্ভবত এটি ৪টি গ্রামের সমষ্টি। অট্টপতির মতো তরপতি, পানিআগারিক, বাসাগারিক, মহামহত্মক, কৌট্টপাল প্রভৃতির পরিচয়ও রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার চিত্রটা বোঝা অনেকটা কঠিন। তবে সব সমাজেই এবং সব রাষ্ট্রেও ক্ষমতার কেন্দ্রে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহারই করেছেন। তার প্রতিবাদও হয়েছে এবং প্রতিবাদের মুখেই অবস্থা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এরকম একটি গল্প আছে লক্ষণসেনের সভা কবি গোবর্ধন আচার্য সম্বন্ধে 'শেখশুভদয়া' গ্রন্থে। লক্ষণসেনের এক শ্যালকের নাম ছিল কুমারদত্ত। কুমারদত্ত কামপরায়ণ হয়ে একবার এক বণিক বধূর হাত ধরেছিলেন। বণিক বধূ মন্ত্রীদের নিকট এই অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। কিন্তু এরা রাজমহিষী ও রাজ শ্যালকের ক্রোধভাজন হতে সাহসী হন নি। তবে এরা বণিক বধূকে লক্ষণসেনের রাজদরবারে নিয়ে যান। রাজসভায় মন্ত্রী ও সভাসদবর্গের সম্মুখে বণিক বধূ মাধবীর বিবৃতি শেষ হলে রাজমহিষী বল্লভ নিজের ভ্রাতাকে রক্ষা করবার জন্য ভ্রাতার দোষ অপরের (কবি উমাপতিধর) স্কন্ধে চাপিয়ে দেন। লক্ষণসেনকে মহিষী ও শ্যালক উভয় সম্বন্ধেই দুর্বলতা পরবশ হয়ে বিচার মর্যাদা রক্ষায় অনিচ্ছুক দেখে ক্ষুব্ধ বণিক বধূ শ্লেষ মিশ্রিত ভাষায় নিজের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। মহিষী বল্লভা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজসভার মধ্যেই মাধবীকে চুল ধরে টেনে পদাঘাত করেন। তাতেও মহারাজকে অবিচলিত দেখে সভায় উপস্থিত কবি গোবর্ধন আচার্যের ব্রাহ্মণ্য দর্প ও ন্যায়বোধ জেগে ওঠে। তিনি ক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত কণ্ঠে মহারাজাধিরাজকে ভর্ৎসনা করে মহিষীকে আঘাত করতে যান। কিন্তু নিরস্ত্র হয়ে মহিষীকে ভর্ৎসনা ও রাজাকে অভিশাপ দিয়ে রাজসভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্ধত হন। তখন লক্ষণ সেন সিংহাসন

ছেড়ে উঠে এসে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কবির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নীরব মন্ত্রীদের লক্ষ করে বণিক বধূ মাধবী তখন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। লজ্জায় ও ঘৃণায় উৎপীড়িত লক্ষ্মণসেন তখন ক্রুদ্ধ হয়ে খড়গ লয়ে কুমারদত্তকে হত্যা করতে যাচ্ছেন। এমন সময় মাধবী মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, মহারাজ, আপনার শ্যালক আমার হাত ধরেছিল বলে আমি মরে যাই নাই। আমার জাতও যায় নাই। আমারই স্বকর্মফলের জন্য এ ঘটনা ঘটেছে। আপনার আচরণে তার অপরাধের প্রতিকার হয়েছে। আপনি একে ক্ষমা করুণ। মাধবীর কথা শুনে সভার সকলে সাধুবাদ জানালো। মহারাজ কুমারদত্তকে রাজ্য হতে নির্বাসনে পাঠালেন।

রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং সামন্ত রাজাদের মধ্যে নানা রকম ষড়যন্ত্র ও দলাদলির পরিচয় পালবংশে প্রচুর পাওয়া গেছে। সমাজের নিম্ন স্তরের অবস্থা আমরা তেমন জানি না। চর্যাপদের সমাজচিত্রে সামাজিক জীবনের নানাদিকের দৈন্য, অভাব অভিযোগ প্রভৃতি উঠে এসেছে। কিন্তু অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও যে ঐ সময় ন্যায়বোধ ও বিশ্বস্ততা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল তারও প্রমাণ আছে। ন্যায় পালের রাজত্বকালে (১০৩০-১০৪০ খ্রিস্টাব্দ) নগটচো বাংলাদেশে এসেছিলেন অতীশ দীপঙ্করকে সঙ্গে করে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য। বিক্রমশীলা বিহারের অতিদূরে গঙ্গাতীরে এসে যখন এরা পৌঁছলেন তখন সূর্য অস্ত গেছে। যাত্রী বোঝাই খেয়া নৌকা ঘাট ছেড়ে নদী পাড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। বিদেশী পথিক মাঝিকে ডেকে তাদের ঐ নৌকায় নদী পার করে দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বোঝাই নৌকায় মাঝি আর লোক নিতে অস্বীকার করে বলেন এখন আর সম্ভব নয়। পরে আবার ফিরে আসবেন। নৌকা চলে গেল। এদিকে রাত্রি হয়ে আসছে। অন্যতম পথিক বিনয়ধর মনে করলেন মাঝি নৌকা নিয়ে আর ফিরবে না। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ পরে মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরল। বিনয়ধর মাঝিকে বললেন, আমিতো ভেবেছিলাম এত রাত্রে তুমি আর ফিরে আসবে না। মাঝি উত্তর করলেন, আমাদের দেশে ধর্ম আছে। আমি যখন আপনাকে ফিরে আসব বলে গিয়েছি তখন অন্যথা কী করে হবে? মাঝি বিনয়ধরকে পরামর্শ দিলেন এত রাতে নদী পার হয়ে কাজ নেই। অদূরবর্তী বিহারের দ্বার মঞ্চের নিচে রাত্রি বাস করাই উপযুক্ত। সেখানে চোরের উপদ্রব নেই। বৌদ্ধরাজাদের আমলে সমতট হয়ত আরও নিরাপদ ছিল।

১. ড. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃ. ৬৪।
২. কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা, পৃ. ৩০।
৩. J. Fleet, Corpus Inscriptions Indica Journal-1, P 14
৪. বৃহৎসংহিতা ১৪ : ৬-৮। A>M Shartri, India as seen in the Brihatsanhita of Varahmihira, 017-98.
৫. T. Watters. On Yuang Chwang's Travels in India, Vol-II, 187.
S. Bed, Buddishist Records of the Western World II, 1884, P. 194-202
B M. Morrison, Lalmai, a Cultural Center of Early Bengal Seattle 1974.

৬. N.K. Bhattasali, E.I, XVII, P. 357-359.
৭. D.C. Sircar, Studies. P. 149.
৮. R.C. Majumdar, History of Bengal, Vol-I, Dacca (1943), P. 29.
৯. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৩৬০।
১০. গোপচন্দ্রের কোটালিপাড়া তাম্রশসন (রাজ্যাঙ্ক ১৮) Indian Andiquary, Vol. xxiii, P. 155.
১১. দেবখড়গের আশ্রাফপুর তাম্রশাসন। Memoire of the Asiatic Society of Bengal, No. 1, P. 85.
১২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৩৬৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।
১৪. দেবখড়গ মহিষী প্রভাবতীর সর্বাণী প্রতিমালিপি। Epigraphia Indica, Vol. XVIII, P. 357.
১৫. লোকনাথের তাম্রশাসন। Epigrapia Indiea, Vol. xv, P. 301.
১৬. Indian Historical Quarterly (I.H.Q) XXIII, P. 221-41.
১৭. শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক) ৮০-ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৫৩, পৃ. ৩৬৯-৭৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫৩ খণ্ড, ৩-৪ সংখ্যা, পৃ. ৪১-৫৪।
১৮. কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা, পৃ. ৩৪।
১৯. B.M. Morrison, Political Centers, P. 23-24.
২০. T. Watters, On Yuang Chwang's Travels in India, Vol-II, 187-90.
২১. J.A.S.L., XVII, P. 93.
২২. ড. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯।
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮, ৪২৯।
২৪. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ১১২।
২৫. Mainamati Copper Plates, A.H. Dani, Pakistan Archaeology. No. ১, 1966, P. 25-26.
২৬. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), পৃ. ৬৫।
২৭. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৩১।
২৮. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৩২।
২৯. Dynastic History of Bengal, Dr. Abdul Momin Choudhury, P. 189-201.
৩০. মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় বখতিয়ারের অভিযানের আগে লক্ষণসেনের অমাত্যবর্গ বঙ্গ সকনাত/ সনকাত/ সঙ্কানাত পালিয়ে আসে। এই সনকাত 'সমতট' বলে সনাক্ত করা হয়েছে (D.C. Sircar, Studies, P.152-158)।
৩১. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রাজমালা, পৃ. ৩৮।
৩২. শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা', পৃ.৩০।
৩৩. শ্রী রাসমোহন চক্রবর্তী ও আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস প্রাচীন যুগ, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃ. ১০৬।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রত্নসম্পদ

প্রাচীন যুগের নিদর্শন

প্রত্নসম্পদ কোনো জাতির প্রাচীন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রত্নকীর্তির আলোকেই বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল্যায়ন হয়ে থাকে। মিসরের পিরামিড, মমী, এবং নানা দেব-দেবীর মূর্তি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতাকে বিশ্বের মানুষের কাছে সম্মানিত করে তুলেছে। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো, অজন্তা-ইলোরা, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতির মতো কুমিল্লার জেলার লালমাই-ময়নামতির প্রত্নসম্পদ বিশ্ব হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন প্রত্নকীর্তির ক্ষেত্রে কুমিল্লার সুমহান ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। আবহাওয়া এবং জলবায়ুগত কারণে বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশে সবকিছুই সহজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীন কালের বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক কালের নিদর্শন তাই এখানে পাওয়া যায়নি বললেই চলে। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দীর্ঘকালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো কুমিল্লার আদি মানুষেরাও প্রত্নকীর্তিতে কীর্তিমান ছিলেন।

নব্য প্রত্ন-প্রস্তর যুগ

পুরাতন প্রত্ন প্রস্তর যুগের কোনো নিদর্শন এযাবৎকালে কুমিল্লার কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে কুমিল্লার খুবই কাছে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার সীমান্তে পাহাড়ি অঞ্চলে এই যুগের একটি হস্ত কুঠার (Hand axe) পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি পুরাতন প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শন। এখানে বলা আবশ্যক যে প্রাচীন কিরাত ও সমতট অঞ্চল কুমিল্লা, ছাগলনাইয়া ও আশেপাশের অন্যান্য স্থান নিয়েই পরিচিহ্নিত ছিল। এই কুঠারখানি বর্তমানে ঢাকা জাদুঘরে রয়েছে। কয়েক বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চলে এরকম একটি কুঠার পাওয়া যায়। এটি বর্তমানে চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক জাদুঘরে রয়েছে।

নব্য প্রত্ন-প্রস্তর যুগের প্রধান আলামত হচ্ছে অশ্মীভূত কাষ্ঠ (fossilised or petrified wood)। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে অশ্মীভূত কাষ্ঠনির্মিত একটি তরবারি আবিষ্কৃত হয়। এটি কলকাতা জাদুঘরে থাকার কথা।[১] কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত শালবন বিহার ও আনন্দ বিহার খননকালে এরকম ৯টি অস্ত্র পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ অস্ত্র অশ্মীভূত কাষ্ঠ

নির্মিত। দু'একটি প্রস্তর (Quartxit) নির্মিত। এগুলোর সঙ্গে বেশ বড় এক খণ্ড পাথরও (Quartzit) পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এ ধরনের পাথর বাংলাদেশে দুর্লভ। পাথরগুলো বাইরে থেকে এখানে আনা হয়েছে। কারা এনেছে, কেন এনেছে, কোথা থেকে এনেছে এসব বিষয়ে আরো গবেষণা করা দরকার।

আমরা জানি ১০ হাজার বছর আগে থেকে নব্য প্রস্তর যুগ আরম্ভ হয়েছে। কুমিল্লায় প্রাপ্ত অস্ত্রগুলোর সঠিক বয়স নির্ধারণ করা না গেলেও অভিজ্ঞ মহলের ধারণা এই অস্ত্রগুলো ৩ থেকে ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্ব বছর আগের কিংবা তারও আগের হতে পারে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি অঞ্চলে অশ্মীভূত কাঠও পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। এই অশ্মীভূত কাঠগুলোকে কুমিল্লার মানুষ অশূরের হাড় বলে। এগুলো এ অঞ্চলের সুস্পষ্ট প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্ন অস্ত্রগুলো আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর সমগোত্রীয় বলে বিবেচিত হয়। তা থেকে মনে করা যায় এ দু' অঞ্চলের মানুষ শুধু সমসাময়িকই না সমগোত্রীয় ছিলেন।

আদিকালে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক কালে লোকজন সুপেয় ও সহজলভ্য জলধারার কাছাকাছি পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে এরা লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের মতো সুন্দর ও নিরাপদ স্থান বেছে নেবে এটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত। প্রাপ্ত প্রস্তর যুগের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো এখানে বসবাসকারী আদি মানুষদেরই। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহারে এগুলো এল কী করে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এদের সময়ে এসব অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয়নি এটা নিশ্চিত। এরা হয়তো কুঁড়িয়ে পেয়েছে এই বস্তুগুলো এবং কৌতূহলের কারণেই সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছে। এছাড়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে এই, যা কিছু অতি পুরাতন, পূর্ব পুরুষদের ব্যবহৃত কৌতূহল নিয়ে তা জমা করে রাখা।

শালবন বিহারে খনন কার্যের সময় এগুলো প্রথমে পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হলো তখন প্রত্নতত্ত্ববিদরা এগুলোর প্রতি কোনো দৃষ্টিই দেননি। এরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন ভাস্কর্য, মুদ্রা, তৈজসপত্র প্রভৃতি নিয়ে। কিন্তু ইতিহাসের সবচেয়ে পুরনো মূল্যবান এই প্রত্নসম্পদ নিয়ে উৎসাহ জাগে ১৯৭৬-৭৭ সালে আনন্দ বিহার খনন কার্যের সময়। আনন্দ বিহারে প্রাপ্ত নতুন প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলোর প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনে এরা তৎপর হন। নব্য প্রত্ন-প্রস্তর যুগে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো প্রাচীন প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। সেখানকার লোকজন এখনও বিশ্বাস করে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে প্রাচীন প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নিদর্শনও পাওয়া যাবে। তাহলে এই অঞ্চলের লক্ষ বছর আগে বসবাসকারী আদি মানুষদের ঠিকানাও হবে লালমাই-ময়নামতি।

বস্তুত নব্য প্রস্তর যুগ থেকে ইতিহাস যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের লীলাভূমি হচ্ছে লালমাই-ময়নামতি অঞ্চল। প্রস্তর যুগের কোনো স্থাপত্য বা ভাস্কর্য

পাওয়া যায়নি এখানে। ইতিহাস যুগের প্রথম দিককার কোনো স্থাপত্য-কীর্তিও আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ এখানে এখনও খননের বহু কিছু বাকি।

লালমাই-ময়নামতি : প্রাকৃতিক বিবরণ

কুমিল্লা শহর থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে এক দীর্ঘ অনুচ্চ ও সরু পাহাড় শ্রেণী রয়েছে। তার উত্তর ভাগ ময়নামতি ও দক্ষিণভাগ লালমাই পাহাড়। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২০ কিলোমিটার লম্বা এবং ১ থেকে ৫ কিলোমিটার প্রশস্ত। উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে রয়েছে রাণী ময়নামতি টিলা ও দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় চণ্ডীমুড়া (ছোট পাহাড় কে কুমিল্লার লোকজন মুড়া বলে)। ঢাকা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ময়নামতি পাহাড়কে ভেদ করে চলে গেছে। এই মহাসড়কের দক্ষিণ দিকের কিছু অংশ ও উত্তরের সবটুকু অংশ নিয়ে ময়নামতি পাহাড়। ময়নামতি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে সবটাই লালমাই পাহাড়। এখানে রয়েছে শালবন, রয়েছে নানা রকম পাহাড়ি বৃক্ষ। বন্য গাছের ফলমূল এবং বন্য জন্তু শিকার করে এখানকার আদি মানুষেরা জীবিকা নির্বাহ করতো। আদি মানুষদের সৌন্দর্যবোধ এবং জীবিকার ধরন উপলব্ধি করে একালের মানুষ নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়াবে। হয়তো কল্পনার চোখে দেখবে লক্ষ বছর আগের Homosapiens মানুষেরা দাঁড়িয়া-বান্ধা খেলার মতো পা টেনে টেনে অশ্মীভূত অস্ত্র নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে শিকারের পেছনে পেছনে ছুটছে। লালমাটিতে গঠিত লালমাই পাহাড়ের বয়স প্রায় সাড়ে ৩ কোটি বছর বলে ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন।

আমরা বলেছি পাহাড়টি অনুচ্চ। আসলে এটি পাহাড় নয়। একটি পাহাড়শ্রেণী। পাহাড়গুলো টিলাধর্মী। উচ্চতা সমতল থেকে প্রায় ১৬ মিটার। সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার। বৈশিষ্ট্য হলো পাহাড়ের ওপরিভাগ সমতল। আমরা জানি পাহাড়ের ওপরটা খাড়া হয়। কিন্তু এটি ভিন্ন প্রকৃতির। ময়নামতি পাহাড়ের প্রায় সব অংশ এবং লালমাই পাহাড়ের কিছু অংশ নিয়ে সেনানিবাস গড়ে উঠেছে। এ সেনানিবাস ব্রিটিশ আমলের।

রামায়ণের একটি গল্প এ পাহাড় উৎপত্তির কারণ বলে স্থানীয় লোকজন বিশ্বাস করে। লঙ্কায় সীতাকে উদ্ধারের জন্য সংঘটিত যুদ্ধে লক্ষণ কুম্ভকর্ণের শক্তি সেল-এ মারাত্মক ভাবে আহত হলে বৈদ্য বলেন পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যদি বিশল্যকরণীর পাতার রস ক্ষতস্থানে প্রয়োগ না করা যায় তাহলে লক্ষণ প্রাণে বাঁচবে না। একমাত্র হিমালয় পর্বতেই এই গাছ পাওয়া যায়। একথা জানবার পর পবন পুত্র হনুমান দ্রুত সেখানে উড়ে যান। কিন্তু তিনি গাছ চিনতে আর পারেন না। কী করবেন ভেবে-চিন্তে যে গন্ধমাদন পর্বতে সে গাছ ছিল সে পুরো পর্বতটাই মাথায় করে নিয়ে যান লঙ্কা দ্বীপে। লক্ষণ পাতার রসে সুস্থ হয়ে উঠলেন। বীর

হনুমান আবার সে পর্বত মাথায় নিয়ে চললেন যথাস্থানে রেখে আসতে। কুমিল্লা শহরের প্রান্তে লমলম সাগরের কাছে এলে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে একটি হাতে নাসিকা অগ্র চুলকাতে শুরু করেন। আর অমনি পর্বতের একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে লমলম সাগরের তীরে এসে পড়ে। সৃষ্টি হয় লালমাই-ময়নামতি পাহাড়। স্থানীয় লোকেরা এই গল্প বলে। সেখানে লমলম সাগর বলে একটি জায়গা রয়েছে। কুমিল্লা শহরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল এককালে সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন। লোকশ্রুতি বা লোককাহিনী ইতিহাসের মূল উপাদান না হলেও এতে ইতিহাসের এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া এ থেকে পাহাড়গুলোর প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত মেলে।

এ পাহাড় দুটির নাম কেন লালমাই-ময়নামতি এরকম কৌতূহল থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ নিয়েও বেশ কিছু গল্প স্থানীয়ভাবে প্রচলিত আছে। গল্পগুলোর মূল কাহিনী প্রায় একই ধরনের। বহুকাল আগে এক রাজার দু রাজকুমারী ছিলেন। একজনের নাম লালমাই অন্যজন ময়নামতি। ময়নামতি ধর্ম-কর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি চিরকুমারী থেকে সাধন-ভজনে জীবনাতিপাত করতে চান। কিন্তু এক দৈত্য বা দেও এসে তাঁকে জোর করে বিয়ে করতে চায়। ময়নামতি কিছুতেই বিয়েতে রাজী নন। কিন্তু দেও-ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে কোনো উপায়ে হোক ময়নামতিকে বিয়ে করবেই। ময়নামতি অতিশয় সুচতুরা রাজকন্যা ছিলেন। তিনি একদিন বললেন, তুমি যদি এক রাতের মধ্যে আধ ক্রোশ দীর্ঘ ও আধ ক্রোশ প্রস্থ একটি দীঘি খনন করে দিতে পার তবেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মনে রেখো, এক রাতের মধ্যে মোড়গ ডাকার ঠিক আগে পর্যন্ত। আর যদি তা না করতে পার তবে বিয়ের কথা মুখেই আনবে না এবং এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজী? দেও বলল, রাজী এবং সে আড়াই প্রহরের মধ্যে দীঘি কাটার কাজ প্রায় শেষ করে ৩ পাড় বেঁধে ফেলল। ময়নামতি দেখলেন সর্বনাশ! দৈত্যতো দীঘি কেটেই ফেলবে। তিনি আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না। যোগসাধন শুরু করে দিলেন এবং অচিরেই মোরগের রূপ ধারণ করে মোরগের ডাক ডাকতে শুরু করলেন। দৈত্য হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং দীঘিতে গড়াগড়ি দেয়, ভাবে সে জোর করে ময়নামতিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার বোধোদয় হয়। সে ওয়াদা করেছিল দীঘি না কাটতে পারলে রাজকুমারীকে বিয়ে করবে না এবং দেশ ছেড়ে চলে যাবে। মনের দুঃখে দৈত্য ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেল। 'দেও দীঘি' অসমাপ্ত অবস্থায় এখনও আছে। ময়নামতি টিলার পূর্বদিকে দেও দীঘি বা দেবদীঘির চিহ্ন এবং দীঘির ৩টি পাড়ের কাহিনী এখনও লোকজনের মুখে মুখে।

এটি নিছক গল্প এতে সন্দেহ নেই। দেব বংশীয় কোনো রাজা এই দীঘি খনন করে থাকবেন। এখানে একটি দেব পাহাড় রয়েছে এবং দেব বংশের রাজাদের নামেই এ পাহাড়। ময়নামতির নামে ময়নামতি পাহাড়ের নামকরণ হয়ে থাকবে।

ময়নামতি নামকরণের পেছনে এ গল্পের বাইরেও নানা গল্প প্রচলিত আছে। সে সব গল্পে দেখা যায় ময়নামতি একজন রাণী। অর্থাৎ বিবাহিতা। নাথ-সাহিত্যে গোপীচন্দ্রের মাতা রাণী ময়নামতি। কেউ কেউ মনে করেন তিনি চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যাই হোক না কেন রাণী ময়নামতি কুমিল্লা অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়।

লালমাই অপর রাজকন্যার নামে নামকরণ করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তবে এই কন্যার নামে কোনো গল্প প্রচলিত নেই। সম্ভবত লালমাটিতে গঠিত বলে এই পাহাড়ের নাম লালমাই। লালমাটি> লালমাই। পূর্বেই বলেছি চন্দ্র বংশের (দশম শতাব্দী) রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে এই পাহাড়কে লালম্বী বলা হযেছে। লালম্বীর বর্তমান নাম লালমাই।

রাজস্থান লালমাই-ময়নামতি

কুমিল্লার স্থানীয় লোকেরা গল্প অথবা মজা করে বলে এরা ঊনশত (৯৯) রাজার দেশে বসবাস করছে। কথাটা শুধু মজা করার জন্য বলা হলেও লালমাই-ময়নামতির প্রায় সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রাচীন কীর্তির যে সব নিদর্শন রয়েছে তা থেকে কমপক্ষে ৮টি রাজবংশের প্রায় ৩০ জন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র এলাকায় খনন কার্য সম্ভব হয় নি। কত এলাকা বাদ রয়েছে আমরা সে কথায় পরে আসছি। খননকার্য সমাপ্ত হলে হয়তো ৯৯ রাজারই পরিচয় পাওয়া যাবে এবং অনেক ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।

লালমাই-ময়নামতি সমগ্র পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। রাণীর পাহাড়, সেনানিবাসের হাসপাতাল পাহাড়, আনন্দ রাজার বাড়ির পাহাড়, চারপত্র মুড়া, বৈরাগী মুড়া, কোটিলা মুড়া, অদুনা মুড়া, পদুনা মুড়া, কিলা মুড়া, পাক্কামুড়া, রূপবান মুড়া, আনন্দ বিহার, ফৌজ বিহার, শালবন বিহার, কোটবাড়ি মুড়া, উজিরা মুড়া, বালাগাজী মুড়া– সর্ব দক্ষিণে চণ্ডি মুড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে বহু প্রাচীন কীর্তির ধংসাবশেষের চিহ্ন রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলো বড় দীঘি।

প্রাচীন কীর্তির সন্ধান

লালমাই-ময়নামতি সমগ্র পাহাড়ি অঞ্চল জুড়ে এলোমেলো ভাবে স্তূপীকৃত ভাঙ্গা ইট, দেয়ালের চিহ্ন প্রভৃতি শতশত বছর পড়ে থাকলেও এ নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনো কৌতূহল ছিল না। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগও কখনো খোঁজ নিতে আসেনি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ময়নামতি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একটি রাস্তা তৈরির সময় ইটের তৈরি ছোট্ট একটি ইমারতের সন্ধান মেলে। কেউ কেউ একে দুর্গ মনে করলেও পরবর্তীকালে জানা যায় এটি ছিল ছোট্ট এক বৌদ্ধবিহার। এই বৌদ্ধবিহারে ১৮৯০

সালে একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রশাসনটি ছিল শ্রীরণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের। পট্টিকেরা ছিল তার রাজধানী সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এরকম একটি নিদর্শন পাবার পরও ব্রিটিশ সরকার এই প্রত্নসম্পদ উদ্ধার জন্য কিংবা সংরক্ষণের জন্য কোনরকম খননকার্য পরিচালনা বা অন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

বিরাট ক্ষতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনানিবাস নির্মাণ কাজে (ব্রিটিশ আমলে) প্রথম প্রাচীন ইট পাথরের এই ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে এখান থেকে অপ্রয়োজনীয় (?) ভাঙা ইট ও পাথর অপসারণ তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়। আরো দুর্ভাগ্য যে এই অপসারণে যা ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে কুমিল্লা বিমান বন্দর নির্মাণ ঠিকাদাররা। এরা লালমাই-ময়নামতির পরিত্যক্ত ইট-পাথর সংগ্রহ করে গোটা বিমান বন্দর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল নির্মাণ কাজেও এখান থেকে ইট নিয়ে ব্যবহার করেছে। ইট সংগ্রহকালে সেখানে পাওয়া সমস্ত প্রত্নসম্পদ যেমন– প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্র ফলক, বিভিন্ন পাত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে সরিয়ে ফেলে। পরবর্তীকালে এ সকল প্রত্নসম্পদের আর কোনো খোঁজ মেলেনি। এরকম ক্ষতি শুধু ইরাকের সাম্প্রতিক যুদ্ধকালের প্রত্নুনাশকতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। জাতির এতবড় সর্বনাশের বিষয়টি কেউ কখনো তদন্ত করে দেখেনি কিংবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করেনি। প্রাচীন মিশরের ফারাও রাজাদের মমী চুরি করে ব্রিটিশরা নিয়ে গিয়েছিল ও নায়াগ্রা মিউজিয়ামে বিক্রি করে দিয়েছিল। সেখান থেকে মিসরীয়রা সেই মমী এবং অন্যান্য কীর্তি ফেরৎ নিয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক আইন তার পক্ষে। বাংলাদেশের যে সমস্ত প্রত্নকীর্তি ব্রিটিশ সৈন্যরা বা ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা পাচার করে নিয়ে গেছে সেগুলো খুঁজে বের করে ফেরৎ আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যে সব প্রত্ন নিদর্শন নানা অজুহাতে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলোও ফেরৎ আনতে হবে।

ব্রিটিশ প্রত্নবিভাগের তৎপরতা

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের আমলে ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গোচরীভূত হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে লালমাই-ময়নামতিকে রক্ষা করে ২০টি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সংরক্ষণ করে। তবে ব্রিটিশ আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কোনো ধরনের খননকার্য চালায়নি। বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে সম্ভবত সেনানিবাস এলাকা বা তার আশেপাশে খনন কাজ থেকে এরা বিরত থাকে।

পাকিস্তান আমলে তৎপরতা

১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রথম জরিপ কাজ পরিচালনা করে এবং প্রাচীন কীর্তির অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ধ্বংসাবশেষের ৫৪টি স্থান সংরক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট করে। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বই থেকে সে তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ময়নামতি প্রাসাদ বা দুর্গ (২)
২. আনন্দ বিহার (৪)
৩. শালবন বিহার (৫)
৪. ভোজবিহার (৭)
৫. ধান মুড়া ১১)
৬. পাক্কা মুড়া (১২)
৭. আনন্দ বিহারের দক্ষিণের স্থান (১৩)
৮. হোগান মুড়া (১৪)
৯. উপত্যকাস্থান (Valley sites ১৬)
১০. আদিনা মুড়া (১৪)
১১. সবুরা মুড়া (১৮)
১২. রূপবানী মুড়া (১৯)
১৩. বড়গাছ মুড়ার দক্ষিণ (২০)
১৪. বড়গাছ মুড়া (২১)
১৫. নিরঞ্জন মুড়া (২২)
১৬. খাছার মুড়া (২৩)
১৭. হাতিগাড়া মুড়া (২৪)
১৮. কোটবাড়ি বিহার (২৫)
১৯. রূপবান মুড়া (২৬)
২০. রূপবান মুড়া হল (২৭)
২১. রূপবান কন্যা বিহার (২৮)
২২. ইটাখোলা মুড়া (২৯)
২৩. অর্জুন খোলা মুড়া (৩০)
২৪. চণ্ডী মুড়া (৩১)
২৫. কালিদাসের মুড়া (৩২)
২৬. সেনানিবাসের বাঙলোর মুড়া (৩৩)
২৭. চারপত্র মুড়া (৩৪)
২৮. চোল্লা মুড়া (৩৫)
২৯. ফকিরা মুড়া (৩৬)

৩০. আব্বাস আলী মুড়া (৩৭)
৩১. সিঙ্গারা মুড়া (৩৮)
৩২. এক্সিকিউটিভ অফিসার বাঙলা মুড়া (৩৯)
৩৩. ২য় মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিস্থান (৪০)
৩৪. গাবগাছ মুড়া (৪১)
৩৫. বটগাছ মুড়া
৩৬. মিনারখিল পাহাড়ের পশ্চিম দিকের মুড়া (৪৩)
৩৭. বৈরাগী মুড়া (৪৪)
৩৮. টাক্কা মুড়া (৪৫)
৩৯. বালাগাজী মুড়া (৪৬)
৪০. কোটিলা মুড়া (৪৭)
৪১. বৈরাগী মুড়া (৪৮)
৪২. আনন্দবাজার দীঘি (৪৯)
৪৩. ভোজ রাজার দীঘি (৫০)
৪৪. বড় ইটাখোলা মুড়া (৫১)
৪৫. বড় ইটাখোলা মুড়ার পূর্ব পাদদেশ (৫২)
৪৬. ভোজবিহারের পশ্চিম দিক (৫৩) এবং
৪৭. রুর‍্যাল একাডেমী (BARD ৫৪)

ঐ সময়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাত্র ৩ জায়গায় খনন কাজ পরিচালনা করে। সেগুলো হচ্ছে :

১. শালবন বিহার;
২. চারপত্র মুড়া;
৩. কোটিলা মুড়া।

পরে ময়নামতি প্রাসাদদুর্গ এবং তারও প্রায় ২০ বছর পর আনন্দ বিহার ভোজবিহার, রূপবান মুড়া ললিতকোর্ট মুড়া, চণ্ডীমুড়া প্রভৃতিতে খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। এ ৭/৮টি মাত্র জায়গায় (৫৪টির মধ্যে) যে প্রত্নবস্তুর বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে আমরা শুধু এগুলোর পরিচয়ই দিতে পারি। আরও যে ৪৬টির মতো চিহ্নিত জায়গা রয়েছে তার সম্পদ এখনও অনাবিস্কৃত।

শালবন বিহার

লালমাই পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে কিছুটা পূর্বদিক ঘেঁষে খননকার্যের ফলে বিরাট এক বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম দেয়া হয়েছে শালবন বিহার। এক সময় বিহার ও আশেপাশে প্রচুর শালগাছ ছিল, এই শাল গাছের জন্যই তার নাম হয়েছে শালবন বিহার। এখনও বিহারের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রচুর

শালগাছ আছে। পুরো এলাকাটিকে শালবন গ্রাম বলা হয়। বৌদ্ধদের কাছে এই বিহারের হয়তো একটি নাম ছিল। কিন্তু তথ্য প্রমাণের অভাবে তা আজও জানা যায়নি।

তবে শালবন বিহারকে শ্রীভবদেব মহাবিহারও বলা হয়। এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রদত্ত নাম। সর্বশেষ খননের ফলে বিহার চত্বরে যে সব মুদ্রক-মুদ্রিকা অনাবৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে ৩টি নিদর্শনের উত্তরাঞ্চলীয় নাগরী হরফে লেখা ভাষ্যের পাঠোদ্ধার দাঁড়িয়েছে "শ্রীভবদেব মহাবিহারাচার্য ভিক্ষু সংঘষ্য"। এর থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে বিহারটির আদি নাম 'শ্রীভবদেব মহাবিহার' এবং তা দেব বংশীয় রাজা ভবদেব প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মুদ্রিকাগুলো বিহারের ৩য় নির্মাণ যুগের। তাই এ বিহারের মূল নাম কী ছিল তা বলা শক্ত। ১৯৫৫ সালে শুরু করে কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ টিবিতে কয়েক দফা খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। এর ফলে ৬টি নির্মাণ (বসতি আমল) যুগের চিহ্নসহ একটি ১৬৭.৬ মি. বর্গাকার বিহারের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে আসে।

শালবন বিহার প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্বের এক বিরাট কীর্তি। দুর্গের আকারে নির্মাণ করা চার কোণ বিশিষ্ট এই বিহারের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০ মিটার। সম্পূর্ণ বিহারটি বর্গাকার। একটি বড় ধরনের মন্দিরকে কেন্দ্র করে দুর্গের মতো নির্মিত হয়েছে বিশাল সৌধ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন আকারে ছোট বড় হলেও পাহাড়পুর (সোমপুর) বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে শালবন বিহারের হুবহু মিল রয়েছে। তাঁদের ধারণা শালবন বিহার আকারে ছোট হলেও এটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের আগে নির্মিত হয়েছে এবং শালবন বিহারের অনুকরণে তার চেয়ে বড় আকারের পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার পরে নির্মিত হয়েছে। বিহারের চারদিকে একটি বেষ্টক প্রাচীর রয়েছে। এই প্রাচীর প্রায় ৫ মিটার প্রশস্ত। পরিবেষ্টিত প্রাচীরকে পেছনের দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করে বিহারের চারদিকে প্রাচীরের মধ্যেই ১১৫টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। কক্ষগুলোর আয়তন প্রায় ৪×৪ মিটার। দেড় মিটার প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষ পৃথক। প্রত্যেক কক্ষের মধ্যে রয়েছে ৩টি করে কুলঙ্গি। কক্ষগুলোর সামনের প্রশস্ত প্রাচীরের মাঝখানে একটি করে সরু প্রবেশ পথ। কক্ষগুলোর সামনে আড়াই মিটার প্রশস্ত লম্বা বারান্দা। এই কক্ষগুলোতে কারা বসবাস করতো বা কী উদ্দেশ্যে এগুলো নির্মিত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। কুলঙ্গিগুলো থেকে আন্দাজ করা হয় এগুলোতে দেব-দেবীর মূর্তি, চেরাগ (তেলের প্রদীপ), ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ইত্যাদি রাখা হতো এবং সঙ্গত কারণে মনে করা হয় যে, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণরা এ কক্ষগুলোতে বসবাস করতেন। তবে কক্ষগুলোতে কোনও জানালা না থাকায় এবং পরে কতকগুলো কামরায় ইটের তৈরি বেদীর অস্তিত্ব দেখে মনে করা হয় এগুলোতে বুদ্ধের মূর্তি ছিল ও কক্ষগুলো বৌদ্ধভিক্ষুরা পূজার জন্য ব্যবহার করতেন।

বিহারে একটি মাত্র প্রবেশপথ রয়েছে এবং তার অবস্থান উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝখানে। বহির্গত রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ মিটার। উত্তর-দক্ষিণে ৫০ মিটার দীর্ঘ রাস্তাটি চোখে পড়ে। এই রাস্তা দিয়ে এসে কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করলেই পাওয়া যায় উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় ১০×৭ মিটার আয়তনের একটি বিরাট কক্ষ। কেউ কেউ মনে করেন এটি হল ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ কক্ষের পাশেই আছে রক্ষীদের কক্ষ। এ কক্ষ থেকে দক্ষিণ দিকে আরেকটি ছোট কক্ষ রয়েছে। এটিকেও প্রত্নতত্ত্ববিদরা ছোট হলঘর মনে করেন। এ হলঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে কয়েকধাপ সামনে গেলে বিহার অঞ্চল। সেখান থেকেও কেন্দ্রীয় মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। শালবন বিহারের স্থাপত্য নক্সা সুপরিকল্পিত ও এর মধ্যে নির্মাণ প্রকৌশলের মেধা এবং নির্মাণ সামগ্রীর যুগোপযোগী ব্যবহারের চমৎকার সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

তুলনামূলক বিচারে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি ১১ হেক্টরের অধিক জায়গা জুড়ে উত্তরে-দক্ষিণে ২৮১ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৮০ মিটার প্রশস্ত। ২৮০ মিটার প্রশস্ত দুর্গাকৃতির এই বিহারের চার বাহুতে ১৭৭টি ভিক্ষু কক্ষ রয়েছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৪.১৯×৪.১৪ মিটার এবং কক্ষগুলোর বিভাজক দেয়াল ১.৮৪ মিটার চওড়া। এগুলোতেও কোনও জানালা নেই। বিহারের মধ্যে ১৫.৩৯ মিটার × ১৪.৩২ মিটার আয়তনের বড় হলঘরও রয়েছে। অন্যান্য স্থাপত্য নমুনা শালবন বিহারের মতোই।

শালবন বিহারের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত স্থপতি ও প্রকৌশলীগণ বিহারের পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখার জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন বলে মনে হয়। শ্রেণীবদ্ধ ভিক্ষু কক্ষসমূহের থেকে পানি নিষ্কাষণের সুন্দর ব্যবস্থা ছাড়াও এরা বিহারের মূল পরিকল্পনায় পশ্চিমাংশে একটি শৌচাগারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। বিহারের বাইরে এটিকে মূল বিহারের অংশ হিসেবে মনে করার কোনও কারণ নেই। বিহারের ভেতর থেকেই বাইরে যাবার সরু পথ রয়েছে।

শালবন বিহারে ৬টি নির্মাণ যুগের চিহ্ন বর্তমান রয়েছে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। মনে করা হয় সর্বপ্রথম বিহারটি নির্মাণ কাজ করা হয় খড়গ রাজবংশের রাজাদের আমলে। কিন্তু কোনও প্রকার তাম্রশাসন বা অন্য কোনও আলামত না পাওয়ায় নিশ্চিত করে বিষয়টি বলা যাচ্ছে না। এর পরে পাঁচ বার বিভিন্ন সময়ে বিহারটি মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করা হয় বলে ধারণা করা হয়।

'শ্রীভবদেব মহাবিহার' নামটি ৩য় নির্মাণ যুগের। তাই বিহারের প্রথম সময়কাল দেবদের ইতিহাসের চেয়ে প্রাচীন। ভবদেব তাঁর পূর্ববর্তী সময়কালের ধ্বংসাবশেষকে সম্ভবত ব্যাপকভাবে সংস্কার করেছিলেন। শালবন বিহারের সবচেয়ে নিচের স্তরে এমন একটি ধাতু ফলক লিপি পাওয়া গেছে যার সঙ্গে

গুণাইঘরে পাওয়া ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের ধাতু ফলক লিপির নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। এর থেকে কোনও কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন শালবন বিহারের প্রথম নির্মাণ যুগের (বসতি আমল) সময়কাল ষষ্ঠ শতক।[২] এই মতো সঠিক হলে শালবন বিহারের নির্মাণ গুপ্তদের সময়ে হওয়ার কথা।

কেন্দ্রীয় মন্দির

কেন্দ্রীয় মন্দিরটি বিহারের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মন্দিরটি ইটের নির্মিত। ইংরেজি 'ক্রুশ' আকারের। খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে এই ক্রুশ আকার গঠন মন্দিরের আকৃতির একমাত্র পরিচয় নয়। বিহার ইমারতের মতো মন্দিরে ৬টি নির্মাণ যুগের চিহ্ন রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন মূল মন্দিরের বাইরে ছোটখাট মেরামত করা হলেও কেন্দ্রীয় মন্দিরের বেলায় প্রায় প্রত্যেকবারেই আকারের পরিবর্তন করা হয়েছে। খননকাজে বেরিয়ে এসেছে বিহার অঙ্গনের স্তর থেকে মূল মন্দিরটি প্রায় ৮ মিটার মাটির নিচে আদিম অব্যবহৃত ভূমির ওপর সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয়েছিল। তাঁদের ধারণা দ্বিতীয় নির্মাণ যুগেও মন্দিরটির অবস্থান একই রকম ছিল। অর্থাৎ 'ক্রুশ' আকারের ছিল। ধারণা করা হয় এটি সপ্তম শতকে নির্মাণ করা হয়ে থাকবে। প্রথম সংস্কার বা দ্বিতীয় নির্মাণ যুগ সমতটের রাত রাজবংশের আমলে। তৃতীয় নির্মাণ যুগ দেব রাজবংশের। চন্দ্র বংশের শক্তিশালী নৃপতিরা দীর্ঘকাল শাসন ক্ষমতায় থাকায় চতুর্থ নির্মাণ যুগ তাঁদের আমলেই হয়ে থাকতে পারে। এরপর রাজা গোপীচন্দ্র বা পাল বংশের রাজারা পরবর্তী নির্মাণ যুগে নির্মাণ কাজ করিয়ে থাকবেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা তৃতীয় নির্মাণ যুগেও মন্দিরটি ক্রুশাকার অর্থাৎ পূর্বের রূপ লক্ষিত হয়। তবে আগের চেয়ে মন্দিরের আকার অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়। এই মন্দিরের প্রধান বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৬ মিটার। বৃহৎ কলেবরের এ মন্দিরটিতে মণ্ডপে মণ্ডপে ব্রোঞ্জ নির্মিত বড় বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। বিত্ত ও ঐশ্বর্যশালী চন্দ্র বংশের নৃপতিরা মন্দিরের ভেতর ও বাইরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়েছিলেন সুপরিকল্পিতভাবে। মন্দিরের ভিত্তিগুলোতে ছিল সুন্দরভাবে তৈরি করা সুক্ষ্ম ও খোপযুক্ত কোণ। পূর্ব ও পশ্চিমাংশের দেয়ালে সমান্তরাল দু'সারি অলংকৃত ইট দিয়ে শোভা বাড়ানো হয়েছিল। আর দু'সারির মাঝখানে লাগানো হয়েছিল এক সারি পোড়া মাটির চিত্র ফলক। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারেও প্রচুর পরিমাণে চিত্রফলক ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই চিত্রফলকগুলো শালবন বিহারের তৈরি চিত্রফলকের অনুকরণে তৈরি। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া মনে করেন, শুধু পাহাড়পুর কেন দূর প্রাচ্যের কালাসাম, বরদুর, পাগান ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্দিরগুলোও এই মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এর থেকে একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় পাহাড়পুরসহ দূরপ্রাচ্যের বিহারস্থপতি ও

প্রকৌশলীগণ শালবন বিহার থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, এর থেকে এটাও প্রমাণিত হয় এই বিহার নির্মাণ যুগ বা তৎপরবর্তীকালে পাহাড়পুর, কালাসাম, বরদুর, পাগান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে নির্মাতাদের (নৃপতি) সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এই কেন্দ্রীয় মন্দিরটি তৃতীয় নির্মাণ যুগে একাধিক তল বিশিষ্ট এবং বেশ উঁচু ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

খনন কার্যের ফলে চতুর্থ নির্মাণ যুগের মন্দিরটির যে রূপ দেখতে পাওয়া গেছে তা তৃতীয় নির্মাণ যুগের মন্দিরের চেয়ে প্রায় সম্পূর্ণটাই ভিন্ন। ভূমি পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়। ক্রুশ-আকার মন্দিরের স্থলে এটিকে আয়তাকার মন্দিরে রূপান্তর করা হয়। আয়তাকার হওয়াতে এই মন্দিরের আকার সামান্য ছোট হয়ে আসে। উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত উত্তরমুখি এই মন্দিরের আয়তন ছিল প্রায় ৩৬ বর্গমিটার। রাস্তা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দক্ষিণে কিছুদূর ওপরে উঠলেই ১০ বর্গমিটার আয়তনের কেন্দ্রীয় কক্ষের প্রবেশ পথ। স্তম্ভের ওপর নির্মিত ছিল এ কক্ষটি। এর চারদিকে প্রদক্ষিণের পথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষ ছাড়াও অনেকগুলো কক্ষের অস্তিত্ব আছে মন্দিরে।

চতুর্থ নির্মাণ যুগে মন্দিরের আকৃতিতে একটি অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন আনা হয়। আমরা জানি বৌদ্ধ মন্দির গঠন প্রণালীর দিক থেকে স্তূপাকার রীতির। কিন্তু চতুর্থ যুগে তা পরিবর্তন করে চতুষ্কোণাকার করা হয়েছে। এটি হিন্দু মন্দিরের গঠন প্রকৃতি। এই যুগে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণে হিন্দু মন্দিরের প্রভাব কেন পড়েছিল তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। দুটি কারণে তা ঘটে থাকতে পারে। প্রথমটি হলো হিন্দু রাজা এতদঞ্চল অধিকারের পর হিন্দু ধর্মের রীতিতে তার সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু এমন রাজার পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বর্মণ রাজবংশের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের সময় কাল পালদেরও পরে। চতুর্থ নির্মাণ যুগ পালদেরও আগের এরকম মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। চন্দ্র বংশের রাজাদের রাজ্য বিস্তারের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত ছিল বলে (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়) গৌড় অঞ্চলের কারিগর দ্বারাও এটি নির্মাণ করা হতে পারে। লড়হচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সময় এ মন্দিরের সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। তবে বৌদ্ধ ধর্মের আলঙ্কারিক চিন্তার ছাপ মন্দিরে রয়ে গেছে।

পঞ্চম নির্মাণ যুগে মন্দিরের আয়তাকার রূপে পরিবর্তন করা হয়নি। তবে একটু ছোট করা হয়েছে । অন্যান্য দিক অপরিবর্তিতই থাকে। কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণ দিকে ছিল পূজার কক্ষ। তার আশেপাশে কতগুলো উপাসনা কক্ষ ছিল। এগুলোতে বৌদ্ধমূর্তি, প্রদীপ, পূজার উপাচার, ত্রিপিটক প্রভৃতি রাখার জন্য কুলঙ্গি ও শ্রমণদের বসার জন্য আসনের ব্যবস্থা ছিল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম নির্মাণ যুগের সকল নিদর্শন বিনষ্ট হওয়ার কারণে এ দু' যুগের

নির্মাণ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এখন মাটির ওপরে মন্দিরের যে অবশিষ্ট চিহ্ন আছে তা পঞ্চম নির্মাণ যুগের। এ বিহার ও মন্দিরের ৭টি নির্মাণ যুগ থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় প্রায় ৬/৭ শ বছর এই বিহার ও কেন্দ্রীয় মন্দির উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিহারের অন্যান্য মন্দির বা ইমারত

বিহারের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়াও আরও কয়েকটি ইমারতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বর্গাকার একটি ইমারত রয়েছে। ৪টি স্তম্ভ এবং দেয়ালের ওপর নির্মিত এক কক্ষ বিশিষ্ট এই ইমারতটিকে হলঘর বলে মনে করা হয়। এ ইমারতের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে দুটি ছোট আকারের কক্ষ রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন হল ঘরটি ছিল ভিক্ষুদের ভোজনালয় ও পাশের কামরা দুটি রন্ধনশালা। এ ইমারতের চারদিকে অসংখ্য ভাঙ্গা মৃৎপাত্র, বাসন-কোসন, কাঠ-কয়লা ও ছাই পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয় এটি শেষ নির্মাণ যুগের। কেন্দ্রীয় মন্দিরের পশ্চিম পাশে দুটি ইমারতের চিহ্ন আছে। তার মধ্যে একটি মন্দির। এটি আয়তাকার, অপরটি বর্গাকার। এগুলো উপাসনার কাজে নাকি অন্য কোনও কাজে ব্যবহৃত হয়েছে নিশ্চিত করে বলা যায় না। বিহার অঞ্চলে আরও বেশ কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। সেগুলোর খননকার্য এখনও সমাধা হয়নি। তবে মহাস্থবির, ভান্তে, ভিক্ষু এবং শ্রমণদের নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা শয়নকক্ষ ছিল এবং পরিকল্পিত শৌচাগার ও পানি ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। এগুলোর নিদর্শন এখন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে বিহার পরিকল্পনা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় বিহারের মূল মন্দির, অন্যান্য মন্দির ও ইমারত সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

বিহারের বাইরের স্থাপনা

শালবন বিহারের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় ২৫ মিটার উত্তরে বিহারের বাইরে বর্গাকারের একটি স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটিকে একটি বৌদ্ধ মন্দির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পূর্বমুখি মন্দিরটির সামনে একটি পাকা রাস্তা এবং তা বিহারের প্রধান প্রবেশ তোরণের রাস্তার সাথে মিশেছে। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে আছে আয়তাকার একটি পূজাকক্ষ। তার চারদিকে প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ। মন্দিরের দেয়াল ছিল বেশ প্রশস্ত। হিন্দু স্থাপত্যের পরিকল্পনায় এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অভিমত। এরা মনে করেন সপ্তম-অষ্টম শতকে এ পদ্ধতিতে মন্দির নির্মাণ করা হতো। কিন্তু বাইরের এ মন্দিরটি নানা কারণেই কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এখানে বহিরাগতদের আবাস স্থলের বিষয়টি উড়িয়ে দেয়া যায় না। মূল বিহারে যাদের স্থান হয়নি এরা সম্ভবত এখানে জায়গা পেয়েছেন।

শালবন বিহারে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

শালবন বিহারের খননের ফলে অসংখ্য মূল্যবান প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপি, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার, নানা ধরনের মূর্তি, পোড়া মাটির চিত্রফলক সিলমোহর, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী, স্তূপ প্রতিকৃতি প্রভৃতি মূল্যবান প্রত্নসম্পদ এখানে পাওয়া যায়। এগুলো প্রথম থেকে পঞ্চম নির্মাণ যুগের। কারণ ষষ্ঠ ও সপ্তম নির্মাণ যুগের নিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে।

তাম্রশাসন বা তাম্রলিপি

এখানে আটটি তাম্র শাসন পাওয়া গেছে :

১. বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন

বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়। বিহারের নিম্নতম স্তরে এটি রাখা ছিল। প্রায় ২৬.৬৭ সে.মি. × ১৫.৮৭ সে.মি. আয়তনের এই লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি। তামার পাতের ওপরের অংশে প্রায় ৯.২১ সে.মি. × ১১.৭৫ সে.মি. আয়তনের একটি সিলমোহর রয়েছে। তাতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূর্তির নিচে এক পংক্তির একটি লিপি। তাতে লেখা 'মহারাজা শ্রী বৈন্যগুপ্তশ্বর'।

২. দেব খড়গের তাম্রশাসন

তৃতীয় নির্মাণ যুগে ৭৫ নং কক্ষে খননকালে এটি পাওয়া যায়। প্রায় ২৫.৪ সে.মি. × ২০.৩২ সে.মি. আয়তনের এই তাম্রশাসনের ওপরের দিকে মোট ৪৫ পংক্তি লিপি আছে। সামনের দিকের ওপরিভাগের মধ্যাংশে একটা সিলমোহর আছে। তাতে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ। সিলের নিচে লেখা : শ্রীমৎ দেবখড়গ। এই তাম্রশাসনের ২৭ নং পংক্তিতে 'রাজপুত্র বলভট্ট' লেখা আছে। এ দুটি পাঠ ছাড়া বাকী পাঠ উদ্ধার সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

৩. খড়গ তাম্রলিপি

প্রায় ১৯.০৫ সে.মি. × ১৫.২৪ সে.মি. আয়তনের এই তাম্রশাসনটির তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৭৫ নং কক্ষ থেকে পাওয়া গেছে এবং এর মাঝখানেও একটি সিলমোহর রয়েছে। তবে তা দেবখড়গের অবিকল নয়। মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে পাঠোদ্ধার হয়নি। তা সত্ত্বেও অক্ষর ও সিল দেখে এটিকে খড়গ তাম্রশাসন বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

৪. বলভট্টের তাম্রশাসন

তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৫১ নং কক্ষ থেকে এটি আবিষ্কৃত। প্রায় ৩৪.২৯ সে.মি. × ২৫.৪ সে.মি. আয়তনের এ লিপিতে প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৫টি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১১টি পংক্তি রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের অংশের মধ্যভাগে সিলের মধ্যে একটি উপবিষ্ট ষাঁড়ের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মরিচা পড়ার কারণে সিলের পাঠোদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু তাম্রলিপির সংক্ষিপ্ত পাঠ থেকে জানা যায় 'পরমেশ্বর রাজপুত্র বলভট্ট' পবিত্র ক্ষীরোদ নদী পরিবেষ্টিত তাঁর দেব পর্বত জয়স্কন্ধাবারে অবস্থিত কটকশীলা রাজপ্রাসাদ থেকে ভগবান বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার, স্তূপ, আশ্রমের সংস্কার, নবকর্ম ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ও সুস্পষ্ট সীমারেখা বেষ্টিত ২৮ পাটকেরও বেশি ভুমি দান করেছিলেন। ঐ তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় রাজপুত্র বলভট্ট খড়্গ রাজবংশীয় রাজা। লিপিতে স্বামী দেবখড়্গ, খড়্গ, জাতখড়্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বলভট্টের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে জৈষ্ঠ্য মাসের চতুর্থ শুক্লা তিথিতে এ তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়।[৩]

৫. আনন্দদেবের তাম্রশাসন

এটি পঞ্চম নির্মাণ যুগের ১১৪নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত হয়। এর আয়তন প্রায় ২৬.৯৯ সে.মি. × ২১.৫৯ সে.মি.। এ তাম্রশসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৮টি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৬টি পংক্তি রয়েছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তির নিচে আলাদাভাবে আরো ৯টি পংক্তি আছে। এগুলো রাজা ভবদেব সম্পর্কিত। তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠার ওপরিভাগের মধ্যস্থলে ধর্মচক্রমুদ্রার একটি সিলমোহর আছে। এর দু'পাশে একটি করে হরিণের প্রতিকৃতি, সিলের নিচে 'শ্রী বঙ্গাল মৃগঙ্কশ্য' লিপিবদ্ধ আছে। রাজা শান্তিদেবের পৌত্র ও রাজা বীরদেবের পুত্র রাজা আনন্দদেব তার ৩৯ তম রাজ্যাংকে ১২ ভাদ্র দিনে রত্নভুক্তির পুত্র জয়ভুক্তি কর্তৃক একটি মন্দির নির্মাণের জন্য বিশ্ববিখ্যাত সমতটে অবস্থিত পেরনাটন বিষয়ে বিভিন্ন আয়তনের (৩ পাটক, ৪ পাটক, অর্ধপাটক) ভূমিদান করেছিলেন। তার জয়স্কন্ধাবার বসন্তপুর থেকে এ লিপি প্রদত্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার লিপি থেকে দেখা যায় ৯ নং পংক্তিতে আছে রাজা ভবদেব তার দেবপর্বতস্থিত জয়স্কন্ধাবার থেকে দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে ১৩ ভাদ্র দিনে পেরনাটন বিষয়ে আবিষ্কৃত ৩ পাটক ভূমি জয়ভুতি কর্তৃক নির্মাণের জন্য ত্রিরত্নের বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ নামে একটি বিহারিকা প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান অনুমোদন করেন।

৬. ভবদেবের তাম্রশাসন

এটি তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৫নং কক্ষ থেকে উদ্ধার করা হয়। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ৩৪টি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৯টি পংক্তি লিপিবদ্ধ করা আছে। এর মধ্যে ধর্মচক্র বিশিষ্ট সিল

আছে। এ লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এটি আনন্দ দেবের পুত্র ভবদেবের তাম্রশাসন।

৭. দেববংশীয় তাম্রশাসন-১

তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৮৫ নং কক্ষ থেকে এটি আবিষ্কৃত। আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। প্রায় ১০.১৬ সে.মি. × ৬.৮৩ সে.মি.। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ২২টি ও ২য় পৃষ্ঠায় ৬টি পংক্তি লিপিবদ্ধ করা আছে। আনন্দদেবের তাম্রশাসনের মতো এতেও ধর্মচক্র বিশিষ্ট সিল রয়েছে। পাঠোদ্ধার করা না গেলেও একে দেববংশীয় কোনও রাজার তাম্রশাসন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

৮. দেববংশীয় তাম্রশাসন-২

চতুর্থ নির্মাণ যুগের ২৯ নং কক্ষ থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। এর আয়তন প্রায় ১০.১৬ সে.মি. × ৫.৭১ সে.মি.। আনন্দদেবের তাম্রশাসনের মতো এতেও ধর্মচক্র বিশিষ্ট সিল রয়েছে। তাই তা দেববংশীয় কোনও রাজার বলে মনে করা হয়। এ তাম্রশাসনেরও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রাপ্ত মুদ্রা

শালবন বিহারে ৪ শতাধিক বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৮টি স্বর্ণমুদ্রা, ৩৫০ টিরও বেশি রৌপ্য মুদ্রা এবং কিছু তাম্র মুদ্রা। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে খননকালে একটি ছাড়া বাকী সবগুলো মুদ্রাই পাওয়া গেছে শালবন বিহারে।

স্বর্ণমুদ্রা

১৮টি স্বর্ণ মুদ্রার, ২টি গুপ্ত সম্রাটদের । এগুলোর মধ্যে ১টি সমুদ্রগুপ্তের (৩৩৫-৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) অশ্বমেথপরাক্রম মুদ্রা। তা পাওয়া গেছে বিহারের দক্ষিণ ব্লকের ৭০নং কক্ষে। দ্বিতীয় মুদ্রাটি সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৫-৪১৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং তা পাওয়া গেছে বিহারের তৃতীয় নির্মাণ যুগের ১৩নং কক্ষে। এর এক পৃষ্ঠে ধনুক হাতে রাজার প্রতিকৃতি অন্য পৃষ্ঠে লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি।

অন্যান্য স্বর্ণমুদ্রা

এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো গুপ্ত সম্রাটদের অনুকরণে তৈরি।

১. অষ্টম শতকে বৌদ্ধ দেব বংশের রাজত্বকালে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রার অনুকরণে নির্মিত এ মুদ্রাটি দ্বিতীয় গুপ্তমুদ্রার সঙ্গেই ১৩ নং কক্ষে পাওয়া যায়। মুদ্রার ওপরে 'শ্রীভঙ্গালমৃগাঙ্ক' কথা কয়টি উৎকর্ণ। আনন্দদেবের শালবন বিহার তাম্রশাসনেও অনুরূপ কথা থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি দেববংশীয় রাজাদেরই মুদ্রা।

২. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৭৯ নং কক্ষ থেকে এ মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়। এর এক পৃষ্টে অষ্টভূজা লক্ষ্মীমূর্তি এবং অপরপৃষ্ঠে রাজার মূর্তি। রাজার মূর্তির সামনে 'শ্রী' কথাটি উৎকীর্ণ আছে। এটি কার জানা না গেলেও প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এটি সপ্তম শতকের মুদ্রা।

৩. দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার ধাচে প্রাপ্ত এ মুদ্রাটিও প্রায় অন্ধ অনুকরণে নির্মিত। এতে 'শ্রী কুমার' নাম লেখা আছে বলে মনে করা হয়।

৪. চতুর্থ নির্মাণ যুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এ মুদ্রাও ৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মুদ্রার অনুরূপ।

৫. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত এ স্বর্ণ মুদ্রাও তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর্ণমুদ্রার অনুরূপ। তবে এতে রাজার মূর্তির সামনে 'সুচৌন্য' শ্রীফম' কথা লিখিত আছে। মূর্তির বাম বাহুর নিচে 'জঅ' লিখিত আছে। অনুমান এটি সপ্তম শতাব্দীর স্বর্ণ মুদ্রা।

৬. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ২ নং কক্ষ থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়। এটি পঞ্চম মুদ্রার অনুরূপ।

৭. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। ৬ এর অনুরূপ।

৮. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৩৬ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। অতি ক্ষুদ্রাকারের (সিঁকির সমান) ধাতুমান খুব নিচু। সপ্তম মুদ্রার প্রায় অনুরূপ।

১০. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯১ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের।

১১-১৩. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯১নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। ২টি স্বর্ণে নির্মিত এবং একটি মিশ্রিত ধাতুতে নির্মিত। গুপ্তদের অনুকরণে নির্মিত মুদ্রাগুলোর মধ্যে 'শ্রীবলভট্ট' নাম আছে। অক্ষরগুলো খড়গ তাম্রশাসনের লিপিবদ্ধ অক্ষরের মতো। মুদ্রায় ষাঁড়ের প্রতিকৃতি আছে।

১৪. তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৯৮ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। এ মুদ্রা মিশ্র ধাতুতে তৈরি। দেখতে বলভট্টের মুদ্রার মতোই। তবে এতে 'সর্বণর' পাঠ আছে দেখে মনে করা হয় এটি নতুন কোনও রাজবংশের মুদ্রা।

১৫-১৬ তৃতীয় নির্মাণ যুগের ৫২ নং কক্ষ থেকে আবিষ্কৃত। এ মুদ্রা দুটি হারিয়ে গেছে।

রৌপ্য মুদ্রা

শালবন বিহারের প্রবেশ পথের পূর্ব দিকে অবস্থিত পূর্ব ব্লকের দুটি কক্ষ থেকে ২২৪টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। এ মুদ্রাগুলোর উপরে ষাঁড় ও ত্রিশূল বা ত্রিরত্নের

প্রতিকৃতি আছে। বেশির ভাগ মুদ্রার ওপর এক দিকে একটি উপবিষ্ট ষাঁড় ও ষাঁড়ের ওপর। 'পট্টিকেরা' কথাটি লেখা আছে। কোনও কোনটিতে 'ললিতাকর ধর্ম বিজয়', 'য়্যারিক্রিয়', 'আরিক্রিয়,' 'হারিকেল', ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। মুদ্রার অন্যদিকে আছে একটি ত্রিশূল বা 'ত্রিরত্ন' এবং এর ওপরে আছে গোলাকার সূর্য ও প্রায় পঞ্চমী চন্দ্রের প্রতিকৃতি। এই মুদ্রাগুলো নিয়ে নানা কথা আছে।

ড. নীহাররঞ্জন রায় কুমিল্লা ময়নামতির উৎখননের ফলে প্রাপ্ত মুদ্রা ভাণ্ডার সম্পর্কে বলেন, এ আবিষ্কার অর্থবহ এবং আলোচনা অপরিহার্য। মুদ্রাগুলোকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে সুবর্ণ মুদ্রাগুলো যার সঙ্গে গুপ্ত উত্তর বাংলায় প্রচলিত অপেক্ষাকৃত পাতলা ওজনের 'নকল' স্বর্ণমুদ্রার কোনও পার্থক্য নেই বললেই চলে। এ ধরনের মুদ্রা সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুদ্রাগুলোর একদিকে বামপাশে দণ্ডায়মান একটি নারী মূর্তি আর একদিকে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান নরমূর্তি। খুব সম্ভব রাজা-রাণীর মূর্তি অথবা শ্রীলক্ষ্মী। অনেকগুলো মুদ্রার একদিকে গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণে দণ্ডায়মান মূর্তির বামহাতের নিচে ছোট্ট এক লাইন লেখা। লেখাগুলোর পাঠোদ্ধার হয়নি। তবে একটি মুদ্রায় বলভট্ট নামে ব্যক্তির নাম আছে আর একটিতে যা লেখা আছে তা পড়া হয়েছে 'ভঙ্গলমৃগাঙ্কশ্য' নামে। পড়েছেন ময়নামতির বিবরণ লেখক এফ এ খান। প্রধানত সেন বংশীয় রাজাদের সিলমোহর ও তাম্রশাসন উৎকীর্ণ 'শ্রীভঙ্গলমৃগাঙ্ক' লাইনটি অনুসরণ করে। দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন এ পাঠ যথার্থ নয়। শুদ্ধভাবে হওয়া উচিত 'অভিনবমৃগাঙ্কশ্য'। যেহেতু দেব বংশীয় রাজা ভবদেবের সিলমোহর আঁকা তাম্রশাসনে লেখা আছে তার পাঠ 'শ্রীঅভিনবমৃগাঙ্ক', সন্দেহ নেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এ 'নকল' গুপ্তউত্তর স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল দেব বংশের রাজাদের আমলে, অষ্টম শতকে। আর এক পর্যায়ের মুদ্রা ময়নামতিতে পাওয়া গেছে। অধিকাংশ রৌপ্য মুদ্রা। সংখ্যায় প্রচুর। ওজনে খুব হালকা এবং বোধ হয় একাধিক মূল্যমানের। মুদ্রাগুলোতে কালের চিহ্ন নেই। একপিঠে আছে একটি বিন্দু বলয়চক্র, তার ভেতরে একটি রেখাচিত্র, বাঁ দিক ঘেঁষে উপবিষ্ট বিষ্ণু মূর্তি। অন্য পিঠে দুটি বৃত্ত। বাইরে রেখাবৃত্ত, ভেতরে বিন্দুবৃত্ত এফ.এ. খান এই রেখা ও বিন্দুবৃত্ত অলংকৃত লাইনটিকে ত্রিরত্ন কেন বলছেন বোঝা দুষ্কর। এতগুলো মুদ্রার একদিকে মোটা লেখা রয়েছে। লেখাটিকে কেউ কেউ পড়ছেন পটিকের্য, কেউ কেউ পড়ছেন পট্টিকের। আবার কতগুলো মুদ্রায় লেখা হরিকেল। বুঝতে কষ্ট হয় না মুদ্রাগুলো যথাক্রমে পট্টিকের ও হরিকেলের তঙ্কশালায় মুদ্রিত। কতকগুলো মুদ্রার উল্টো পিঠে ধর্মবিজয়, ললিতকর বলে ছোট একটি লেখা আছে। ধর্মবিজয় ও ললিতকর বোধ হয় ব্যক্তি নাম বা উপাধি। হয় স্থানীয় শাসনকর্তা বা তঙ্কশালার অধিকর্তা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এই রৌপ্য মুদ্রাগুলোর প্রায় সবগুলোই দক্ষিণ-

পূর্ব বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের (দশম-একাদশ শতাব্দী)। পট্টিকের ও হরিকেল দুটিই এদের রাজত্বে ছিল। মুদ্রাগুলোতে যে লেখা আছে তার অক্ষর সাক্ষ্য আমার এ ধারণার প্রতিকূল নয়। কিন্তু আমার এ ধারণার অন্য কারণও আছে। এ তথ্য সুবিদিত যে, আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজত্ব খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী কি তারও আগে থেকে শুরু করে অন্তত একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। সে সময় পগানরাজ আনাউরহথা (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর আরাকান জয় ও অধিকার করেন। যার ফলে তার রাজ্যের পশ্চিম সীমা পট্টিকেরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের শঙ্খ, বৃশ, অঙ্কুশ, চামর, শ্রীবৎসচিহ্ন প্রভৃতি লাঞ্চিত রং রেখ ও বিন্দু চক্রালংকৃত প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে প্রাচীনতর মুদ্রার সঙ্গে প্রাচীন ফুনান, দারবর্তী, প্রাচীন প্যু নোন রাজাদের অন্যান্য রাজধানীতে প্রাপ্ত মুদ্রার আত্মীয়তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু যে যে মুদ্রাগুলো পরবর্তীকালের সেগুলোর সাথে ঘনিষ্ট আত্মীয়তা লালমাই-ময়নামতিতে পাওয়া রৌপ্য মুদ্রাগুলোর সঙ্গে। বৃশলাঞ্চন এবং রেখ ও বিন্দু চক্রালংকার প্রায় একই রকমের। কিন্তু মুদ্রার সামাজিক ধর্মের রূপ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো লালমাই-ময়নামতিতে পাওয়া রৌপ্য ধাতু এল কোথা থেকে? প্রাচীন বাংলায় রূপার এত সচ্ছলতা ছিল না। গুপ্ত আমলে ও পরে পাল আমলে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রূপা বিদেশ থেকে আসতো। যে কারণেই হোক দেশে রূপার আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ঐ সময় সোনার চেয়ে রূপার দাম বেশী ছিল। রৌপ্য মুদ্রাগুলো দুর্লভ। তাহলে লালমাই ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা যত হালকা ওজনেরই হোক রূপা– এল কোথা থেকে। এ রূপা এসেছে আরাকান থেকে। বর্মা ও এশিয়াজাত রূপা। আরাকানের সাথে ময়নামতির ঘনিষ্ট বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এ অনুমানের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান এবং সেই বাণিজ্যাশ্রায়ই এ প্রাচীন আরাকানের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিস্তার। লালমাই ময়নামতির পট্টিকের নগর ও রাজ্য সেই বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎস এবং তা অন্তত সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই।[৪]

ড. নীহাররঞ্জন রায় মুদ্রাগুলো বাইরে থেকে এসেছে একথা বলেননি। মুদ্রাগুলোর কাঁচামাল কোথা থেকে এসেছে তার উৎস নির্দেশ করেছেন। মুদ্রাগুলো যে এখানেই তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও মতপার্থক্য নেই। তবে আরাকান এবং সমতটে (হরিকেল, পট্টিকেরা) রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণে অধিকন্তু একই ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি হওয়ায় মুদ্রাগুলোর গায়ে বৃষলাঞ্চন, রেখ ও বিন্দু চক্রালঙ্কার এক হয়ে থাকবে।

এখানে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে শশাঙ্কের একটি, পূর্ব-বাংলার আকাড়া নামক এক অজানা রাজবংশের কয়েকটি ও গুপ্ত অনুকৃত কিছু মদ্রাও রয়েছে।

আরবদেশীয় মুদ্রা

শালবন বিহারে আরবদেশীয় একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এটি প্রথম দিককার আব্বাসীয় খলিফাদের বলে এফ.এ. খানের ধারণা। কুফিক লিপিযুক্ত এ মুদ্রাটি অতি জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

তাম্র মুদ্রা

গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণে তৈরি কয়েকটি তাম্র মুদ্রা এখানে পাওয়া গেছে যার পাঠ উদ্ধার করা যায়নি।

নিবেদন স্তূপ সিল

বিহার খনন করার পরে কয়েকটি নিবেদন স্তূপ পাওয়া গেছে। নলের আকারে তৈরী ড্রাম, চার কোণাকার হার্মিকা ও সূঁচাল চূড়া ইত্যাদি স্তূপ স্থাপত্যের সকল গতানুগতিক কায়দা কানুনই এগুলোতে দেখা যায়। এগুলোর ভেতর বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্ত্রযুক্ত সিল ও বৌদ্ধ গুরুদের অস্থি-ধাতু থাকতো। মৃৎপাত্রে কিছু লিপিও পাওয়া গেছে। অক্ষর বিচারে লিপিগুলো অষ্টম শতাব্দীর।

শালবন বিহারে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির সিলমোহরে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সিলমোহরগুলোর ওপরাংশে আছে একটি উপবিষ্ট মৃগ, মৃগের নিচে ধর্মচক্র। এটি দেব বংশীয় রাজাদের রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন। এ প্রতীক চিহ্নের নিচে তিন পংক্তির একটি লিপিতে আছে 'শ্রী ভবদেব মহাবিহারাচার্য ভিক্ষু সংঘ্য।' এ লিপি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় শ্রীভবদেব এ মহাবিহার নির্মাণ করেছেন। শ্রী আনন্দদেবের তাম্রশাসন এবং ভবদেবের তাম্রশাসনগুলোর সঙ্গে এ সিলমোহরের পাঠ মিলিয়ে নিশ্চিতভাবে জানা যায় দেব বংশের তৃতীয় নৃপতি শ্রী আনন্দদেব ও তাঁর পুত্র শ্রী ভবদেব শালবন বিহার তৈরি করেছিলেন। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই তাঁদের তাম্রশাসন ও সিলমোহর পাওয়ার আগে এই রাজবংশের কথা কারো জানাই ছিল না।

ব্রোঞ্জের স্মারক আধার

খননকালে শালবন বিহারে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি স্মারক আধার পাওয়া যায়। এটি প্রায় ১.৬০ সিটার উঁচু ও এর মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ ছিল। কিনার খাঁজ কাটা। ঝুলিয়ে রাখা বা বহন করবার জন্যে এর কাঁধের নিচে একটি গোলাকার রিং ছিল।

প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ মূর্তি

শালবন বিহারে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেব-দেবীর ১৫০ টিরও অধিক ব্রোঞ্জ মূর্তি পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে প্রায় সবকটাই বৌদ্ধ, বোধিসত্ব, তারা, সর্বাণী, মঞ্জুশ্রী, জম্ভল

ও প্রজ্ঞাপারমিতার ছোট মূর্তি ৬.৬×৫.৭১ সে.মি. আয়তনের এসব ব্রোঞ্জ মূর্তির প্রায় পৃষ্ঠদেশ ফলক বিশিষ্ট খাড়াভাবে তৈরি। নিম্নাংশে পদ্মাসনের নিচে আছে বেদী আকারে গঠিত স্তম্ভমূল ও ওপরে আছে ছত্রাকারে নির্মিত চূড়া। অনেক মূর্তিতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি অসাধারণ গঠন বৈচিত্র্যের পরিচায়ক প্রত্যেকটি মূতিতেই শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় রয়েছে। বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির মূর্তিকে অতি উঁচু দরের শিল্প নিদর্শন বলা যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ময়নামতি জাদুঘর থেকে ৩৬ টি অতি মূল্যবান ব্রোঞ্জ মূর্তি হারিয়ে যায়। মূতিগুলোর শিল্প নৈপুণ্যে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের বিবর্তন ঘটেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন মহাজান, হীনজান, বৌদ্ধ ধর্ম কেমন করে ক্রমে ক্রমে তান্ত্রিক ধর্মের ওপরে হিন্দু ধর্মে বিলীন হয়েছিল তার ইঙ্গিত এসব মূর্তির মধ্যে রয়েছে।

ব্রোঞ্জের স্তূপ প্রতিকৃতি

শালবন বিহারে একটি অতি সুন্দর ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে। চারকোণ ভিত্তি বেদীর ওপর নির্মিত এবং মলাকার ড্রাম ও অর্ধ গোলাকার গম্বুজ বিশিষ্ট এ প্রতিকৃতিতে গম্বুজের ওপরে আছে হ্রস্বায়মান একটি হার্মিকা। হার্মিকার ওপরে আছে গোলাকার স্তূপ শীর্ষ। স্তুপাকারের চারদিকে পিরামিডের মতো চারটি মন্দিরের প্রতিকৃতি। চারটি মন্দিরের প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে বৌদ্ধ মূর্তি। এগুলোর মধ্যে দুটি পদ্মপাণি, একটি বজ্রপাণি ও অপরটি চার হাত বিশিষ্ট এক বৌদ্ধ দেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলোর দুপাশে আছে অলংকৃত স্তম্ভ।

পোড়ামাটির চিত্র ফলক

তৃতীয় নির্মাণ যুগে শালবন বিহারের ক্রুশ আকার কেন্দ্রীয় মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম ভিত্তি দেয়ালে এবং তার আশেপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা অসংখ্য পোড়া মাটির চিত্রফলক (তেরাকোটা প্লাকস) পাওয়া গেছে। এর আগে বা পরে নির্মিত মন্দিরটিতে কোনও পোড়া মাটির চিত্রফলক পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন হলো এগুলো কাদের রাজত্বকালে ব্যবহৃত হয়েছিল অর্থাৎ তৃতীয় নির্মাণ যুগটা কাদের। কেউ কেউ মনে করেন সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধ দেব বংশীয় নৃপতিরাই এগুলো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এরাই আবার বলেছেন যে, দেব বংশের লোকেরা এই মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। এটি অসংগতিপূর্ণ নিঃসন্দেহে। আমাদের ধারণা তৃতীয় নির্মাণ যুগ দেব বংশীয় রাজাদের।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরে প্রাপ্ত চিত্রফলকগুলোর তুলনায় শালবন বিহারের চিত্রফলকের সংখ্যা কম হলেও গুণগত দিক থেকে এগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শৈল্পিক উৎকর্ষের মানে কাদামাটির চিত্রফলকগুলো হয়তো খুব উঁচু মানের নয়। কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্য, সমকালীন জীবনচিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির তৎকালীন পরিচয়ের মধ্যে এ চিত্রফলকগুলোর মূল্য অসাধারণ। এসব চিত্রফলকে

যে সব বিচিত্র ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। বৈচিত্র্য তুলে ধরার জন্যে বিশাল ক্যানভাসে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, জীব-জন্তু, পাখি, দেবতা-অর্ধদেব, ফুল-লতা-পাতা ইত্যাদির চিত্র স্থান করে দেয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে আছে বালক-বালিকা, যোদ্ধা, গায়ক, নর্তকী, মল্লযোদ্ধা, বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত নরনারী প্রভৃতি। অর্ধ দেবতার মধ্যে আছে গন্ধর্ব, অপ্সরা, মর্কট, কীর্তিমোখ, কীন্নর-কীন্নরী। কীন্নরীদের দেহ অদ্ভূত ধরনের। এদের দেহের উর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী লোকের মতো, নিম্নাঙ্গ জন্তুর মতো। কিন্তু পাখির মতো এদের ডানা আছে। প্রাণীর মধ্যে আছে সিংহ, হাতি, হরিণ, বরাহ, বানর, অশ্ব, মহিষ ইত্যাদি পশু। রাজহংস, ময়ূর ইত্যাদি পাখি। সর্প, নেউল ইত্যাদি সরীসৃপ। মৎস, কচ্ছপ ইত্যাদি জলজ প্রাণী। গাছ-পালা, ফুল, বিশেষ করে পদ্মফুলতো আছেই। সিংহের মূর্তিগুলোতে রাজকীয় মর্যাদার অভিব্যক্তি আছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরের প্রতি কোণে এক মাথা ও দু' দেহ বিশিষ্ট মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অবাক ব্যাপার এই যে বর্তমানে শুধু কুমিল্লা অঞ্চল নয়, সারা বাংলাদেশে কোথাও সিংহ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের এই শিল্পীরা নিশ্চয়ই সিংহ না দেখে সিংহের মূর্তি বানাননি। অর্থাৎ লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে সিংহের বাস ছিল। হস্তি ও বন্য শূকর রূপায়নে এক আশ্চর্য শিল্প স্বাভাবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্ব, মহিষ অংকনেও সমান দক্ষতা। বানর মূর্তির প্রতি শিল্পীর পক্ষপাতিত্ব এবং অপরূপ শিল্প নৈপূণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় রাজহংসের মূর্তিতে। নেউল ও ফণা তোলা সাপের যুদ্ধ চিত্রটি সব কালের কৌতূহলের বিষয়। চিত্রফলকগুলো নানা কারণে মূল্যবান। এতে যেমন লোকশিল্পের পরিচয় আছে তেমনি আছে তখনকার সমাজচিত্র। ইতিহাসকালের প্রথম যুগে কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম বিশ্বাস, জীবিকা, প্রভৃতির পরিচয় মেলে এই চিত্রফলকে। বিশেষ করে কর্মরত মানুষের জীবিকার ধরন আমাদের সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য

শালবন বিহারে খননকাজের ফলে নিত্য ব্যবহার্য বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন আকার, ধরন ও গঠনের মৃৎপাত্র। কোনও কোনও মৃৎপাত্রে অষ্টম শতাব্দীর অক্ষরের ধরনের কিছু লিপি আছে। মাটির তৈরি দ্রব্যের মধ্যে তেলের প্রদীপ ও দোয়াতও পাওয়া গেছে। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক তেল কোথায় পাওয়া যেত তখন। দোয়াত আছে, কোনো লেখা বা গ্রন্থ পাওয়া যায়নি কেন? গাছের কষ বা পশুর চর্বি হয়তো জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতো। কিন্তু এত সভ্য একটি যুগে প্রায় ৭-৮ শত বছরের ইতিহাসে কোনও পুস্তক লেখা হবে না এটা হতেই পারে না। প্রাকৃতিক আর্দ্রতার কারণেই সম্ভবত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ বা বই রক্ষা করা যায়নি।

আরও পাওয়া গেছে স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ নির্মিত নানা অলংকার। এর মধ্যে আছে আংটি, কানের দুল, হাতের চুড়ি। আরও আছে রৌপ্য খণ্ড, লোহা নির্মিত কড়ি, পেরেক, বর্শী, দা, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, খন্তা ইত্যাদি যন্ত্র। প্রস্তর নির্মিত দ্রব্যের মধ্যে সিল-নোড়া ও যাঁতাকল। এছাড়া পাওয়া গেছে বিপুল সংখ্যক মূল্যবান পাথরের গুটি যা খুবই প্রাচীন এবং মৌর্য আমলের বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংস্কার কাজ

খননের পর থেকেই বিহার সংস্কার ও মেরামত কাজ চলে আসছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় বিহারটিতে বর্তমানে টিকেট সিস্টেম চালু হওয়ায় তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য–

ক. কেন্দ্রীয় মন্দিরের পূর্ব পাশের ছোট মন্দিরের সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে।

খ. বিহারের পূর্ব ও দক্ষিণ বাহুর ৪০টি কক্ষের মেরামত কাজ করা হয়েছে।

গ. বিহারের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত তারা মন্দিরের পূর্ব পাশে নব আবিষ্কৃত দুটি স্তূপের মেরামত করা হয়েছে।

ঘ. কেন্দ্রীয় মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি ছোট ঢিবি সমতল করার ফলে একটি স্তূপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ছোট ক্রুশাকার মন্দিরের ভিত আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঙ. বিহারের পূর্ব সীমানা প্রাচীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরোনো আস্তর অপসারণ করে নতুন আস্তরসহ স্লোসেম করা হয়েছে এবং

চ. পরিবেশ উন্নয়ন ও বাগান সম্প্রসারণের জন্য প্রধান ফটকের পূর্ব পাশের ভূমি সমতল করা হয়েছে।

কোটিলা মুড়া

ময়নামতি সেনানিবাস এলাকায় কোটিলা মুড়া অবস্থিত। এটি সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা। শালবন বিহার থেকে এর অবস্থান ৫ কিলোমিটার উত্তরে। এখানে পাশাপাশি তিনটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনটি স্তূপ পাশাপাশি থাকায় পণ্ডিতেরা মনে করেন স্তূপ তিনটি সম্ভবত বৌদ্ধ 'ত্রিরত্ন' যেমন, বুদ্ধ (জ্ঞান, ধর্ম) ন্যায় এবং সংঘ (শৃংখলা) এর প্রতীক। এটি এক অনন্য ঘটনা। এরকম কম্বিনেশন উপমহাদেশের কোথাও দেখা যায় না।

কোটিলা মুড়ার আবিষ্কৃত মন্দির পরিকল্পনায় ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। মন্দিরগুলো স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত। ভিত্তি বেদীগুলো বর্গাকার। চারকোণা ভিত্তির ওপর তৈরি করা হয়েছে গোলাকার ড্রাম। মন্দিরের ওপরিভাগ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়

মন্দিরের ওপরকার অবস্থা কী ছিল তা জানা যায় না। তবে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, শালবন বিহার খননকালে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরে রক্ষিত ব্রোঞ্জ নির্মিত যে স্তূপ প্রকৃতি আছে তা থেকে স্তূপগুলোর শীর্ষদেশে অবস্থিত হারমিকা ও চূড়ার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে ড্রামের ওপর নির্মিত ছিল অর্ধগোলাকার গম্বুজ এবং গম্বুজের ওপরে নির্মিত হয়েছিল হারমিকা ও চূড়া।[৫]

কেন্দ্রীয় স্তূপটি ধর্মচক্রের মাঝখানে গোলাকার একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। এ কক্ষের চারদিকে আটটি ছোট কক্ষ, কক্ষগুলো ইট দিয়ে নির্মিত, চক্রকারে এগুলোর অবস্থান মাঝখানের স্তূপের দু'পার্শ্বে। অন্য দুটি স্তূপ ইটের তৈরি। স্তূপগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে গভীর গর্ত রয়েছে। এই গর্তগুলো থেকে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদন স্তূপ এবং সিলমোহর পাওয়া গেছে।

স্তূপ তিনটি পূর্বদিকে আয়তাকারে নির্মিত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ দুটি হলরুম রয়েছে। কেন্দ্রীয় হলরুমটির আয়তন প্রায় ১৬×১৪ মিটার। এই হলরুমে ভিক্ষুদের ধর্মীয় সভা হতো বলে মনে হয়। এই হলরুমের দক্ষিণ দিককার প্রায় ৭×১২ মিটার আয়তনের কক্ষটি সম্ভবত ভিক্ষুদের থাকার কাজে ব্যবহৃত হতো। উত্তর পাশে আরেকটি হলরুম রয়েছে। কিন্তু তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এর সঠিক আয়তন দেখা যায় না। হলরুমগুলোর চারদিকে প্রদক্ষিণ পথ ছাড়াও এগুলোতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে রয়েছে বেশ বড় বড় সিঁড়ি। এই ত্রিরত্ন স্তূপের গুরুত্ব নিশ্চয়ই সমকালীন বৌদ্ধ বিশ্বের জানা ছিল। স্তূপগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এর সম্বন্ধে বর্তমানে তেমন কিছু জানা যায় না।

ত্রিরত্ন স্তূপের পশ্চিমদিকে নয়টি স্তূপের ভিত্তি অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া আরো অসংখ্য স্তূপ ছিল বলে ধারণা করা হয়। নয়টি স্তূপের মধ্যভাগে একই রকম গোলাকার গর্ত রয়েছে। সে সব গর্তে পাওয়া গেছে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদন স্তূপ।

কোটিলা মুড়ার পুরো এলাকাটি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের কিছু অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ মিটার প্রশস্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৯০ মিটার লম্বা। প্রাচীরে খোপযুক্ত প্যানেলের কারুকাজ পরিদৃশ্যমান। তিনটি প্রবেশ পথই ছিল প্রাচীরের পূর্বদিকে। ধাপে ধাপে ছিল বিরাট আকারের সিঁড়ি। সেনানিবাসের ভেতরে থাকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মাণ কাজে ঠিকাদাররা এখানকার ইট ব্যবহার করায় এ বিহারের প্রচুর ধ্বংস সাধিত হয়। কোটিলা মুড়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি বৌদ্ধ বিহারের অবস্থান কল্পনা করা হয়। এ বিহার ত্রিরত্ন বিহার ছিলো বলে এর গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইট অপহরণকারী এবং প্রত্ন-বস্তু চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত ব্যক্তিদের অপতৎপরতায়

অনেক মহামূল্যবান প্রত্ন-বস্তু হারিয়ে গেছে, না হয় এটি বিহার হিসাবে আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পারতো।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

এ বিহারে তেমন প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু বা নিদর্শন পাওয়া যায়নি, তার কারণ ওপরে বলা হয়েছে। মাঝখানের স্তূপের কেন্দ্রীয় এবং পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলো থেকে মাটির তৈরি অসংখ্য নিবেদন স্তূপ এবং মাটির তৈরি সিলমোহর চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়া নরম পাথরের কিছু মূর্তি হস্তগত হয়েছে। এ মূর্তিগুলো বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য বুদ্ধ দেব-দেবীর। তবে কিছু আরাধনারত সাধারণ মানুষের প্রতিকৃতিও রয়েছে। আরাধনারত মানুষের প্রতিকৃতি একটি ব্যতিক্রম প্রাপ্তি। এই মূর্তিগুলো কোথা থেকে এসেছে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা আছে। কেউ কেউ মনে করেন এ মূর্তিগুলো ত্রিপুরা রাজ্য বা চট্টগ্রাম অথবা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কীর্তি। এতে ধারণা করা যায় ত্রিপুরা রাজ বা আরাকান রাজদের রাজ্য বিস্তার কালে এগুলো ময়নামতিতে এসে থাকবে। নরম পাথরের মূর্তি নির্মাণের কৌশল ময়নামতি অঞ্চলের কারিগরদেরও জানা থাকা বিচিত্র নয়। কোটিলা মুড়া বিহারের সবচেয়ে বড় প্রত্ন আবিষ্কার হচ্ছে বাগদাদের আব্বাসীয় বংশের শেষ খলিফা আবু আহমেদ আবদুল্লাহ আল মুতানিম বিল্লাহর (১২৪২-৫৮ খ্রিস্টাব্দ) একটি স্বর্ণ মুদ্রা। এ মুদ্রাটি সর্বোচ্চ স্তর থেকেই পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা যায় এ বিহারে ঐ সময়কার স্বর্ণ মুদ্রাতো ছিলই, আরও অসংখ্য প্রত্নকীর্তি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এ মুদ্রাটি পাওয়ার প্রেক্ষিতে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তখনকার ময়নামতি অঞ্চলের রাজা বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আরবদের নৌ-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। এ নৌ-বাণিজ্য আরাকান রাজবংশের রাজা কিংবা শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের দ্বারাও হয়ে থাকতে পারে। কারণ ময়নামতি রাজবংশের রাজাদের সঙ্গে আরাকানের বিভিন্ন রাজবংশের সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। কোটিলা মুড়ায় তিনটি নির্মাণ যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে প্রমাণ অভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে প্রথম এই বিহার কোনও রাজার সময়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে ধারণা করা হয় সপ্তম শতাব্দীতেই খড়গ রাজবংশের আমলে এটি প্রথম নির্মাণ করা হয়ে থাকবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুদ্রা পাওয়ায় এটাও নিশ্চিত হয়ে গেছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরেও বিহারটি ব্যবহার করা হয়েছে।

চারপত্র মুড়া

কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় সোয়া দু কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সেনানিবাস এলাকার প্রায় ১২ মিটার একটি ছোট সমতল পাহাড়ের চূড়ায় চারপত্র মুড়ার অবস্থান। পাকিস্তান আমলে (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ) সেনানিবাস সম্প্রসারণের কাজে এ স্থাপনাটির

অস্তিত্ব ধরা পড়ে। খোঁজ পেয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটি সংরক্ষণ করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন কাজের ফলে এখানে অতি মূল্যবান প্রত্নকীর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এ মুড়ায় পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ৩০ মিটার × ১২ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। মন্দিরের ভেতরে একটি হলরুম। এর ছাদ ৪টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো। তার পশ্চিমে প্রধান আরাধনা কক্ষ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একটি আচ্ছাদিত পথ দিয়ে আরাধনা কক্ষে যেতে হয়। আরাধনা কক্ষটি অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। বাইরের প্রাচীরে কারুকাজ রয়েছে।

এ মুড়া বা মন্দিরের কোনও নাম পাওয়া যায়নি। চারপত্র নামটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দেয়া। এ মন্দিরে ৪টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে চারপত্র মুড়া।

প্রত্নসম্পদ

এ মুড়াতে খনন কাজ পরিচালনা করার পর ৪টি তাম্রশাসন এবং একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত স্মারকাধার (Reliecas ket) পাওয়া গেছে।

লড়হচন্দ্রের প্রথম তাম্রশাসন

এ তাম্রশাসনের উভয় পৃষ্ঠে ৩০টি করে পংক্তি রয়েছে। ওপরের পৃষ্ঠার ওপরিভাগের মাঝামাঝি স্থানে দুদিকে পরিবেষ্টিত ধর্মচক্রের সিলমোহর রয়েছে। সিলের নিচে 'শ্রীলড়হদেবঃ' কথাটি লিপিবদ্ধ আছে। এ তাম্রশাসন থেকে জানা যায় শ্রী ত্রৈলোক্য চন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রের পৌত্র ও শ্রী কল্যাণচন্দ্রের পুত্র শ্রীলড়হচন্দ্র দেব তাঁর ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লড়হমাধবের জন্য সমতট মণ্ডলের অন্তঃপাতী পেরনাটন বিষয়ের অধীনে শ্রীপট্টিকের ৩টি গ্রামে ভূমি দান করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল শ্রী বিক্রমপুর এবং সেখান থেকে তিনি ভূমি দান করেছিলেন। তার নামের আগে পরমসৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কথাগুলো ব্যবহৃত আছে[৬]।

লড়হচন্দ্রের দ্বিতীয় তাম্রশাসন

এ তাম্রশাসনটিও প্রথম তাম্র শাসনের সংগে পাওয়া গেছে। এর উভয় পৃষ্ঠায় ২৯টি করে পংক্তি রয়েছে। লিপি একই ধরণের। ধর্মচক্র সিলমোহর আছে। শ্রী বিক্রমপুর থেকে সমতট মণ্ডলের অধিপতি পেরনাটন বিষয়ের অধীনে শ্রী পট্টিকেরকে সুরভরখ নামক গ্রামে ৮ পাটক ৩৭.৫ দ্রোণ ভূমি দান করা হয়। লড়হচন্দ্রের ২টি তাম্র শাসন থেকে তাঁর রাজত্বেরই শুধু নয় চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সম্বন্ধেও বিস্তারিত তথ্য জানা যায়।

গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসন

লড়হচন্দ্রদেবের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের ওপরের পৃষ্ঠায় ২৯ এবং নিচের পৃষ্ঠায় ১৯টি পংক্তি লিপিবদ্ধ করা আছে। এতেও ধর্মচক্রের সিলমোহর

আছে। রাজধানী বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত এ তাম্রশাসনের মাধ্যমে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রদেবেব সমতট মণ্ডলের অধিপতি পেরনাটন বিষয়ে অধীনে ২ পাটক ভূমি নটেশ্বর ভট্টারকের জন্য দান করেছিলেন।[৭]

বীরধরদেবের তাম্রশাসন

২৭.৯৪×২২.৮ মিটার আয়তনের এ তাম্রশাসনটিও পাওয়া গেছে চারপত্র মুড়ায়। এর প্রথম পৃষ্ঠায় ১১টি এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২টি পংক্তি লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম পৃষ্ঠার ওপরের মধ্যভাগে একটি সিলমোহর আছে। এতে কৃষ্ণচক্রের দুদিকে আছে একটি করে শঙ্খ। তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষে দৌড়রত একটি কুকুরের প্রতিকৃতি রয়েছে। রাজা বীরধরদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে এ তাম্রশাসনের মাধ্যমে সমতট মণ্ডলের ভতগঙ্গ বিষয়ের অধীনে শ্রী লড়হমাধবের জন্য ১৫ পাটক ভুমি দান করা হয়। বিন্যাসের দিক থেকে এ লিপিকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি বলে মনে করা হয়।[৮]

এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন জনৈক রাজা শ্রীবীরধর দেব, কৃষ্ণচক্র লাঞ্চিত এক পট্টলিদ্বারা ১৭ পাটক ভূমি দান করেছিলেন। পঠনের অক্ষর সাক্ষ্যে মনে হয় বীরধরদেব একাদশ-দ্বাদশ শতকের কোনও এক সময় সমতট মণ্ডলের ময়নামতি অঞ্চলের কোথাও রাজত্ব করতেন। কিন্তু তার বংশ পরিচয় কী, সমতট মণ্ডলের চন্দ্রান্ত্যনামা রাজা শ্রীচন্দ্রের বংশদরদের সঙ্গে তাঁর কোনও আত্মীয়তা ছিল কিনা এ তথ্য জানা যায় না।[৯]

আনন্দ বিহার

কুমিল্লার বিহারগুলোর মধ্যে আনন্দ বিহারের আয়তন সবচেয়ে বড়। বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মিটার। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম বিহার এবং পাহাড়পুর বিহারের পরেই এর স্থান।[১০] এই বিহারটি শালবন বিহার থেকে সোয়া তিন কিলোমিটার উত্তরে ও কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে। এই বিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদরা ময়নামতি পাহাড়ের পূর্ব দিকে অপেক্ষাকৃত নিচু ও সমতল ভূমিকে বেছে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ বিহারটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিহারের মাটির ওপরিভাগের সমস্ত স্থাপনা ভেঙ্গে ইটগুলো সরিয়ে ফেলা হয় এবং কুমিল্লা বিমান বন্দর মেরামত ও পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে মাটির ওপরে বিহারের আর কোনও চিহ্নই নেই। তবে সামান্য মাটির নিচে ভিত্তি প্রাচীরের চিহ্ন রয়েছে। ভিত্তি প্রাচীরের কোনো কোনো অংশ স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের। এত বড় একটি বিহার ইট অপহরণকারীদের হাতে

ধ্বংস হয়ে গেল সেটি ভাবাই যায় না। যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে করা যায় এ বিশাল বিহারে অসংখ্য প্রত্নবস্তু ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছিল যা লুট হয়েছে অথবা কায়দামতো সরিয়ে নিয়েছে। পরে পাচার করে দিয়েছে প্রত্নব্যবসায়ী কিংবা প্রত্ন সংগ্রাহকদের কাছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বিহারের খননকার্য শুরু করে। খননকার্য পরবর্তী বেশ কয়েক বছর যাবৎ চলে। খননকার্যের ফলে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রথমত বিহারের চারদিকের সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত পাহাড়পুর এবং শালবন বিহারের মতো প্রধান একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে এ বিহারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলো একই আঙ্গিকে তৈরি। নক্‌শা মোটামুটি এক। তাছাড়া সমান বাহু বিশিষ্ট বর্গাকারের হওয়ায় সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম কিংবা তান্ত্রিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে এবং অন্যান্য আদিধর্মে বিশ্বাসী সমাজে ন্যায় বিচারের প্রতীক সম্ভবত বর্গক্ষেত্রাকার বস্তু বা ধারণা।

এ বিহারেও ৪টি ব্লকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসের জন্যে অনেকগুলো কক্ষ ছিল। উত্তর ব্লকের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে ছিল বিহারের একমাত্র প্রবেশ দ্বার। প্রায় ৩০ মিটার দীর্ঘ ও ১৩.৫ মিটার প্রশস্ত একটি বহির্গত অংশ সৃষ্টি করে বিরাট আকারের প্রবেশ পথটি তৈরি করা হয়েছে। প্রবেশ দ্বারের ৩টি অংশ ছিল বলে মনে হয়। তোরণ দ্বারটির আয়তন ছিল প্রায় ৫×৫ মিটার। এ পথ অতিক্রম করে সামনে গেলে প্রায় ৯×৪ মিটার আয়তনের একটি হলরুম পাওয়া যাবে। এটি পার হয়ে প্রায় ৮×২.৫ মিটার আয়তনের আর একটি হলরুম পাওয়া যাবে। ওপরে বর্ণিত প্রবেশ পথের দুপার্শ্বের ৬টি কক্ষ খনন করা হয়। খননের পর দেখা গেছে পেছনের দেয়ালটি প্রায় ৩ মিটার প্রশস্ত। আর কক্ষগুলোর আয়তন প্রায় ৩×২.৮ মিটার বা ৩.৬×২.৮ মিটার। দেয়ালের বাইরে থেকে নানা কারুকাজ ও দেয়ালের কার্নিসে অলংকৃত ইটের ব্যবহার দেখে মনে করা হয় বিহারটি অত্যন্ত মনোরম করে তৈরি করা হয়েছিল।

বিহারের ভেতরে একটি মুক্তাঙ্গন ও তার কেন্দ্রে ছিল কেন্দ্রীয় মন্দিরটি। মন্দিরটি কত বড় ছিল এটি নিশ্চিত করে বলা শক্ত। কারণ মন্দিরের মাটির নিচের ইটও অনেকদূর পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে অলংকৃত ভাঙা ইট, পোড়া মাটির চিত্রফলক প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার ফলে আন্দাজ করা যায় কেন্দ্রীয় মন্দিরটি ছিল কারুকাজখচিত সুরম্য এক অট্টালিকা। অলংকৃত ভাঙা ইট ও পোড়া মাটির চিত্রফলক থেকে বোঝা যায় আনন্দ বিহারের স্থাপত্যকর্ম অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলবার জন্য স্থপতি ও নির্মাণ প্রকৌশলীরা বেশ যত্নবান ছিলেন। কেন্দ্রীয়

মন্দিরের আশেপাশে আরও কয়েকটি ছোট বড় ইমারতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কেন্দ্রীয় মন্দির ও অন্যান্য ইমারতগুলোর খনন কাজ সমাপ্ত হলে বিস্তারিতভাবে প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে জানা যাবে।

এ বিহারের অবস্থানগত একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রায়ই দেখা গেছে বৌদ্ধ বিহারগুলো লোকালয়ের বাইরে স্থাপন করা হয়েছে। এখানে তার ব্যতিক্রম। এ বিহারের অতি কাছে যেমন রয়েছে কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঠিক তার সামান্য দক্ষিণেই রয়েছে ভোজ বিহার ও রূপবান কন্যার বিহার। ১.৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে কোটিলা মুড়ার ৩টি স্তূপ। কাছে ধারে আরও অনেক স্থাপনার অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলো মন্দির হতে পারে। বাসস্থানও হতে পারে। হতে পারে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কেউ কেউ ধারণা করেন এ বিহারটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল।

স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল জাগে এমন একটি বিরাট কীর্তি কে স্থাপন করেছিলেন? কিন্তু তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বহু যুগ থেকে মানুষ এই বিহারকে আনন্দ রাজার বাড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী জলাশয়কে আনন্দ রাজার দীঘি বলে জেনে আসছে। দেব বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন আনন্দ দেব। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস মতে তিনি এটি নির্মাণ করেছিলেন। জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্যান্য প্রত্নবস্তুর সঙ্গে ভবদেবের একটি তাম্রশাসনও পাওয়া গেছে। এই তাম্রশাসনকে (Calcutta Plate of Bhavadev) বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত আনন্দ দেবই ভবদেবের পিতা ছিলেন। লোকশ্রুতির ওপর ঐতিহাসিক বিষয়ে নির্ভর করা চলে না। তা সত্ত্বেও ভবদেবের তাম্রশাসনপ্রাপ্তি এবং লোকশ্রুতির প্রেক্ষিতে যদি ধরে নেয়া হয় আনন্দরাজা এ বিহার নির্মাণ করেন তাহলে তার সময় দাঁড়ায় সপ্তম শতকের শেষ ভাগ। এ তথ্য থেকে এটাও নিশ্চিত হওয়া যায় আনন্দ রাজার বিহার নির্মিত হয়েছিল শালবন বিহারের আগে। তাহলে এটিই লালমাই অঞ্চলের প্রথম বৌদ্ধ বিহার।

আনন্দ বিহারের নির্মাণ যুগ

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের প্রতিবেদন থেকে আনন্দ বিহারের নতুন কিছু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এ বৎসরে খননকাজের ফলে ১৯০.৫ মিটার × ১৯০.৫ মিটার পরিমাপের বর্গাকার এ বিহারের স্থাপত্যিক কাঠামোতে তিনটি নির্মাণ যুগের নিদর্শন উন্মোচিত হয়। বিহার আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থলে ক্রুশাকার মন্দিরের লে-আউট আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে শুধু কেন্দ্রীয় মন্দিরের খনন কাজ সীমিত রাখা হয়। পূর্বের খননের ফলে ক্রুশাকার মন্দিরের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের লে-আউট প্রকাশিত হয়। বর্তমান খননে ক্রুশাকার মন্দিরকে পরিত্যাগ করে আয়তাকার পরিকল্পনায় পর পর আরও দুবার

পুনর্নির্মাণের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ দু নির্মাণ যুগকে খুব সামান্য পরিবর্তন করে আরও দুবার মন্দিরটি সংস্কার ও ব্যবহারের আলামত পাওয়া গেছে। এর ফলে মন্দিরটি তিনটি প্রধান নির্মাণ যুগ ও দুবার পুনর্নির্মাণ যুগসহ মোট পাঁচটি নির্মাণ পর্বে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রথম নির্মাণ যুগ : আগের খননের ফলে বিহার অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে একটি চতুর্মুখী ক্রুশাকার মন্দিরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমের লে-আউট উন্মোচিত হয়েছিল। পূর্ব-পশ্চিমে এর পরিমাপ ৫৫.৯৫ মিটার। এর দক্ষিণ ও পূর্ব মুখে ৩টি করে মণ্ডপ ও ২.১৩ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথের নিদর্শন পাওয়া যায় (নকশা-১)।

দ্বিতীয় নির্মাণ যুগ : ক্রুশাকার মন্দিরটিকে পরিত্যাগ করে পরবর্তীকালে এর ওপরেই আয়তাকার পরিকল্পনায় একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। এর পরিমাপ ৩৩.৮৩ মি. × ৩১.৪০ মিটার। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে মাঝামাঝি স্থানে ২.৭৫ × ৩.৩৫ মি. পরিমাপের একটি গর্ভগৃহ পাওয়া গেছে। এর চারদিকে ১.৫ মিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। চার বাহুতে ১২টি কক্ষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কক্ষগুলোর পেছনে সামনে ও বিভাজকে যথাক্রমে ২.১৩ মি, ১.৮৩ মি. এবং ১.৬৮ মিটার প্রশস্ত দেয়াল রয়েছে। কক্ষসমূহের সামনের বারান্দা ২.১৩ মিটার প্রশস্ত। গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি হলরুম ছিল বলে মনে হয় যার পরিমাণ ১২.৮০×১২.৮০ মিটার হতে পারে। পরবর্তী নির্মাণের কারণে দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের অনেক নিদর্শন বিনষ্ট হলেও উত্তর বাহুর উত্তর-পশ্চিম কোণে ৩.৮১×৩.০৫ মিটারের একটি কক্ষ পাওয়া গেছে। অন্য কক্ষগুলো এই পরিমাপের বলে ধারণা করা হয়। এই নির্মাণ যুগেই পরবর্তী সময়ে গর্ভগৃহের মেঝেকে উঁচু করে প্রদক্ষিণপথ আবৃত করে পূর্ব ও পশ্চিম পাশে অতিরিক্ত দুটি ছোট আকারের গর্ভগৃহ সংযুক্ত করা হয় (নকশা ২, ৩)।

তৃতীয় নির্মাণ যুগ : দ্বিতীয় নির্মাণ যুগকে পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দেয়ালের স্থান ১০.৫২ মিটার দক্ষিণে সরিয়ে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ১০.০৫ মিটার সংকুচিত করে আয়তাকার পরিকল্পনায় মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হয়। ফলে তার পরিমাপ দাঁড়ায় ৩৭.১৯ মি. × ২১.৩৪ মি.। এ নির্মাণ যুগেও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্য ভাগ থেকে ২.১৩ মি. × ০.৯১ মি. পরিমাপের একটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কক্ষে যাওয়ার জন্য ৩.৩৫ মি. প্রশস্ত একটি প্রবেশ পথ দেখা গেছে। প্রবেশ পথের সম্মুখে একটি খোলা চত্বর আছে। এর উত্তর দিকে একটি হলরুম পাওয়া গেছে। এ কক্ষটির পরিমাপ ৫.৭৯×৫.৭৯ মিটার। হলরুমের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে দুটি কক্ষের নিদর্শন রয়েছে যার পরিমাপ ২.৩৬×৩.৩৫ মিটার (নকশা ৪)।

এ নির্মাণ যুগেও পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়। দক্ষিণ দিকের পেছনের দেয়ালকে আরও দক্ষিণে সরিয়ে সরু করা হয়েছে ও পূর্ব-পশ্চিম পাশের দেয়ালকে সংকুচিত করা হয়েছে। এ সময় গর্ভগৃহের পরিমাপ ২.৭৫×২.১৩ মিটার

ও কক্ষের পরিমাপ ৩.৩৬×৩.৩৫ মিটার দাঁড়ায়। এ সময়ে গর্ভগৃহে যাওয়ার রাস্তাটিও বন্ধ করে দেয়া হয়। গর্ভগৃহের সামনে একটি মঞ্চ ছিল বলে ধারণা করা হয়। মন্দির এলাকার সব জায়গার খনন এখনও শেষ হয়নি বিধায় মন্দিরের বেশ কিছু বিষয় অনাবিষ্কৃত রয়েছে। তারপরও মন্দিরটি শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (নকশা ৫)।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, বৌদ্ধ বিহারটির ভূমি নকশা উন্মোচিত হওয়ায় একে 'আনন্দ রাজার' বাড়ি নয়, 'আনন্দ রাজার বিহার' নামে পুনঃ নামকরণ করা হয়েছে। এর থেকে অনুমিত হয় যে খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকের দেব বংশের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠতম রাজা আনন্দ দেব এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু আনন্দ দেবের পুত্র ভবদেব শালবন বিহারের তৃতীয় নির্মাণ যুগের স্থপতি। আনন্দ বিহার শালবন বিহারের চেয়ে প্রাচীন হলে এটি আনন্দ রাজার নির্মাণের কথা নয়। কেননা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেরই এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শালবন বিহারের প্রথম নির্মাণ ষষ্ঠ শতকে। এদিক থেকে আনন্দ রাজার বিহার আনন্দ রাজা তৈরি করলে এটি শালবন বিহারের পূর্বে নির্মিত হওয়ার কথা নয়। আরও খননের ফলে এটি নিশ্চিত হওয়া যাবে। মন্দিরের পূর্ব বাহু এখনও খনন করা যায়নি। কারণ সেখানে গভীর সেগুন বাগান গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরের খননও অসম্পূর্ণ। এ বিহারের খনন কাজ শেষ হলে আরও বহু মূল্যবান প্রত্নসম্পদ পাওয়া যেতে পারে বলে প্রতত্ত্ববিদরা মনে করেন। আর তাহলেই সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ের সমতটের ইতিহাস পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

বিহারে প্রাপ্ত প্রত্ন সম্পদ

১. ভবদেবের তাম্রশাসন : এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি পাওয়া গেছে।

২. প্রস্তর প্রত্নযুগের কিছু অস্ত্র-শস্ত্র এ বিহারে পাওয়া গেছে এবং এগুলো তৈরির কিছু উপকরণও বিহারে পাওয়া গেছে। প্রস্তর যুগের এসব অস্ত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ।

৩. এখানে গুপ্তদের মতো অর্থাৎ গুপ্ত স্বর্ণ মুদ্রার আদলে তৈরি কিছু স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে।

৪. বৃষ ও ত্রিশূল অঙ্কিত কিছু রৌপ্য মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

৫. বুদ্ধ, ধ্যানী বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের ব্রোঞ্জ মূর্তি, তারা বা চূণ্ডার ৮ হাত বিশিষ্ট ব্রোঞ্জ মূর্তি, ব্রোঞ্জ নির্মিত নিবেদন স্তূপ প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

৬. প্রত্নবস্তুর মধ্যে ব্রোঞ্জের তৈরি বিরাটাকার অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাওয়া গেছে।

৭. এখানে পোড়ামাটির অসংখ্য চিত্রফলক, নকশা করা ইট, পোড়ামাটির ফলকে তৈরি সিলমোহর প্রভৃতি পাওয়া গেছে। চিত্রফলকগুলোর মান অসাধারণ।

৮. এখানে মাটির তৈরি অসংখ্য হাড়ি-পাতিল বা তৈজষপত্র পাওয়া গেছে।

আনন্দ রাজার দীঘি

আনন্দ বিহার থেকে প্রায় ১০০ মিটার পূর্ব দিকে গেলে আনন্দ রাজার দীঘি। এটি অত্যন্ত প্রাচীন এক জলাশয়। উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা, ৬৩ বিঘা ভূমি জুড়ে এ দীঘির অবস্থান। দীঘির পাড়গুলো প্রায় ৬ থেকে ৭ মিটার উঁচু। পানির অংশের আয়তন ৫০০ মিটার × ২০০ মিটার। এর গভীরতা প্রায় ৮ মিটার। এটি নিশ্চিত যে, বিহারবাসীদের পানির ব্যবস্থা করার জন্যই এ দীঘি খনন করা হয়েছিল।

ভোজ বিহার

স্থানীয়ভাবে ভোজবিহারকে লোকজন ভোজরাজার বাড়ি বলে। এটি আনন্দবিহারের কাছাকাছি বা এক কিলোমিটারের মধ্যে। বিরাটাকারের এ সুপ্রাচীন বিহারটি বর্গাকারে নির্মিত এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯০.৫ মিটার। চারদিকে বেশ প্রশস্ত প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরকে অবলম্বন করে বিহারের কক্ষগুলো নির্মিত হয়েছিল। কক্ষগুলোতে ভিক্ষুরা বাস করতো বা ধ্যান করতো। প্রাচীরের উত্তর দিকের ব্লকের মাঝামাঝি স্থানে বিহারের প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বার থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলে উচুঁ একটি সিঁড়ি পাওয়া যায়। ঢিবিটি প্রায় ৬ মিটার উঁচু। কেউ কেউ ধারণা করেন এখানে কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল। এটি কথিত ভোজ রাজার মূল প্রাসাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। বিহার এবং দুর্গের পরিকল্পনা মোটামুটি কাছাকাছির। ভোজবিহার আনন্দ বিহারের মতোই একটি বিরাট স্থাপনা। এর অংগনে আরও কয়েকটি ইমারতের চিহ্ন রয়েছে। ভিত্তি দেয়াল ছাড়াও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে অসংখ্য প্রাচীন ভাঙা ইট। বিহারের পূর্ব দেয়ালের কাছে পাওয়া গেছে স্তূপ করে রাখা অসংখ্য মৃৎ পাত্রের ধ্বংসাবশেষ।

এই প্রত্নকেন্দ্রে ১৯৯৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে খননকার্য পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছর ও ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে বিহারের কেন্দ্রস্থল ও উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করে কেন্দ্রস্থলে ক্রুশাকার ও চতুর্মুখী একটি মন্দির ও উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে প্রধান প্রবেশ পথের অংশবিশেষ ও কয়েকটি ভিক্ষু কক্ষের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থসালে বিহারের বাহুতে খনন কাজ পরিচালনা করে দুপ্রান্তে দুটি সিঁড়িকক্ষসহ ৩১টি ভিক্ষুকক্ষ পাওয়া যায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থসালে বিহারের পূর্ব বাহুতে খননের কাজ পরিচালনা করে ভিক্ষু কক্ষসমূহের স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বিহারের উত্তর বাহুতে খনন কাজ পরিচালনা করে প্রধান প্রবেশ পথসহ

পূর্ব পাশ্বের ভিক্ষু কক্ষসমূহের দেয়াল অনাবৃত করা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে বিহারের উত্তরণ বাহুর পশ্চিমাংশ অর্থাৎ প্রধান প্রবেশ পথের পশ্চিমাংশ খনন করে ভিক্ষু কক্ষসমূহের পশ্চাদ দেয়াল ও অন্যান্য স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত করা হয়। ২০০১-০২ অর্থবছরে বিহারের পশ্চিম বাহু খনন করে ভিক্ষু কক্ষসমূহের দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বিহারের দক্ষিণ বাহুর সামনের বারান্দা ও Retaining Wall-এর ওপর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালিত হয়। এর ফলে দক্ষিণ বাহুর বারান্দার Retaining Wall-এর ১৫০.৮৮ মিটার (পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা) অংশ উন্মোচিত হয়। এ দেয়ালটি ১.৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে।

এ দেয়ালে দুটি নির্মাণ যুগের নিদর্শন রয়েছে। প্রথম নির্মাণ যুগে দেয়ালটি ১.৫০ মিটার চওড়া ছিল। দ্বিতীয় নির্মাণযুগে এর প্রশস্ততা আরও কমে আসে এবং পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৩৭ মিটার। এই খননে ১৪ মি.× ৫.৫ মি. পরিমাপের ধাপযুক্ত একটি কাঠামো উন্মোচিত হয়। Retaining Wall-এর উত্তর মুখে ৯.৪৫ মিটার পর পর ৩টি সরু দেয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে করা হয় Retaining Wall-কে সুদৃঢ় রাখার জন্য এ দেয়ালগুলো ঠেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী আরও দু অর্থবছরের খনন কাজের ফলে আরও কিছু নিদর্শন বেরিয়ে এসেছে। দক্ষিণ বাহুর কয়েকটি কক্ষে গভীর খনন পরিচালনার ফলে ৫টি সাংস্কৃতিক স্তর, ৪টি মেঝের নিদর্শন, ৪টি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ আমলের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়েছে। আবিষ্কৃত কক্ষগুলোর পরিমাপ ৩.৩৫ মি.×৩.০৫ মি.।

দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে মূল পরিকল্পনার কোনো পরিবর্তন দেখা য়ায় না। দরজাকে ইট দ্বারা উঁচু করা হয়েছে। কোনও কোনও কক্ষের বিভাজক দেয়াল পুনর্নির্ধারণ করার ফলে কক্ষের পরিমাপ ছোট-বড় হয়েছে।

তৃতীয় নির্মাণ যুগে দরজা উঁচু করা ছাড়াও কয়েকটি কক্ষের পশ্চাদ দেয়ালে এন্টি চেম্বার ও বিভাজক দেয়ালে কুলঙ্গি স্থাপনের আলামত দেখা গেছে। দক্ষিণ বাহুর মাঝামাঝি স্থানে অর্ধ গোলাকার একটি ইটের বেদী আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি সম্ভবত মূর্তি বেদী।

চতুর্থ নির্মাণ যুগে ২টি কক্ষে তৃতীয় নির্মাণ যুগের দরজা উঁচু করার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মন্দিরের উত্তর পশ্চিম পাশে বিহারের আঙ্গিনা আংশিক খননের ফলে ৫.৮১×৫.৮১ মি. এর একটি আট কোণাকার বেদী কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। এ বেদীর চারদিকে ০.৬৬ মি. প্রশস্ত একটি প্রদক্ষিণ পথ ও প্রান্ত সীমায় ০.৬৬ মিটার অনুর্ধ একটি প্রাচীর দেখা গেছে। ভোজপুর বিহারের উত্তর বাহুর মাঝামাঝি স্থানেও অন্যান্য বিহারের মতো পুরনো স্থাপনা রয়েছে। মূল পশ্চাত দেয়াল থেকে এটি বাইরের দিকে উদগত। এর সামনে ২৩.১৬ মিটার × ১১.৫৮

মিটার এলাকা প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত চত্বর উন্মোচিত হয়েছে। ওপর দেয়ালের ভেতর মুখে মূল প্রবেশ পথ ১.৮৩ মিটার চওড়া। প্রবেশ পথের সামনে ৬.৪০×৫.৩৪ মিটার পরিমাপের একটি হলরুম পাওয়া গেছে। এ প্রবেশ পথের বরাবরে কেন্দ্রীয় মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে পশ্চিম বাহুর কক্ষসমূহ উন্মোচনের জন্য খননকাজ পরিচালনা করা হয়। এই খননে পূর্বের ৩টি কক্ষসহ ৫টি কক্ষের পরিপূর্ণ সীমানা অনাবৃত হয়েছে।

ভোজ রাজার দীঘি

বিহারের প্রায় ১২০ মিটার পূর্ব দিকে ভোজ রাজার দীঘি নামে একটি প্রাচীন জলাশয় রয়েছে। ওই দীঘিটিও বর্গাকারে নির্মিত। এই দীঘির প্রত্যেক পাড় প্রায় ৮০ মিটার দীর্ঘ। পাড়গুলোর উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার। দীঘিটি বেশ গভীর।

প্রত্নসম্পদ

১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থ বছরে ভোজবিহারের কেন্দ্রীয় ঢিবিতে খননের সময় ব্রোঞ্জের তৈরি বৃহদাকারের একটি এবং স্থানীয় নরম পাথরের দুটি বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। একটি রৌপ্য মুদ্রা ছাড়াও অনেকগুলো পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে।

ব্রোঞ্জের তৈরি বৌদ্ধ মূর্তি (বজ্রস্বত্ব)

ব্রোঞ্জের তৈরি এ মূর্তিতে গৌতম বুদ্ধ বজ্রস্বত্ব যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁর বাম হাতে ঘন্টা, ডান হাতে দ্বিমুখো বজ্রধৃত অবস্থায় রয়েছে। পরিধানে রয়েছে ধূতি ও পৈতা। মাথায় মুকুট। বজ্রস্বত্ব বৌদ্ধ মহাযান মতবাদের পঞ্চ তথাগত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটির পরিমাপ ১.৪০ মিটার × ১.২০ মিটার। অষ্টম-নবম শতকের নালন্দা বিহারকে কেন্দ্র করে যে বজ্রযান দর্শন তার পঞ্চ তথাগত নিদর্শন রয়েছে মূর্তি মুকুটে। এ মূর্তিটি আনুমানিক নবম কিংবা দশম শতকের। এটি বাংলাদেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় ব্রোঞ্জ মূর্তি এবং তা অক্ষত ভাবে পাওয়া গেছে।

ধ্যানী বুদ্ধ (অক্ষভ্য ও অমিতাভ)

ভোজ বিহারে স্থানীয় ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের পাথরে বুদ্ধের আরও ২টি মূর্তি পাওয়া যায়। একটি অক্ষভ্য, দ্বৈত পদ্মাসনে উপবিষ্ট। ডান হাত ভূমি স্পর্শ মুদ্রার ও বাম হাত কোলে স্থাপিত। মাথার ওপর মুকুট রয়েছে। স্লেভের ওপরের অংশে ডান ও বাম পাশে দুটি স্তূপের প্রতীক। মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয়। পদ্মাসনের নিচে একজন উপাসক নতজানু অবস্থায় আছে।

অমিতাভ মূর্তিটি ক্রস পা ভঙ্গিতে দ্বৈত পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন। উভয় হস্ত কোলে

সংস্থাপিত। মাথায় মুকুট ও জ্যোতির্বলয় আছে। এখানেও স্লেভের উভয় পাশে ২টি স্তূপের প্রতীক। পদ্মাসনের নিচে একজন উপাসক নতজানু।

রৌপ্য মুদ্রা

বিহারের দক্ষিণ বাহুর কক্ষ এলাকা খননের সময় একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাটির একপিঠে ত্রিশূল অন্যপিঠে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি। শালবন বিহার ও রূপবান মুড়ায় পাওয়া রৌপ্য মুদ্রার অনুরূপ। পট্টিকেরা টাইপের এ মুদ্রার সময়কাল সপ্তম-অষ্টম শতক বলে ধারণা করা হয়।

পোড়ামাটির ফলক

পোড়ামাটির ফলকগুলো সপ্তম-অষ্টম শতকের প্রাচীন বাংলার লোকায়ত শিল্প। এর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের মৃৎ পাত্রের কিছু খোলামকুচি পাওয়া গেছে।

খনন কাজের ফলে ৩টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন ছাড়াও ৪টি মেঝে ও ৬টি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম স্তর : ধূসর রঙের আলগা মাটির সঙ্গে ইট ও ইটের টুকরো মিশ্রিত আছে।

দ্বিতীয় স্তর : লালচে আলগা মাটির সঙ্গে ইটের টুকরা ও কংক্রিট মিশ্রিত মাটির একটি ভরাট অবস্থা।

তৃতীয় স্তর : আলগা বাদামী রঙের মাটির সঙ্গে কদাচিৎ ইটের কণা ও কয়লার সংমিশ্রণ রয়েছে।

চতুর্থ স্তর : মিশ্রিত মাটির মধ্যে ইটের কণা, কংক্রিট ও মৃৎ পাত্রের টুকরো দেখা গেছে।

পঞ্চম স্তর : নরম বালি মাটির একটি ভরাট।

ষষ্ঠ স্তর : লালচে রঙের শক্ত মাটি পাওয়া গেছে।

মেঝেগুলো রয়েছে বিভিন্ন স্তরে। মন্দিরটির নির্মাণ কাল মনে করা হয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক।

প্রত্নকেন্দ্রটি ভোজ রাজার বাড়ি নামে পরিচিত। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি একটি বিহার, রাজবাড়ি নয়। এটি প্রত্নবস্তু ও স্থাপত্যিক কাঠামোর দিক থেকে শালবন ও আনন্দ বিহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছু খনন বাকি আছে। পূর্ণাঙ্গ খননের পরে আসল চিত্র বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা হয়।

রূপবান মুড়া

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে বার্ড (বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন একাডেমী)-এর সংলগ্ন দক্ষিণে কুমিল্লার কালীর বাজার রাস্তার পাশে রূপবান মুড়ার অবস্থান। সড়ক থেকে প্রায় ১৫ মিটার উঁচু এবং আয়তনে প্রায় ১৬০ মিটার লম্বা এবং প্রায় ১৩০ মিটার চওড়া এ টিলায় ১৯৮৪, ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সালে খননের ফলে একটি মন্দির, একটি বিহার ও দুটি নিবেদন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অনাবৃত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে টিলাটি স্থানীয় দুস্কৃতিকারী ও ঠিকাদারদের ধংসাত্মক কাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠিকাদার ও ইট খননকারীদের দ্বারা পরবর্তীকালে ঢিবি বা টিলার পূর্ব-পশ্চিম প্রান্তে বার্ডের কতিপয় ইমারত নির্মাণ, তাছাড়া ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ কালে পাকিস্তান বাহিনীর কিছু সংখ্যক প্রতিরক্ষা ট্রেন্স খনন ও উত্তর-পূর্ব অংশে জমি স্বত্বাধিকারীদের মাটি কেটে স্থানে স্থানে গভীর গর্ত সৃষ্টির ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা টিএন রাজচন্দ্র স্থানটি পরিদর্শনকালে এখানে পাহাড়পুর ও নন্দনগড় স্তূপাকৃতি কেন্দ্র মন্দিরের মতো একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। প্রোজেকশনযুক্ত মন্দিরটির বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক ও নকসা কাঁটা ইট দিয়ে সুরম্যভাবে অলংকৃত ছিল বলে তিনি তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খনন কাজের ফলে এখানে মোটামুটিভাবে ৩টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলোর মূল নির্মাণ সামগ্রী ইট ও কাদা। ঢিবির প্রায় মাঝামাঝি অংশে একটি পূর্বমুখী প্রাচীর ঘেরা চত্বরের পশ্চিম অংশ জুড়ে মন্দিরটির অবস্থান। প্রথম নির্মাণ যুগে মন্দিরটি ২৮.১৯ মিটার বর্গাকার জায়গায় ক্রুশ আকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত হয়েছিল। একটি ছাড়া (পূর্ব দিকে) ক্রুশের প্রতিটি বাহু দুটি অংশে বিভক্ত। পেছনের অংশটি মূর্তিকোটা ও সামনেরটি মণ্ডপ। প্রতিটি মূর্তি কোটায় বেদী রয়েছে একটি করে। পূর্ব দিকের মূর্তি কোটাটি ৩টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটি প্রকোষ্ঠে বেলে পাথরের তৈরি একটি দাঁড়ানো লোকোত্তর বৌদ্ধ মূর্তি ছিল। সেনা সদস্যদের জন্য মটর-গ্যারেজ নির্মাণকালে ১৯৭৮ সালে আকস্মিকভাবে একটি ধাতব ঘন্টা পাওয়া যায়। প্রায় ৫০০ কেজি ওজনের এই ঘন্টার ব্যাস ০.৮৪ মিটার। ওপরের বেড়িসহ উচ্চতা ০.৭৪ মিটার। এটি বৌদ্ধস্তূপের ঐতিহ্যিক আদলে তৈরি। এর কাঁধের ওপরে একটি অলংকৃত বন্ধনী ও তার ওপরের অংশটি ক্রমাগত সরু হয়ে সংকীর্ণ গ্রীবাদেশে লেগেছে। গ্রীবার নিচের অংশ পদ্মপাপড়ির আকারে খাঁজকাটা। সরু গলার ওপর একটি ০.৪৬ মিটার ব্যাসের বন্ধনী। এর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে ঘন্টাটিকে ঝোলানোর একটি মোটা বেড়ি। বেড়ির উভয় পাশে দুটি অলংকৃত সিংহের মাথা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি

একাদশ-দ্বাদশ শতকে অতি উচ্চমানের ধাতু দিয়ে তৈরি। ময়নামতি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এটি সংগ্রহ করে জাদুঘর ভবনের দক্ষিণের বর্ধিত অংশের মেঝের মাঝখানে নতুন নির্মিত একটি পাকা পাদপট্টের ওপর স্থাপনপূর্বক প্রদর্শন করে আসছে। পাশের অন্য দুটি প্রকোষ্ঠে বেদীর ওপর ব্রোঞ্জের ভাঙা টুকরা পাওয়া যায়। মন্দিরের চারদিকে একটি প্রায় ১.৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তার চিহ্ন রয়েছে। এটি মূলত প্রদক্ষিণ পথ। এটিকে ঘিরে প্রায় ৫ মিটার দূরে একটি কম উঁচু বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া যায়। তবে প্রতিমা কক্ষটি একই দিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী নির্মাণ যুগে মন্দিরের মেঝে কিছুটা উঁচু করা হয় ও মন্দিরের পরিসরও বদলে দেয়া হয়।

প্রথম নির্মাণ যুগে প্রতিবাহু ২০ মিটার দীর্ঘ বর্গাকার বা ক্রুশ আকৃতিতে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের মন্দিরটিও ছিল ক্রুশ আকৃতির। তবে তা বাড়ানো হয়েছে। এর প্রতিবাহু প্রায় ২৮.২ মিটার দীর্ঘ। এর চতুর্দিকে দেয়ালে প্রতিমা কক্ষের অবস্থান দেখা যায়। তবে পূর্ব দিকে এক সারিতে ৩টি মূর্তি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের সামনে একটি করে লম্বা অপরিসর মণ্ডপ এবং সম্পূর্ণ মন্দিরটিকে বেষ্টন করে একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রদক্ষিণ পথ। পুনর্নির্মাণ যুগের মন্দিরটি পূর্বের মন্দিরের চেয়ে বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট করা হয়েছে মূলত চতুর্বাহুগুলো পৃথকভাবে বর্ধিত করে। ইমারতের ভিত্তিমূল থেকে এটি চারদিকে সম্প্রসারিত। নতুন অবকাঠামোর ওপর প্রতিমাকক্ষ ও মণ্ডপসহ মন্দিরটি নির্মিত। দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বাহুগুলো সম্প্রসারিত হওয়ায় পূর্ব দিক ছাড়া প্রদক্ষিণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরে বহির্দেয়ালের ও ক্রসের প্রসারিত বাহুর কিছু অংশ সংকুচিত করে প্রদক্ষিণ পথের ব্যবস্থা করা হয়। সে সঙ্গে মণ্ডপের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমের দেয়ালগুলোকে ছোট করে মণ্ডপের উভয় পাশে দুটি দেয়াল সংযোজন করা হয়।

প্রতিমাকক্ষগুলোতে একটি করে ইটের বেদী আছে। তবে পূর্ব দিকের ৩টি কক্ষের মধ্যে মাঝখানকার বেদীটি পাথরের। এর ওপর একটি বিরাটাকার পূর্ণায়বয়ব পাথরের বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তি প্রকোষ্ঠগুলোর ছাদ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো ইট দিয়ে অর্থাৎ কর্বেল পদ্ধতিতে তৈরি। মন্দিরের পূর্ব দিকে পরবর্তীকালে ৪ মিটার প্রশস্ত প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়। এটি সম্ভবত প্রধান প্রবেশ পথ। এ পথটি ছাড়াও অন্য তিন দিকে মূর্তি প্রকোষ্ঠগুলোর সামনে ছোট আকারের ৩টি প্রবেশপথ রয়েছে। মন্দির গাত্রের বাইরের দেয়ালের বিভিন্ন অংশে আলো-বাতাসের প্রয়োজনে মোট ৮টি গবাক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে।

তৃতীয় নির্মাণ যুগের মন্দিরটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের ধ্বংসস্তূপের ওপর দণ্ডায়মান এ মন্দিরটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দেয়ালের

অসংলগ্ন ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। ফলে ইমারতটির নির্মাণ শৈলী সম্বন্ধে কোনও কিছু ধারণা করা যায় না। উত্তর ও পশ্চিমের মূর্তিকক্ষগুলোর কিছু ভাঙা দেয়ালের বিচ্ছিন্ন অংশ উন্মোচিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের মন্দিরটির পূর্ণাঙ্গ কাঠামো উন্মুক্ত করার কাজে খননকালে সেগুলো ফেলে দেয়া হয়।

বিহার

মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩০ মিটার দূরে বর্গাকৃতির বিহারটি অবস্থিত। মনে করা হয় এ বিহার বা মঠে ভিক্ষুরা বসবাস করতো। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এখানেও ৩টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পেয়েছেন। প্রথম নির্মাণ যুগে এটি পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫.১০ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ২৫.২২ মিটার আয়তাকারভাবে নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তীকালে দক্ষিণ দিকে আরও ১২ মিটার বাড়িয়ে এটিকে প্রায় বর্গাকার রূপ দেয়া হয়। ৩৫.৩৩×৩৫.৬৩ মিটারে মাটির অন্য বাহুতে একটি এবং দক্ষিণ বাহুতে আরও ৯টি অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ করা হয়। বর্ধিত অংশ ও মূল বিহারটির মধ্যে আরও একটি উন্মুক্ত অঙ্গন রয়েছে। তার পরিমাণ ২২.৬ মিটার × ৩.৮ মিটার। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন বাংলাদেশের বিহার স্থাপত্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা। বিহারের ৪টি বাহুতে ভিক্ষু কক্ষ পাওয়া গেছে ২৫টি। এর মধ্যে ৯টি বর্ধিতাংশে এবং মূল বিহারে ১৬টি। কক্ষগুলোর পরিমাপ ৩ মিটার × ৩ মিটার। ১.৪ মিটার প্রশস্ত দরজা রয়েছে প্রত্যেকটি কক্ষে। অন্যান্য বিহারের মতোই কক্ষগুলোর সামনে টানা বারান্দা রয়েছে। বারান্দাগুলো পূর্ব ও পশ্চিম বাহুতে ২.৫ মিটার চওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে যথাক্রমে ২.৩ মিটার ও ২.৬ মিটার প্রশস্ত। মূল বিহারটির অঙ্গন পূর্ব-পশ্চিমে ১৫.৬ মিটার ও ২.৬ মিটার প্রশস্ত। মূল বিহারটির অঙ্গন পূর্ব-পশ্চিমে ১৫.৬ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ৫.৬ মিটার।

প্রধান প্রবেশপথ

বিহারের উত্তর বাহু সংলগ্ন প্রহরীকক্ষসহ একটি বড় প্রবেশপথ রয়েছে। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অনুরূপ এ প্রবেশ পথটি খননের ফলে এখানেও ৩টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রথম নির্মাণ যুগে এটি উত্তর-দক্ষিণে ৭ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৩ মিটার বিস্তৃত ছিল। আর প্রশস্ত ছিল ৪.৫৭ মিটার। দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে সংস্কার করে ৭.৬১ মিটার × ১২.৪ মিটার করা হয়। তবে তৃতীয় নির্মাণ যুগে ১২ মিটার বাহু বিশিষ্ট বর্গাকারে পুনর্নির্মাণ করা হয়। এর পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালগুলোর কার্ণিশ ফোল্ডিং দিয়ে কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা হয়। বিহারের উত্তর বাহুর ওপর প্রবেশ পথের সংযোগস্থলে একটি সিঁড়ি রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন পরবর্তীকালে এটি শালবন ও সীতাকোট বিহারের মতো দ্বিতীয় তলে ওঠার জন্য নির্মিত হয়েছে। এরা আরও মনে করেন দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে তোরণদ্বারের সম্মুখভাগ অর্থাৎ উত্তর দিকে প্রায় ১২ মিটার বর্গাকার একটি এলাকা

বেষ্টনী প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছিল। তৃতীয় নির্মাণ যুগে এটি বাদ দেয়া হয় এবং তার ওপর একটি কংক্রিটের দেয়াল নির্মিত হয়। তৃতীয় নির্মাণ যুগে বিহারের শত শত প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়।

অষ্টভুজ স্তূপ

বিহারে মূল মন্দির থেকে ১২.৮০ মিটার পূর্ব দিকে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্তূপটি ৮ কোণাকৃতির। প্রতিটি বাহু ৫.১২ মিটার বিশিষ্ট। বর্গাকার ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপিত অষ্টভুজ স্তূপের প্রত্যেকটি বাহু ২.১৩ মিটার প্রশস্ত ও এর সামগ্রিক পরিধি ১৭.৭ মিটার। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভিত্তিমূল থেকে এর উচ্চতা ১.৭ মিটার। কম উঁচু একটি বেষ্টনী প্রাচীর এ স্তূপটিকে ঘিরে আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি দ্বিতীয় নির্মাণ যুগের।

প্রত্নবস্তু

রূপবান মুড়ার খনন কাজের আগে বার্ডের ইমারত নির্মাণ, পাকিস্তান বাহিনীর ট্রেন্স খনন, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির মাটি কেটে নেয়া প্রভৃতি কারণে বিপুল পরিমাণ প্রত্নসম্পদ হারিয়ে কিংবা লুট হয়ে গেছে। জানা যায় প্রত্ন সংগ্রহকারীরা এখান থেকে ব্রোঞ্জের তৈরি ছোট ছোট বহু বৌদ্ধ মূর্তির ৭টি পূর্ণ পাত্র পেয়েছিল। এর মধ্যে ১৩টি মূর্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বাকিগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়নি। খনন কাজের পরে রূপবান মুড়ায় বৃহদাকার একটি পাথরের দাঁড়ানো বৌদ্ধ মূর্তি ছাড়াও গুপ্ত মুদ্রার অনুকৃত পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা, পট্টিকেরা লিপি সম্বলিত তিনটি রৌপ্য মুদ্রা, দুটি ছোট ছোট ব্রোঞ্জের মূর্তি, চামচ, বহু ব্রোঞ্জের টুকরা, পোড়ামাটির চিত্র ফলক, খাঁজ কাটা পিরামিড বা পদ্মের পাপড়ির মতো বহু ধরনের জ্যামিতিক ও ফুলপাতা সুসজ্জিত অলংকৃত ইট, মন্ময়-প্রদীপ, মাটির সিঞ্চন পাত্রের মাথা, লোহার শলাকা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের বহুবিধ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হযেছে।

পাথরের বৌদ্ধমূর্তি

১৯৮৪ সালে খননের ফলে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। বিশাল আকার দণ্ডায়মান বৌদ্ধমূর্তিটি বেলে পাথরের তৈরি। অতি চমৎকার এবং শিল্প নৈপুণ্যের বিচারে পূর্ব ভারতীয় শিল্পকলার একটি অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মূর্তিটি ২.৪৪ মিটার উঁচু ও ৯০ সে.মি. প্রশস্ত। দেখতে গোলাকার একটি প্রস্তর বেদীর ওপর স্থাপিত। প্রস্তর বেদীটি ৪০×৩০×৭০ সি.মি. আয়তন বিশিষ্ট। এ মূর্তির স্বচ্ছ অংগবাসের অংশবিশেষ বাম হাতে ধরা এবং ডান হাত বরদ মুদ্রায়। ডান হাতের তালুতে ধর্মচক্র আঁকা। মাথার চুল ছোট ছোট পুঞ্জিত গুচ্ছের উননিশের আকারে চূড়া করে বাঁধা। দু ভ্রুর মাঝখানে চোখের দৃষ্টি উন্নার অবস্থান দৃষ্ট হয়। মূর্তিটির সুঠাম দেহসৌষ্ঠব, পরিষ্কার বহির্বাস এবং মুখমণ্ডলের মধুর অভিব্যক্তি সারনাথের

গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পধারার অব্যবহিত পরবর্তীকালের (আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর) বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। গুপ্তদের ক্লাসিক্যাল শিল্পপ্রভাব দেখে মনে হয় এখানকার শিল্পীরা গুপ্তযুগের শিল্পের সংগে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া এ থেকে এটাও পরিষ্কার হয় যে, কুমিল্লা অঞ্চলে এককালে গুপ্তদের শাসন ছিল।

মুদ্রা

পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে একটি ভাংগা এবং অপর চারটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অক্ষত পূর্ণাংগ মুদ্রাগুলো লক্ষ্মী ও তীরন্দাজ শ্রেণীর। একপৃষ্ঠে শ্রী বলভট্ট ও অপরদিকে আট বাহু বিশিষ্ট লক্ষ্মী মূর্তি রয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস অংশে আমরা বলেছি শ্রী বলভট্ট খড়গবংশের একজন রাজা। তাঁর সময় সপ্তম শতাব্দী। প্রতিকৃতিতে তাকে ত্রিভংগ ভঙ্গিমায় বাম হাতে ধনুক আর ডান হাতে তীর ধরা অবস্থায় দেখা গেছে। তার মাথার পুঞ্জিত ও কেশ কাঁধের ওপর প্রলম্বিত। এর ওপর শকদের পুঞ্জিত অনুকরণে শঙ্কুবত টুপি রয়েছে। মুদ্রাগুলো শালবন বিহারের অনুরূপ।

রৌপ্য মুদ্রাগুলোর মধ্যে ২টি স্বাভাবিক অবস্থায় এবং একটি ছোট আকারের ও তিন ভাংগা অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলোর একপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ষাড়ের ওপরিভাগে পত্র্যয়িকের লিপি ও অপরপৃষ্ঠে ত্রিরত্ন ও চন্দ্র সূর্যের প্রতিকৃতি রয়েছে। এগুলো পট্টিকেরা শ্রেণীর মুদ্রা।

ব্রোঞ্জের নানা নিদর্শন

ব্রোঞ্জের ৩২টি খণ্ড খণ্ড টুকরা পাওয়া গেছে। একটি হাতাযুক্ত ব্রোঞ্জের বড় চামচ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া ব্রোঞ্জের ২টি মূর্তিও পাওয়া গেছে। মূর্তি ২টির মধ্যে ১টি ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভের। ৮ সে.মি. উঁচু। পদ্মাসনে উপবিষ্ট। এর পাদদেশে একটি সিল রয়েছে। এতে বৌদ্ধ ধর্মের মন্ত্র উৎকীর্ণ। অপর মূর্তিটি ললিতাশনে উপবিষ্ট। এর পরিমাপ ১৪ × ৮ সে.মি.। মূর্তিটি অষ্টভুজা শীতাতপত্র দেবীর। মূর্তিটির শীর্ষে ছত্র। মূর্তির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সাধারণ মন্ত্র উৎকীর্ণ।

পোড়ামাটির ফলক

রূপবান মুড়ায় খনন কাজের ফলে চৌত্রিশটি পোড়ামাটির ফলক উদ্ধার করা হয়। এগুলোর আয়তন ১০×১১×৯০ সে.মি. থেকে ৩৫×২৮×১৪ সে.মি. পর্যন্ত। দু'য়েকটি বহিরাঙ্গন থেকে পাওয়া গেলেও বাকী সবগুলোই মন্দির চত্বর থেকে বিভিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। চিত্র ফলকগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলো শিল্পীর কালের গ্রাম্য জীবনের পারিপার্শিক অভিজ্ঞতায় চিত্রায়িত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গির নারী-পুরুষ, জীব-জন্তু, পাখি, মাছ, দেব-দেবী, বানর, গন্ধবা, ফুল,

লতা-পাতা প্রভৃতি। চিত্রগুলো অত্যন্ত জীবন্ত। এগুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে মানুষসহ অন্য প্রাণীর সাধারণ চিত্র। অন্যদিকে আছে দেব-দেবীর চিত্র। শিল্পীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই ফলকগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। সাধারণ শ্রেণীর চিত্রগুলোর প্রথমটি জাগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন অলংকার পরিহিতা একটি অর্ধ মানবী ও অর্ধমৎস্যাকৃতি কৃতি জলপীর, তিনটি মুক্তামালা মুখে ময়ূর এবং রাজহংস, দুটি শূকর এবং একটি অজ্ঞাত প্রাণী দ্বারা একটি লোক মাথার ওপর উত্তোলিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে অলংকৃত শিবলিঙ্গ মঞ্জুশ্রী মূর্তি, কয়েকটি উড্ডীয়মান গন্ধবমূর্তি, যা মুকুট পরিহিত একজন ধ্যানমগ্ন ঋষি প্রভৃতি। এ শ্রেণীতে ধর্ম চক্রের ফলকটিকেও ফেলা যায়। প্রথম শ্রেণীর চিত্রফলকগুলোর মধ্যে দুটি মুখ ব্যাদানকারী সিংহ এবং একটি উটের চিত্র রয়েছে। বর্তমানে দুটি প্রাণী কুমিল্লায়তো নয়ই বাংলাদেশের কোনও বন জঙ্গলেও নেই। সিংহ সম্ভবত ঐ সময় এই অঞ্চলে ছিল। কিন্তু উট এল কোথা থেকে? সম্ভবত আরবীয় নাবিক বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শিল্পীরা ধারণা পেয়েছিলেন। কারণ রৌপ্য মুদ্রার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এখানকার তৎকালীন রাজাদের সংগে বার্মা এবং আরব দেশের রাজা ও বণিকদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া এখানে উট থাকার সম্ভাবনাকে কি একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যায়?

রূপবানকন্যার বিহার বা বাড়ি

ভোজবিহার থেকে ১৫২ মিটার উত্তরে রূপবান কন্যার বিহার। এটিকে স্থানীয়ভাবে রূপবান কন্যার বাড়িও বলা হয়। লালমাই পাহাড়ের পূর্বকোল ঘেঁসে প্রায় সমতল ভূমির ওপর এ প্রাচীন কীর্তির ধবংসাবশেষ পড়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে ইট ও সিমেন্টের সাহায্যে নতুন ইমারত নির্মাণের ফলে প্রাচীন কীর্তির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তবে এগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় প্রাচীন কীর্তির রূপরেখা বের হয়ে আছে। পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ এ প্রাচীন কীর্তির আয়তন ছিল প্রায় ১০০×২৫০ মিটার। বেষ্টক প্রাচীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও তার চিহ্ন টিকে আছে। এটি ছিল একটি ছোট বৌদ্ধ বিহার। ভূমি পিঠের বিন্যাস দেখে অতীতে সহজেই অনুমান করা যেত এ স্থানে ভোজ রাজার বাড়ি বা বিহারের মতো একটি বিহার অন্তরীণ হয়ে আছে।

প্রত্নবস্তু

ভূমির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল প্রচুর পাটকেল, খোলামকুচি, পোড়ামাটির ফলকের ভাঙা টুকরো, অলংকৃত ইটের টুকরো ও বিকৃত দেয়াল পাওয়া গেছে একটি শিলালিপি, একটি ধাতু ফলকলিপি ও বিরাটাকারের একটি ধাতবঘন্টা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি একাদশ-দ্বাদশ শতকে অতি উচ্চ মানের ধাতু দিয়ে

তৈরি। ময়নামতি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এটি সংগ্রহ করে জাদুঘর ভবনের দক্ষিণের বর্ধিত অংশের মেঝের মাঝখানে নতুন নির্মিত একটি পাকা পাদপট্টের ওপর স্থাপনপূর্বক প্রদর্শন করে আসছে। তাম্রলিপিটির পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

সম্প্রতি এ বাড়িটির ওপরে নির্মিত হয়েছে সেনাবাহিনীর প্যারেড গ্রাউন্ড, এম.টি. গ্যারেজ ও কোয়ার্টার গার্ড সেন্টার। এর ফলে অন্তরীণ স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রূপবানী মুড়া

শ্রীভবদেব মহাবিহার (শালবন বিহার) থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আমড়াতলী গ্রামে টিলার পশ্চিম প্রান্তসীমায় আনুমানিক ৩৮ মিটার উঁচু একটি ঢিবি রয়েছে। এই ঢিবিকে বলা হয় রূপবানী মুড়া। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর প্রকাশিত গ্রন্থ 'ময়নামতি-লালমাই' থেকে জানা যায় টিলাটির ওপর ৯৬ মিটার × ৬৬ মিটার আয়তনের একটি বিধ্বস্ত স্থাপনা অন্তরীণ রয়েছে। ভূমির ওপরে একটি বিলুপ্ত স্থাপনার বিধ্বস্ত দেয়ালের কিছু অংশ এখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। কাদার মসলায় গাঁথা ইটের তৈরি দেয়ালটিতে কোনও পলেস্তারা নেই। তাই এটিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাক্‌মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন বলে মনে করেন। এখানে কোনও খননকার্য হয়নি, তাই কোনও নিদর্শনও পাওয়া যায়নি। তবে খনন করলে অনেক প্রত্নরহস্য বেরিয়ে আসতে পারে।

ইটাখোলা মুড়া

এটি একটি প্রাচীন টিলা। কুমিল্লার কালিরবাজার রাস্তার উত্তর পাশে অবস্থিত। রূপবান মুড়া থেকে ২০০ মিটার উত্তরে ও শালবন বিহার থেকে ২ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কোটবাড়ি এলাকায় অবস্থিত। ১৯৮৫ সালে শীত মৌসুমে এখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নিয়মিত খনন কাজ শুরু করে। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে খননের ফলে পাশাপাশি দুটি প্রত্ন স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। একটি স্থাপনা প্রায় ৪০.৬ মিটার বর্গাকৃতির। এটি একটি ছোট বিহার বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। অন্য স্থাপনাটি একটি মন্দির। এটি বিহারের প্রায় ৫০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১৪ মিটার × ১৩.৫ মিটার। ২০.৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত স্থাপনা দুটির চারদিকে প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০ মিটার। প্রাচীরের ভিত্তিভাগ এখনও টিকে আছে।

২০ কক্ষ বিশিষ্ট নাতিদীর্ঘ এ বিহারের পশ্চাত দেয়াল প্রায় ২.৯ মিটার এবং সম্মুখের দেয়াল ২ মিটার পুরু। বারান্দার দেয়াল প্রায় ১ মিটার চওড়া। কক্ষগুলোর আয়তন ছিল বিভিন্ন পরিমাপের। যেমন : ৩.৫ মি.×৩.৫ মি., ৩.৫ মি.×৪.৩ মি.,

৩.৫ মি.×৪ মিটার; সবগুলো কক্ষের প্রবেশদ্বার ১.২ মিটার প্রশস্ত। কয়েকটি কক্ষে বেদী রয়েছে। কেন্দ্রীয় ঢিবিটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পূর্ব দিকের বেষ্টনী প্রাচীরের ঠিক মাঝখানে ছিল প্রবেশদ্বার। সেখান থেকে ইমারত পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা। এ স্থাপনায় বিশেষ একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। উত্তর দিকের বেষ্টনী দেয়াল থেকে ইটের নির্মিত ৬টি দেয়াল দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। ৪টি দেয়াল (৬টির মধ্যে) কেন্দ্রীয় ইমরাতের উত্তর দেয়ালে এসে শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। একটি দেয়াল কেন্দ্রীয় ইমারতের পূর্বদিকের রাস্তার উত্তর সীমা পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। আর পূর্বের দেয়ালটি রাস্তার পরেও দক্ষিণ দিকে কিছু দূর সরে গেছে। স্থাপত্য পরিকল্পনার এরূপ রহস্য এখনও অনাবিষ্কৃত।

মন্দির : বিহার থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে অবস্থিত মন্দিরের পূর্ব বাহুর কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত প্রায় ২.৫ মিটার × ১.৮ মিটার বিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। ইট, চুন ও শুরকি দিয়ে তৈরি একটি বিরাট উপবিষ্ট বৌদ্ধমূর্তির নিম্নাঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্ধারকৃত অংশটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে প্রকোষ্ঠটিকে বন্ধ করে দিয়ে এর সম্মুখভাগে অপর একটি বেদী নির্মাণ করা হয়। মন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বহির্মাথার ৫টি প্রকোষ্ঠে দুটি করে মোট ১০টি ক্ষুদ্রাকার বেদী পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটি কক্ষেই একটি করে ইটের বেদী। মন্দিরের পশ্চিম দিকে প্রদক্ষিণ পথ থেকে ৬.৮ মিটার দূরে ৭.৯ মিটার পরিমাপের একটি ক্রুশ আকৃতির স্তূপ রয়েছে। এর পূর্ব দিকে ৩ মিটার × ১.৭ মিটার আয়তনের বেদীও পাওয়া গেছে। একটি ইট বিছানো পথ একে প্রদক্ষিণ পথের সাথে সংযুক্ত করেছে।

মন্দিরটিতে ৫টি বসতি আমল ও বিহারটিতে ২টি বসতি আমল বা নির্মাণ যুগের অস্তিত্ব রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এর আয়তন ছিল প্রায় ৮০×৫০ মিটার। এ ইমারতটি সঙ্গত কারণেই কেন্দ্রীয় ইমারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলে মনে হয়।

প্রত্নবস্তু : আবিষ্কৃত পুরাবস্তুগুলোর মধ্যে চুন, বালি প্রভৃতি উপকরণে নির্মাণ করা বড় আকারের উপবিষ্ট লোকোত্তর বুদ্ধের নিম্নাঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। ওপরের অংশটি পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে ৩টি সোনার পিণ্ড। একটি রূপার হরিকেল মুদ্রা। আরও পাওয়া গেছে ছোট আকারের কিছু ধাতুমূর্তি। তবে খুবই উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হচেছ একটি ধাতু ফলক লিপি। অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির ফলক, অলংকৃত ইট, মুদ্রক-মুদ্রিকা এবং মাটির বেশ কিছু হাঁড়ি-পাতিল। লোকোত্তর বুদ্ধের মূর্তিটি মন্দিরের মূর্তি কোণায় এখনও যথাবস্থায়ই আছে। রীতি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলোর সময়কাল অষ্টম-নবম শতক বলে অনুমান করা হয়।

লতিকোট মুড়া

ইটাখোলা মুড়ার মন্দির থেকে ১২৫ মিটার পূর্বদিকে সেনানিবাস এলাকায় সর্বদক্ষিণ প্রান্তে স্থাপিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল এবং কলেজ বেষ্টনীর ভেতরে লতিকোট মুড়া নামক প্রত্নস্থানটি অবস্থিত। ১৯৯৫ সালে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই স্থানের ওপর স্কুল ভবন নির্মাণ করার সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর হতে আপত্তি করা হলে পুরাকীর্তি রক্ষার আশ্বাস দেয়া হয়। সে মোতাবেক পুরাকীর্তি স্থানটিকে পূর্ব পাশে বাদ রেখে পশ্চিম দিকে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ পূর্বদিকের স্থানটিসহ বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আপত্তি দেয়ার পরও দেয়াল নির্মাণ করে স্থানটিকে বুলডোজার দ্বারা সমতল করে খেলার মাঠে রূপান্তর করা হয় বলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ২০০৫-২০০৬ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। এর ফলে পুরাকীর্তিটির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই মুড়ায় ২০০৩ সালে খনন কাজ শুরু হয়। এর আগে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি গ্রহণ করা হয়। খনন কাজ পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে ৪৭ মি. ২৩ সে.মি (পূর্ব-পশ্চিমে) × ৪৪ মি. ৪৯ সে.মি. (উত্তর-দক্ষিণে) পরিমাপের একটি বিহারের ভিত উন্মোচিত হয়। এর থেকে ধরে নেয়া হয় একটি আয়তাকার খোলা চত্বরকে কেন্দ্র করে ভিক্ষু কোঠা পরিবেষ্ঠিত রূপে এ বিহার নির্মিত হয়েছিল। এর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বাহুর প্রতিটিতে ৮টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাহুর প্রতিটিতে ভিক্ষু কোঠা বা কক্ষের সংখ্যা ৭টি করে। বিহারের পেছনের প্রাচীর ২.৭৪ সে.মি. ও ভিক্ষু কক্ষের সামনের দেয়াল ১.৬৭ সে.মি. চওড়া। কোঠাগুলো ৩ মিটার বর্গাকার। এগুলোর সামনে রয়েছে অন্যান্য বিহারের মতোই একটি টানা বারান্দা যা ১.৯৮ মিটার চওড়া। ভিক্ষু কক্ষগুলো ছাড়া উত্তর-পশ্চিম কোণে ১টি ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১টি মোট দুটি ছোট আকৃতির সিঁড়িকোঠার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ললিতপুর মুড়ার খনন কাজ সমাপ্ত হয়নি। মন্দির ও তোরণের অংশ মাটির নিচে রয়েছে। প্রত্নসম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে কয়েকটি মাঝারি আকারের মৃৎপাত্রের তলার অংশ ১.২১ মিটার খনন পরিচালনার পরে একটি মেঝেসহ দুটি স্তর আয়নের পরিচয় পাওয়া গেছে। দেয়াল গাঁথুনিতে একটি নির্মাণ যুগ ও আরেকটি পুনর্নির্মাণ যুগের অস্তিত্ব রয়েছে। অনাবৃত মেঝেটি মূল নির্মাণ যুগের ভিতের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় নির্মাণ যুগে বিহারের পূর্ব বাহুর কক্ষগুলো ব্যবহার না করে পূর্ব বাহুর মাঝামাঝি স্থানে পশ্চাত দেয়ালের ২.৪৩ মিটার, পশ্চিম দিকে ৪.৪৭ মি. × ৪.৫৭ মিটার বর্গাকার একটি কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ঐ কাঠামোর মধ্যখানে ২.১৩ মি. × ২.১৩ মি. পরিমাপের একটি কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে। এটিকে সম্ভবত মণ্ডপ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এ কাঠামোটিকে ০.৯১ মিটার চওড়া প্রাচীর দ্বারা ঘেরাও করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে

এর একটি দরজা রয়েছে। মণ্ডপের চারদিকে ১.৬৮ মি প্রশস্ত একটি প্রদক্ষিণ পথের নিদর্শন আছে।

ললিতকোট বিহারে পূর্ণাঙ্গ প্রবেশ কাঠামো ও বারান্দার রিটেইনিং ওয়াল আবিষ্কারের জন্য ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। খননের ফলে উত্তর বাহুর কক্ষের সম্মুখ দেয়াল ও পশ্চাত দেয়ালের মাঝামাঝি স্থানে বহির্মুখে ২৫ সে.মি. প্রশস্ত দুটি ধাপের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এছাড়া উত্তর দিকে উদগত একটি পাথ ওয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। একে প্রবেশ তোরণের অংশ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ তোরণের পরিমাপ ও নক্‌শা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে পশ্চাত দেয়ালের ভেতর অংশ ২.৪৪ মিটার প্রশস্ত প্রবেশ পথ/ কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে।

ভূমির পূর্ব অংশ নিচু হওয়ায় এখানে স্থাপত্য কাঠামোর ভিত নিচু থেকেই গাঁথা হয়েছে। এ এলাকার কয়েকটি স্থানে প্রায় ১.৫ মিটার পর্যন্ত গভীর খনন পরিচালনার ফলে ২টি স্তর, ১টি মেঝে ও ২টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১ম স্তরটি ধূসর রঙের আলগা মাটির স্তর। এ স্তরের সঙ্গে ইটের টুকরো ও কদাচিত খোলামকুচির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ স্তরটি ০.৯০ মিটার পুরু। এ স্তরের ওপরে যে মেঝে ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। সামান্য চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয় স্তর বালু মাটির। ভিত গাঁথার পর প্লিন্‌থ লেবেল পর্যন্ত সেন্ডফিলিং করা আছে। এর ওপর প্রায় ০.১২ মিটার পুরু একটি কংক্রিটের মেঝের চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে। এটি ১ম নির্মাণ যুগের বলে মনে করা হয়। এ স্তর ৫.৬৫ মিটার পুরু। এর নিচে শক্ত লালচে কংকর জাতীয় মাটি রয়েছে। এ মাটিতে কোনও সাংস্কৃতিক জঞ্জাল মিশ্রিত নেই।

পরবর্তী নির্মাণ যুগের মেঝেসহ অধিকাংশ স্থানের দেয়াল সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ললিতকোট মুড়ার প্রত্নবস্তু

খননে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া না গেলেও কিছু ভাঙা মাটির সঞ্চয়াধার বসানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিছু মাটির পাত্রের টুকরাও সংগৃহীত হয়েছে। ইটের পরিমাপ, উন্মোচিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং পারিপার্শ্বিক আবিষ্কারের সূত্র ধরে বিহারটিকে অষ্টম শতকে নির্মিত বলে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন।

সেনানিবাসের বাংলাবিহার

কুমিল্লা-কোম্পানিগঞ্জ সড়কের কুমিল্লা-ঢাকা মহাসড়কে সংযোগস্থলের ১ কি.মি. উত্তরে সেনানিবাসের বাংলোর পাহাড়ে একটি প্রাচীন স্থাপনার ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ও এর আয়তন প্রায় ১৫০ × ১২৫ মিটার। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে ও পাকিস্তান আমলে সেনানিবাস নির্মাণের ফলে প্রাচীন কীর্তিটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

কোটবাড়ি বিহার

কোটবাড়িতে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের একটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এটি কুমিল্লা বার্ড (পল্লীউন্নয়ন একাডেমী) থেকে ১ কি.মি. পশ্চিমে কুমিল্লা-কোটবাড়ি রাস্তা থেকে প্রায় ৩৩ মিটার দক্ষিণ দিকে সমতল পাহাড়ে অবস্থিত। কিন্তু এখান থেকে এমনভাবে ইট সরানো হয়েছে যে, মাটির ওপরে সে বিহারের আর কোনও চিহ্ন নেই।

নিদর্শনটির ভিত্তিমূল থেকে জানা যায় বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৮০ মিটার লম্বা। পরিবেষ্টক প্রাচীরের কোনও কোনও স্থান এখন ২ থেকে ২.৫ মিটার উঁচু। প্রাচীর ঘেঁষে ভিক্ষু বা শ্রমণদের জন্য নির্মিত কক্ষের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বিহারে ভেতরে একটি কেন্দ্রীয় মন্দির ছিল বলে মনে হয়। কারণ এর কেন্দ্রস্থলে ২.৮ মিটার উঁচু একটি ঢিবি রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্দিরের উত্তর দিকে বিহারের প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের দুদিকে দুটো ক্ষুদ্র আকারের ইমারতের চিহ্ন রয়েছে। এ কারণে এটি বিহার না দুর্গ, নাকি কোনো রাজার বাড়ি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত।

সম্ভাবনাময় ঢিবি

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এ পর্যন্ত লালমাই-ময়নামতি টিলার ঢালে ৫০টি সাংস্কৃতিক ঢিবিকে সম্ভাবনাময় বলে ২৩টিকে সংরক্ষিত ঘোষণা করেছে। এগুলোর মধ্যে ১০টিতে খননকার্য পরিচালনা করা হয়েছে।, বাকী আছে ১৩টি। এগুলোর মধ্যে রূপবান কন্যার বাড়ি ও রূপবানী মুড়ার কথা আমরা আগেই বলেছি। এছাড়া যে ১০টিতে খননকার্য পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলোর কাজও সম্পূর্ণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় বাকী ১১টি ঢিবি বা মুড়ার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো :

হাতিগড়া মুড়া ২(২৪)

কোটবাড়ি মুড়ার ঠিক পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে থাকা ১৫ মিটার উঁচু হাতিগড়া নামের একটি টিলা রয়েছে। এ টিলার চূড়ায় ৩০ মি. × ২৫ মিটার এলাকা জুড়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে অন্তরীণ আছে বলে মনে করা হয়। বর্তমানে টিলাটি ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।

উজিরপুর মুড়া

হাতিগড়া মুড়ার ১ কি.মি. দক্ষিণে প্রায় ২০ মিটার উঁচু উজিরপুর মুড়া। টিলার

ওপরে প্রত্নকীর্তির অবস্থান। ভূমি পিঠের বর্তমান বিন্যাস থেকে মনে করা হয় এতে ২০ মি. × ১৮ মি. পরিমাপের একটি প্রাচীন স্থাপনা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। তবে ঢিবিটি ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় আছে।

পাককা মুড়া (১২)

উজিরপুর মুড়া থেকে আনুমানিক ১.৫ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি টিলার নাম পাককা মুড়া। প্রায় ২৫ মি. উঁচু এই টিলার চূড়ায় ২৭ মি. × ২৭ মি. পরিমাপের একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষে মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে বলে অনুমান করা হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'লালমাই-ময়নামতি' গ্রন্থ বলা হয় বর্তমানে চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে মাটির নিচের পুরাকীর্তি ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

তারাদীঘি ও প্রত্নসম্পদ

পাককা টিলার নিচে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের অদূরে তারাদীঘির অবস্থান। পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে দীঘিটি সংস্কার করতে গিয়ে দুটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি ধাতু লিপি ফলক পাওয়া যায়। রীতি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিষ্ণুমূর্তি দুটিকে সেন আমল (দ্বাদশ শতক) এবং ধাতু লিপি ফলকটিকে রাজা দশরথ দেবের (ত্রয়োদশ শতক) জারী করা ধাতু লিপি ফলক বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা সনাক্ত করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো বর্তমানে বাংলাদেশে নেই। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার নিদর্শনগুলো পাকিস্তানে নিয়ে যায়। নানা অজুহাতে এগুলো আর ফেরত দেয়নি। এগুলো ফেরৎ আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চিলা মুড়া

শালবন বিহার থেকে ৪-৫ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত উত্তর বিজয়পুর গ্রামে আনুমানিক ১০ মিটার উঁচু চিলা মুড়া নামে একটি ঢিবি রয়েছে। এর ওপর প্রচুর সংখ্যক সাংস্কৃতিক জঞ্জাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

চণ্ডিমুড়া (৩১)

লালমাই পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তে ধর্মপুর গ্রামে রাস্তা ও স্থানীয় হাট সংলগ্ন ৩৫ মিটার উঁচু টিলার চূড়ায় ১৩ মি. × ১১.৯ মিটার পরিমাপের একটি প্রাচীর ঘেরা চত্বর রয়েছে। পুরনো প্রাচীরের অস্তিত্ব না থাকলেও চিহ্ন আছে। প্রাচীরের মাঝখানে পশ্চিমুখী দুটি মন্দির। একটি থেকে আর একটি ৩.২ মিটার দূরে। প্রত্যেকটির পরিমাপ ৫.১৫ মি. × ৮ মিটার। কার্ণিশ সামান্য বাঁকানো। ছাদটি ৪ পলাকার, চৌচালা ঘরের মতো। এর ওপর পদ্মপাতার রূপচিহ্ন শোভিত ঘাড়ের ওপর একটি আধাবৃত্তাকার গম্বুজ বসানো আছে। গম্বুজের চূড়ায় একটি চূড়াদণ্ড। প্রতিটি কোণায়

রয়েছে একটি করে বেলুনাকার সংলগ্ন থাম। থামগুলো কার্নিশ পর্যন্ত উঠে একটি কলস চূড়ায় গিয়ে লেগেছে।

মন্দির দুটি এক কোঠা বিশিষ্ট। দরজার চারদিকে খিলান রয়েছে। সেখানে কারুকাজ আছে। আছে এক সারি শিল্পভূমি সম্বলিত একটি প্রান্তবন্ধনী। দেয়াল পলেস্তারায় ঢাকা। গাঁথুনি তৈরির জন্য চুন-শুরকির মসলা এবং ছোট ইট ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দির দুটিকে অষ্টাদশ শতকের বলে মনে করা হয়। এ মুড়াটির নামকরণ সম্ভবত দেবী চণ্ডীর নামে হয়ে থাকবে। তবে মন্দির দুটির একটিতে শিবের পূজা হতো ও অন্যটিতে দেবী চণ্ডীর।

মন্দির দুটি থেকে ১৬.৮ মিটার উত্তরে একটি ঢিবি রয়েছে। এই ঢিবির পরিমাপ ৯.২ মি × ৪.৬ মিটার। তাছাড়া ৩২ মিটার উত্তর-পূর্বদিকে আরেকটি ঢিবির অস্তিত্ব রয়েছে। এর পরিমাপ ১৩.৭ মি. × ৯.১ মিটার। প্রথমটি পূর্ব-পশ্চিমে ও দ্বিতীয়টি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এ দুটি ঢিবির ইমারতে ব্যবহৃত ইটের নমুনা দেখে মনে হয় এগুলো শালবন বিহার বা আনন্দ বিহারের সমসাময়িক। এর থেকে ধারণা করা যায় শিব ও চণ্ডি মন্দির দুটি যে স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে আরও প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছিল। অন্য একটি তথ্য এ ধারণাকে সমর্থন করে।

চণ্ডিমুড়া সংলগ্ন পূর্বদিকের সমতল ভূমিতে একটি দীঘি রয়েছে। এ দীঘি থেকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে বেলে পাথরের তৈরি একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। একই জলাশয়ে আর একটি মঞ্জুবর (মঞ্জুশ্রী বোধি সত্ত্বেরই একটি রূপ) পাওয়া যায়। মন্দির দুটিতে এ প্রত্ননিদর্শন দুটো রাখা হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এ নিদর্শনগুলো পালযুগের অর্থাৎ অষ্টম থেকে দশম শতকের। তবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের 'ময়নামতি-লালমাই' গ্রন্থে বলা হয়েছে এগুলো একাদশ-দ্বাদশ শতকের। মন্দিরগুলোর কাছে প্রচুর খোলামকুচি, পাথরকুচি ও প্রস্তরীভূত কাঠের খণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'ময়নামতি-লালমাই' গ্রন্থের লেখকরা মনে করেন আঠার-উনবিংশ শতকে চণ্ডি মুড়ায় একটি উল্লেখযোগ্য শাক্তধর্ম কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। শাক্ত ধর্ম উপাসনা হচ্ছে মূলত নৈস্বর্গিক নারীর উপাসনা। তাঁদের মতে এসব পরবর্তীকালের। এগুলোর নিচে পুরনো আমলের আরও স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ অন্তরীণ থাকার সম্ভাবনা আছে।

বালাগাজী মুড়া

চণ্ডি মুড়ার কাছেই পূর্ব-উত্তরদিকে এ টিলাটি অবস্থিত। প্রায় ১৮ মিটার উঁচু এ মুড়ায় প্রচুর পরিমাণে প্রাচীন ইট-পাটকেল পড়ে আছে। ষাটের দশকে এর ওপর কয়েকটি পুরনো দেয়াল টিকে ছিল। এখন অবশিষ্ট কিছুই নেই।

বৈরাগীর মুড়া (৪৮)

কোটিলা মুড়া থেকে ১.৫ কিলোমিটার দূরে বৈরাগী মুড়ার অবস্থান। এ টিলার ওপরে যে ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে তার পরিমাপ উত্তরে-দক্ষিণে ১৯০ মিটার × পূর্ব-পশ্চিমে ৬৫ মিটার। ভূমিপৃষ্ঠে ভাঙা গাঁথুনি এবং পাটকেলসহ হলঘরের বিন্যাস লক্ষ করা যায়। বর্তমানে এর ওপরে দুটি আধুনিক পানির ট্যাংক রয়েছে। ইতোপূর্বে এ ঢিবি থেকে একটি ধাতব অবলোকিতেশ্বরের মাথা পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এটি দশম বা একাদশ শতকের রীতি বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। এখান থেকে লিপি উৎকীর্ণ মূর্তির একটি পাদপট্টও আবিষ্কৃত হয়। এটিও ঐ সময়েরই বলে মনে করা হয়। বর্তমানে ময়নামতি জাদুঘরের পুরাকীর্তি ভাণ্ডারে মূর্তি মাথাটি সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়।

ময়নামতি মুড়া ১

ময়নামতি মুড়ার কয়েকটি অংশ রয়েছে। মূল ময়নামতি মুড়াটি কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ১ কি.মি. উত্তর দিকে অবস্থিত। সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৯.১৪ মিটার। ঢিবিটির মাঝখানের অংশ চারপাশ থেকে আরও উঁচু। ঢিবির ওপরে খোলামকুচি ও পাটকেল ছড়ানো আছে। এর থেকে মনে হয় অভ্যন্তরে ইমারতের স্থাপত্যিক নিদর্শন অন্তরীণ আছে।

ময়নামতি মুড়া ১(ক)

এটি একটি ছোট টিলা। ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজের পেছনে অবস্থিত। পুরনো পাটকেল ও খোলামকুচি ঢিবির ওপরাংশে দৃশ্যমান ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ মুড়াটি সমতল করার ফলে অন্তরীণ স্থাপত্যিক কাঠামো এখন আর দৃশ্যমান নেই। খনন করলে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

ময়নামতি মুড়া (২)

এটি সেনানিবাস এলাকার হাই স্কুলের পূর্ব পাশে অবস্থিত। ঢিবিটির উত্তর-পূর্ব অংশ অন্য দিকের চেয়ে উঁচু। সেনা কর্তৃপক্ষ কিছু নতুন স্থাপনা নির্মাণ করার ফলে এর পরিধি ছোট হয়ে গেছে। এখনও সেখানে পুরনো ভাঙা ইট-পাটকেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ময়নামতি মুড়া ২(ক)

সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত ব্রিগেডিয়ার বাংলোর পশ্চিম পাশে এর অবস্থান। এটি আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত বলে স্থানীয়ভাবে একে দিঘইল্যা মুড়া বলে। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। ঢিবির ওপরের অংশ সমতল। এর থেকে মনে করা হয় এখানে প্রত্নকীর্তি নাও থাকতে পারে। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন অনুসন্ধানের আগে এ ব্যাপারে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না।

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

রাণী ময়নামতির প্রাসাদ পাহাড়

স্থানীয় জনগণ মনে করে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের একদম উত্তর দিকে অবস্থিত প্রাচীন স্থাপনাটি রাণী ময়নামতির প্রাসাদ ও দুর্গ। এটি একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর দিকে খুবই খাড়া। ভূমি থেকে প্রায় ১৫ মিটার উঁচু। পশ্চিম দিকে নিম্নভূমি দিয়ে চলে গেছে কুমিল্লা-কোম্পানিগঞ্জ সড়ক। সড়কের পশ্চিম দিকে ক্ষীরোদা নদী। তারও পূর্ব দিকে দেও দীঘি। এই পাহাড়ে বর্তমানে একটি স্কুল রয়েছে। আর আছে ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরার এক মহারাজা নির্মিত বাগান বাড়ির ডাকবাংলো। ছোট-খাট কিছু গর্ত রয়েছে।

এ পাহাড়ে সামান্য খননের ফলে চারদিকে প্রাচীন প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৭০ মিটার উত্তর-দক্ষিণে ও ১৬৭ মিটার পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল এ প্রাচীর। প্রাচীরটি প্রায় ৪ মিটার চওড়া। পূর্ব দিকের প্রাচীরের মাঝামাঝি স্থানে একটি ইমারতের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে এটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের। এ পাহাড়েও অনুসন্ধান চালালে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা।

সমাধি বিহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের যে স্থানে সমাহিত করা হয়েছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তালিকা মতে এটি সংরক্ষিত স্থানের মধ্যে ৪০তম। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত এ বিহারের প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ৮০ মিটার। কেন্দ্রীয় মন্দিরের জায়গায় সেটি নির্মূল করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের জন্য এখানে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

আব্বাস আলী মুড়া (৩৭)

চারপত্র মুড়া থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এ মুড়ার অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এ মুড়ার আয়তন ৩০ মি × ২৫ মি.। উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। মুড়ার ওপরে পুরনো পাটকেল ও ভাঙা ইট পড়ে আছে।

বটবৃক্ষ পাহাড়ের মন্দির (৪২)

এটি ময়নামতির জাতীয় সমাধিস্থানের ২০০ মিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পাহাড়ের চূড়ায় একটি বটবৃক্ষের নিচে এর অবস্থান। ২৫ মি. × ২৫ মি. আয়তনের এ ঢিবিতে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

চুল্লা মুড়া (৩৫)

চারপত্র মুড়া থেকে ১৫ মিটার উত্তরে এ প্রাচীন স্থাপনাটির অবস্থান। এখন তার স্মৃতিচিহ্নমাত্র টিকে আছে।

ফকিরা মুড়া (৩৬)

চারপত্র মুড়া থেকে ১৫০ মি. পশ্চিমে সেনানিবাস এলাকায় এর অবস্থান। এ স্থাপনাটিও বর্তমানে নেই।

বড়গাছ মুড়া (২১)

বৈরাগী মুড়া থেকে প্রায় ২ কি.মি. দক্ষিণে ২০ মিটার গোলাকার স্থাপনাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে।

নিরঞ্জনের মুড়া (২২)

বড় গাছ মুড়া থেকে ২ কি. মি. দক্ষিণে এ মুড়ার অবস্থান। এখানেও প্রত্নকীর্তি আছে বলে ধারণা করা হয়।

অন্যান্য

খাঁচার মুড়া (২৩) ধানমুড়া (১১), হাগনি মুড়া (১৪), আদিনা মুড়া (১৭), সবরা মুড়া (১৮), ছোট ইটাখোলা মুড়া (২৯), অর্জুন খোলা মুড়া (৩০), কালিদাসের মুড়া (৩২) টাক্কা মুড়া (৪৫) প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে বলে মনে করা হয়।

কুমিল্লার অন্যান্য স্থানের প্রত্নকীর্তি

লালমাই-ময়নামতি ছাড়াও কুমিল্লা জেলার আরও বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুনাইঘর, বড় কামতা, চান্দিনা, মন্দুক, বাঘাউড়া, পাঁচথুবী, মেহের, সাচার, আছিমপুর প্রভৃতি।

গুনাইঘর

গুনাইঘরের প্রাচীন নাম গুণিকাগ্রহার। অত্যন্ত প্রাচীন এক স্থান। কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে ও দেবীদ্বার উপজেলার সদর থেকে ৩ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে গুনাইঘরের অবস্থান। আমরা প্রাচীন ইতিহাসে বলেছি গুনাইঘরে শ্রীবৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রশাসনটি গুপ্তবংশের মহারাজা শ্রীবৈন্যগুপ্তের।

তাম্রশাসনের কিছু অংশের পাঠ নিম্নরূপ :

আপনাদিগের অবগতি হউক যে,

"আমার পিতামাতার এবং নিজের পুণ্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের চরণের দাস মহারাজ

রুদ্রদত্তের বিজ্ঞাপনাক্রমে, উক্ত (রুদ্রদত্ত) কর্তৃক মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধভিক্ষু আচার্য শান্তিদেবের উদ্দেশ্যে (দিকে) আর্য অবলোকিতেশ্বরের নামে যে আশ্রম বিহার নির্মিত হইতেছে, সেখানে উক্ত আচার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মহাযানীয় 'বৈবর্তিক' সংজ্ঞক ভিক্ষুসংঘের আবাস গৃহে (স্থাপিত) ভগবান বুদ্ধের গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা সর্বদা প্রত্যেহ তিন বেলা (পূজা প্রবর্তনের জন্য), ভিক্ষুসংঘের বস্ত্র, আহার, শয্যা, আসন, পীড়িতের ঔষধ প্রভৃতি ভোগের ব্যবস্থার জন্য এবং বিহারের ভাঙ্গা কিম্বা ফাটার সংস্কার সাধনের জন্য উত্তর মণ্ডলে অবস্থিত কান্তেডদক নামক গ্রামে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত ১১ পাটক পরিমিত খিলভূমি সর্বপ্রকার ভোগ সত্বে অগ্রহার রূপে তাম্রশাসন দ্বারা মৎ কর্তৃক প্রদত্ত হইল।"[১১]

এ তাম্রশাসন থেকে আরও জানা যায় "মহাপ্রতিহার, মহাপীলুপতি, পঞ্চাধিক-রোণোপরিক পাট্যুপরিক এবং পুরোপালপরিক পদাধিকারী মহাসামন্ত মহারাজ বিজয়সেন দূতক হইয়া ... ভূমিদানের আদেশ জানাইয়াছেন।"

দানকৃত ভূমির "প্রথম খণ্ডের পরিমাণ সাত পাটক নয় দ্রোণবাপ এবং সীমাচিহ্ন পূর্বদিকে গুণেকাগ্রহার নামক গ্রামের সীমানা ও বিষ্ণু নামক বর্ধকির (সূত্রধরের) ক্ষেত্র, দক্ষিণে সিদ্ধবিলাল (?) ক্ষেত্র ও রাজবিহারের ক্ষেত্র।"

"দ্বিতীয় খণ্ডের পরিমাণ আটাইশ দ্রোণবাপ এবং সীমা-পূর্বে গুণিকাগ্রহার গ্রামের সীমা, দক্ষিণে পক্কবিলাল ক্ষেত্র, পশ্চিমে রাজবিহার ক্ষেত্র ...।" বিহারের তলভূমিরও সীমাচিহ্ন এই পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নামক স্থানের নৌযোগদ্বয়ের মধ্যস্থিত জোলা অর্থাৎ ক্ষুদ্রজলবর্ত্ম, দক্ষিণে গণেশ্বরের বিলাল পুষ্করিণীতে নৌকা চলার জন্য খাড়ি, পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের শেষ সীমা ...। যে প্রতিকরশূন্য জলমগ্ন (হাজা) খিলভূমিতে এই বিহারের 'প্রাবেশ্য' রহিয়াছে তাহারও সীমাচিহ্ন এই–পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ক্ষেত্রের সীমানা, দক্ষিণে বৌদ্ধ ভিক্ষু আচার্য জিতসেনের বিহারের ক্ষেত্র সীমা, পশ্চিমে গঙ্গা (নদী) এবং উত্তরে দণ্ড পুষ্করীণি। সং ১০০৮০৮ (১৮৮) পৌষ [তারিখ] ২০৪(২৪)।"

তাম্রশাসনে ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। সময় উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৮ গুপ্তাব্দ। খ্রিস্টাব্দের হিসেবে ঐ সময়টা ৫০৭ থেকে ৫০৮ খ্রিস্টাব্দ। তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে মহারাজা বৈন্যগুপ্তের সামন্ত মহারাজা রুদ্রদত্তের অনুরোধে ও তাঁর অপর সামন্ত মহারাজা বিজয় সেনের মাধ্যমে অবলোকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত 'আশ্রম বিহারের' জন্য 'উত্তর মণ্ডলে' '১১ পাটক' ভূমি দান করেছিলেন। দানকৃত ভূমির অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি 'রাজবিহার' নামক আরেকটি মহাবিহারের ভূমি সংলগ্ন। ঐ স্থানের পাশে প্রদ্যুম্নেশ্বরের (কামদেবের) একটি হিন্দু-মন্দিরেরও অস্তিত্বের কথা জানা যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এ তিনটি ইমারত প্রাচীন গুণিকাগ্রহারেই ছিল। প্রাচীন 'উত্তর মণ্ডল' নামটিও ঐ এলাকার বর্তমান 'গঙ্গামণ্ডল' নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তবে ইমারতগুলোর কোনও স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান গুনাইঘরে নেই। গুনাইঘর ও তার আশপাশের গ্রামে বহু স্থানে প্রাচীন যুগের ইট ও জঞ্জালাদি অন্তরীণ রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। জনশ্রুতি রয়েছে অতি প্রাচীন কালে গুণিকাগ্রহারে সমৃদ্ধশালী জনপদের অস্তিত্ব ছিল। তাম্রশাসনে 'ত্রিপুরা' নামক স্থান থেকে ভূমিদানের কথা বলা হয়েছে। এ স্থানটিও অনাবিষ্কৃত। প্রামাণ্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত যে গুনাইঘরে নির্মিত বৌদ্ধ বিহার দুটি ও প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার ও প্রাচীনতম হিন্দু মন্দির। এ গ্রামে অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন–

"ইতিপূর্বে এই গ্রামেই একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি বহু বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে একটি দ্বাদশ হস্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পাদপিঠে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মণ্ড 'সে ধর্মা' ইত্যাদি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্প্রতি আর একটি বিষ্ণুমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। তদ্ভিন্ন গ্রাম মধ্যে একটি প্রাচীন বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংষাবশেষ বর্তমানে রহিয়াছে। সুতরাং প্রত্নসম্পদে এই গ্রাম ত্রিপুরা জিলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

তাম্রশাসনটিতে সামন্ত মহারাজা রুদ্রদত্ত ও সামন্ত মহারাজ বিজয়সেনের কথা উল্লেখ আছে। এর থেকে এটিই নিশ্চিত হওয়া যায় না যে গুণিকাগ্রহারের সামন্ত রাজা কে ছিলেন। তবে এটি নিশ্চিত যে এদের দুজনের একজন এতদঞ্চলের মহারাজা ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে ইতিহাস নীরব।

বড়কামতা

চান্দিনা উপজেলা সদরের পূর্বদিকে অবস্থিত বড়কামতা একটি প্রাচীন গ্রাম। নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার অন্তর্গত আশ্রাফপুর গ্রাম থেকে সমতটের রাজা দেবখড়গের দুটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। দেবখড়গের এ দুটি তাম্রশাসন 'জয়কর্মান্তা' নামক স্থান থেকে প্রদান করা হয়েছিল। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন বর্তমান বড়কামতাই এ জয়কর্মান্তা। অবশ্য ভিন্ন মতও আছে। প্রাচীন স্থান হিসেবে বড়কামতা ও তার আশপাশের গ্রামগুলো অতীত কাল থেকেই গুরুত্ব পেয়ে আসছে। চান্দিনা বড়কামতা উভয় স্থানেই অসংখ্য দীঘি ও পুষ্করিণী রয়েছে। রয়েছে প্রাচীন ঢিবি। ঢিবিতে প্রাচীন যুগের ইট পরিদৃষ্ট হয়। এতে মনে করা হয় এখানে প্রাচীন কালে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব ছিল। কারণ তাম্রশাসন দুটিতে দেখা যায় পেরনাটন বিষয়ের অধীনে চারটি বিহার ও বিহারীকার অধ্যক্ষ সংঘমিত্রকে ৬ পাটক'ও ১০ দ্রোন ভূমিদান করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাজা দেবখড়গ দুটি তাম্রশাসন জয়কর্মান্তা থেকে প্রদান করেছিলেন। জয়কর্মান্ত হয় দেবখড়গের রাজধানী ছিল নতুবা প্রশাসনিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এ দুটি বিষয়ই স্থানটির গুরুত্বকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়।

মন্দুক

কুমিল্লা জেলার বড়ুরা থানার মন্দুক একটি প্রাচীন গ্রাম। এ গ্রামে কালো পাথরে তৈরি একটি গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। এ মূর্তিটির পরিমাপ ১৫০ সে.মি. × ৯৯ সে.মি.। হাতির মাথা (শুঁড়যুক্ত) এবং মানুষের শরীর বিশিষ্ট এ দেবতা আমাদের অতি পরিচিত। মূর্তিটিতে ৪টি হাত রয়েছে। বাম দিকের একটি হাত ধারণ করে আছে একটি মিষ্টির পাত্র। পদ্মাসনের ওপর নাচের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। পদ্মাসনের নিচে রয়েছে তার বাহন ইঁদুর। পাদপিঠের ওপর উৎকীর্ণ রয়েছে ৩ ছত্র প্রাচীন বাংলা লিপি। লিপিটি এরকম :

> "সিদ্ধম। শ্রী গোপাল দেব প্রথম রাজে মাতা–
> পিতৃ পূর্বংগম (ং) কৃত্বা
> সকল সত্বরাসে (শেঃ) [অনুত্তর] জ্ঞান লাভৌ
> দেব ধর্মোয় (ং) বৃ (দ্ধ)
> সার্থ জম্ভল মিত্রেন (ণ) কৃয়ত (া) মিতি ॥"[১২]

লিপির ভাষ্য অনুসারে গোপালদেবের রাজত্বের প্রথম বর্ষে জম্ভলমিত্র নামে এক বৃদ্ধ তার পিতা-মাতাসহ সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মূর্তিটি উৎসর্গ করেছেন। কারুশৈলী ও লিপির নমুনা অনুসারে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন মূর্তিটি দশম শতকের। ঐতিহাসিকরা মনে করেন গোপালদেব খুব সম্ভব পাল বংশীয় রাজাদের দ্বিতীয় গোপাল (৯৫২-৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। মূর্তিটি বর্তমানে ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ভবনের বাইরে প্রবেশ পথের ধারে প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে। মন্দুক গ্রামে উত্তর-দক্ষিণে একটি দীর্ঘ জলাশয় রয়েছে। জলাশয়টি অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রায় মজে গেছে। আশে-পাশেও বড় পুকুর ও দীঘি রয়েছে। বড় জলাশয়টির পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে প্রাচীন যুগের ইট ও পাথরের টুকরা দেখা যায় এমন কতগুলো ঢিবি রয়েছে। সঙ্গত কারণেই মনে করা যায় যে এককালে এ স্থানে বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দির ছিল। খননকার্য পরিচালনা করলে প্রাচীনকালের বহু নিদর্শন বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। বড় জলাশয়সহ অন্য জলাশয়গুলো সংস্কার করলেও প্রাচীন মূর্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাহাড়পুর

পাহাড়পুর মুরাদনগর উপজেলায় অবস্থিত। এটিও একটি প্রাচীন জনপদ। এ গ্রাম থেকে ১৯৭৯ সালে তিনটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। তাম্রশাসনগুলো ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পাঠোদ্ধার করা যায়নি। তবে গজলক্ষ্মী সম্বলিত সিলমোহর ও কিছু কিছু পাঠ থেকে এগুলোকে রাতবংশের তাম্রশাসন মনে করা হয়। জানা যায় একাধিক ঢিবি থাকার কারণে এ গ্রামের নাম পাহাড়পুর হয়েছিল। বর্তমানে এখানে অবশ্য কোনও ঢিবি নেই। পাহাড়পুর হয়তো এর আসল নাম নয়।

যেমন নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের নামও অতীতে ছিল সোমপুর বিহার।

বাঘাউড়া বিল কেন্দুয়া

প্রায় ১০০ বছর আগে বাঘাউড়া গ্রামের প্রাচীন দীঘি থেকে সংস্কার কালে পাথরের একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি কালো পাথরে নির্মিত। মূর্তির পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায় রাজা মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে সমতট রাজ্যের অন্ত র্গত বিলকিন্দ নিবাসী লোকদত্ত নামক এক বণিক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাঘাউড়ার পাশে এ বিলকেন্দুয়া গ্রাম এখনও আছে। সেখানে অতি প্রাচীন জলাশয়ও রয়েছে। জলাশয়ের পাড় সংলগ্ন উঁচু ভূমিতে প্রাচীন যুগের ইট, পাথর ও ভিতের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

নোয়াপাড়া

কুমিল্লা শহরের কাছেই নোয়াপাড়ার অবস্থান। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া গেছে এমন পোড়ামাটির সিলমোহর ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু থেকে মনে করা হয় এটি সম্ভবত সপ্তম শতকের খড়গ বংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত।

চম্পকনগর

এ গ্রামে বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। ঢিবিগুলোর ভেতরে আছে প্রচুর ইট এবং এগুলোর সবগুলোই প্রাচীন যুগের বলে মনে হয়।

পাঁচথুবী

কুমিল্লা শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে সামান্য দূরে পাঁচথুবী গ্রামের অবস্থান। এখানে পাঁচটি ঢিবি বা স্তূপের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া মনে করেন পাঁচটি স্তূপের অস্তিত্ব থেকেই এ গ্রামের নাম হয়েছে পাঁচথুবী। তিনি গ্রামের নামের বিবর্তন দেখান এভাবে : পঞ্চস্তূপ> পাঁচস্তূপ> পাঁচস্তূপী> পাঁচথুবী।[১৩] বর্তমানে অবশ্য এসব স্তূপের কোনও অস্তিত্বই নেই। লেখকের লেখা থেকে জানা যায় এ স্থানে আরও অনেক প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। চকমিলান ইমারতকে এক মহারাজার বাড়ি মনে করা হয়। এটি সম্ভবত বৌদ্ধ বিহারের ধবংসাবশেষ। এ স্থানে আরও অনেক কীর্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। মাটির নিচে প্রাচীন ইট, মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ কৃষ্টির পাদপীঠ হিসেবে বহু গ্রন্থে পাঁচথুবীর নাম রয়েছে।

মেহের

মহারাজা দামোদরদেবের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তিনি (সকল ভূপতি চক্রবর্তী) ১২৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমতট মণ্ডলের বৈশগ্রাম বিষয়ে মেহার গ্রামের পার্শ্ববর্তী স্থানে ২৫ জন ব্রাহ্মণকে ৪ দশমিক এগারো ভাগের ষোল দ্রোণ ভূমি দান করেছিলেন। এ মেহার-ই বর্তমান মেহের। মেহের কালীবাড়ি হিন্দুদের তীর্থভূমি। পাশের শ্রীপুরে অবস্থিত শাহরাস্তির মাজার মুসলমান ভক্তদের কাছে পুণ্যস্থান। তবে এগুলো আরও পরবর্তীকালের। প্রাচীনকালের কীর্তি অবশ্য এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এ স্থানের মাটির নিচে পুরনো দিনের ইট ও সাংস্কৃতিক জঞ্জাল থেকে মনে হয় মাটির নিচে মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থাকতে পারে। মাজার সংলগ্ন বিরাট দীঘিটি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বলে কেউ কেউ মনে করেন।

সাচার

সাচারের রথযাত্রা এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। তবে তা খুব পুরনো আমলের কথা নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সাচারের অন্য কারণে। এখানে গুপ্ত সম্রাটদের একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। জানা যায় প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এ স্থানে ছিল। এখনও মাটির নিচে প্রাচীন যুগের ইট পাথর ও হাঁড়ি-পাতিলের জঞ্জাল পাওয়া যায়।

অন্যান্য প্রত্নবস্তু

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের বাইরে বিভিন্ন সময়ে কতগুলো প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। এগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো :

সূর্য

কালো পাথরে তৈরি মূর্তিটি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার বাবুটি পাড়া থেকে সংগ্রহ করা হয়। এর পরিমাপ ১৩৫ সে.মি × ৬৫ সে.মি.। সূর্য দেবতা দু হাতে সনাল পদ্ম ধারণ করে স্থানক ভঙ্গিতে সপ্তরথ পাদপিঠের ওপর দণ্ডায়মান। তার মস্তকের চারপাশে অলৌকিক দীপ্তি ও বক্ষে উপবীত বিদ্যমান। ডানপাশে কোষবদ্ধ তরবারি। পায়ে উঁচু বুট জুতা পরিহিত। দেবমূর্তির দু'পাশে তাঁর দু স্ত্রী– সংগা ও ছায়া দণ্ডায়মান। এছাড়াও দণ্ডী ও পিঙ্গল নামে দুজন অনুচরসহ সারথী অরুণ যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রথ (সাতবরাহ খচিত) পরিচালনা করছে। মূর্তিটি ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রাখা আছে।

হেরুক

হেরুক অমঙ্গল বিনাসকারী দেবতা। বজ্রযানী বৌদ্ধ যুগে তাঁর আবির্ভাব। মূর্তিটিতে দেখা যায় দেবতা বাম পায়ের ওপর নাচের অতিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তার

ডান পা বাম পায়ের উরুর ওপরে স্থাপিত। গলায় পরিধান করেছেন মানুষের ২২টি মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মালা। ভয়ঙ্কর তাঁর রক্তরাঙা চোখের হিংস্র চাহনী ও নগ্ন দাঁত। মূর্তিটির ডান হাত ভেঙ্গে গেছে। বাম হাতে মাদক দ্রব্য ও মানুষের মাথার খুলি। বাম কাঁধের ওপর ক্ষতভঙ্গ। তাঁর মাথার মুকুটও মানুষের মাথার ৫টি খুলি দ্বারা অলংকৃত এবং চুলগুলো মুকুট আকারে ওপরের দিকে বিন্যস্ত। মুকুটে অক্ষ্যোভ্যের প্রতিকৃতি। কালো পাথরে তৈরি মূর্তিটির পরিমাপ ১০২ সে.মি. × ৬১ সে.মি.। মূর্তিটি আনুমানিক দশম বা একাদশ শতাব্দীর বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। এটি কচুয়ার লাজাইর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ত্রিবিক্রম বিষ্ণু

মূর্তিটি কালো পাথরে তৈরি। পরিমাপ ১০৪ সে.মি. × ৪৮ সে.মি.। হস্তে দক্ষিণাবর্তের শঙ্খচক্র, গদা ও পদ্ম। তার পাশে দু স্ত্রী– স্বরসতী ও লক্ষ্মী দণ্ডায়মান। পদ্মাসনের নিচের অংশে তার বাহন গরু অঞ্জলি ভঙ্গিতে উপবিষ্ট। মূর্তির ওপরে কীর্তিমুখ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা এটি একাদশ বা দ্বাদশ শতকের। এ জাতীয় আরও একটি মূর্তি ময়নামতি জাদুঘরে আছে।

তারা মূর্তি

কচুয়ার লাজাইর গ্রাম থেকে এটি পাওয়া গেছে। তারা বুদ্ধ মহাযানী নারী প্রজ্ঞাপার-মিতা। বেলে পাথরের তৈরি মূর্তিটির পরিমাপ ১৬৮ সে.মি. × ৫৩ সে.মি.। মূর্তিটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো বাম হাতে অর্ধ ফোটা পদ্ম। ডান হাত বরদ মুদ্রায় কিছুটা ওপরে স্থাপিত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এটিকে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর নিদর্শন বলে মনে করেন। একটি কালো পাথরের তৈরি মূর্তিও পাওয়া গেছে। পদ্মের ওপর ললিতাসনে উপবিষ্ট। ডান হাত বরদ মুদ্রায় সংস্থাপিত। মূর্তিটির পরিমাপ ৬৬ সে.মি. × ৩২ সে.মি। এটি দশম বা একাদশ শতকের নিদর্শন বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা।

মারীচী

পাথরের তৈরি মূর্তিটির পরিমাপ ৬৩×৩৯ সে.মি.। ৭টি শূকর বাহিত রথে দণ্ডায়মান। ৩টি মুখ, একটি শূকুরীর মতো, ৮ বাহু। মহাযানী বৌদ্ধদের পূজ্য দেবতা। এর সময়কাল আনুমানিক দশম থেকে একাদশ শতক।

মঞ্জুবর

কালো পাথরের তৈরি বৌদ্ধ মূর্তিটি উর্ধ্বমুখী সিংহের ওপরে ললিতাসনে উপবিষ্ট। পরিমাপ ৬৩.৫ সে.মি. × ৪০.৬৪ সে.মি.।

পার্বতী

৪৫ সে.মি. × ২৬ সে.মি. পরিমাপের পার্বতী মূর্তিটি কালো পাথরে তৈরি। দেবীর পাশে দণ্ডায়মান কার্তিক ও গণেশ। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি দশম থেকে একাদশ শতকের রীতি বৈশিষ্ট্যে তৈরি।

হরগৌরী

ললিতাসনে উপবিষ্ট হর। তাঁর বাম উরুর ওপর ললিতাসনে উপবিষ্ট গৌরী। কালো পাথরে তৈরি এ মূর্তির পরিমাপ ৬১ সে.মি. × ২৯ সে.মি.। নির্মাণের রীতি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটি দশম থেকে একাদশ শতকের নিদর্শন বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন।

নন্দী

নন্দী হচ্ছে শিবের বাহন। কালো পাথরে তৈরি। পরিমাপ ১৪ সে.মি. × ১৮ সে.মি। এটি নির্মাণ রীতি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের নিদর্শন বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা।

মহিষ মর্দিনী

মহিষ ও সিংহের ওপর প্রত্যালীঢ় ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান পার্বতীর রুদ্ররূপ এটি। ১০ হাত। হাতগুলোতে দক্ষিণাবর্তে ত্রিশূল, সরপ, পাশ, খড়্গ, সূচি, খেটক, ধনু, কুঠার, চাবুক এবং বাম দিকের এক হাতে অশূরের চুল স্পর্শ করা। মূর্তিটির পরিমাপ ৫৮ সে.মি, × ২৩ সে.মি.। কালো পাথরে তৈরি। সময় দ্বাদশ শতাব্দী। পাশাপাশি আর একটি মহিষ মর্দিনী মূর্তি ময়নামতি জাদুঘরে রয়েছে। এর পরিমাপ ৪৯ সে.মি. × ২৫ সে.মি.। এটি অন্য মূর্তিটির সমসাময়িক বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা।

মনসা

মনসা সাপের দেবী। কালো পাথরের তৈরি মূর্তিটির পরিমাপ ২৩ সে.মি. × ১৫ সে.মি.। মাথায় ৫টি সাপের ফণা। দণ্ডায়মান মনুষ্য মূর্তির কটিদেশের নিচের অংশ ও ডান হাত ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া গেছে। নির্মাণ রীতি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি নবম থেকে দশক শতকের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২০০৬-২০০৭ সালের প্রতিবেদন থেকে আরও বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় বলে জানা যায় :

রাধামূর্তি

শাহরাস্তি থানা হতে রাধার একটি মূর্তি ময়নামতি জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়।

মূর্তিটি পিতলের তৈরি, তারকাখচিত পাদপট্টের ওপর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। মূর্তির বাম হাত নিচের দিকে এবং ডান হাত ওপরের দিকে। ডান হাতের কব্জির ওপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে অর্থাৎ পাওয়া যায়নি। বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য আঙ্গুলের অগ্রভাগ ভাঙ্গা। মূর্তির উচ্চতা ৪৩ সে.মি. (বেদীর নিম্নভাগসহ ৫০ সে.মি.)।

ননী গোপাল-১

এটিও পিতলের তৈরি। মুরাদনগর থানা থেকে ময়নামতি জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরিমাপ ১০ সে.মি × ৯ সে.মি.। হামাগুড়ি ভঙ্গিমায় থাকা মূর্তিটির বাম হাত ভাঙ্গা। ডান হাতে একটি গোলাকার বস্তু ধরে আছে।

ননী গোপাল-২

বরুড়া থানা থেকে মূর্তিটি ময়নামতি জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। কালো পাথরের তৈরি। হামাগুড়ি ভঙ্গিমায় বাম হাত নিচের দিকে স্থাপিত ও ডান হাত ওপরের দিকে, যেন কিছু চাচ্ছে। মূর্তিটির বাম কান নেই। সংগ্রহকালীন ডান হাতের কব্জির ওপরাংশ বাম পা কোমর হাত আলাদা ছিল, যা পরে জোড়া লাগানো হয়। মূর্তিটির পরিমাপ ১৮ সে.মি. × ১৩ সে.মি।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর

কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার নারায়ণপুর গ্রামে শরাফত আলীর পুকুর খননকালে পাওয়া মূর্তিটি বরুড়া থানা কর্তৃক জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে ময়নামতি জাদুঘরে হস্তান্তর করা হয়। কালো পাথরের তৈরি মূর্তিটির পরিমাপ ৬৮.৫ সে.মি. × ৩৬ সে.মি.। মূর্তিটির চার হাত। মন্দিরাকৃতির চালচিত্রের নিচে পদ্মের ওপর ললিতাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখভাগের ডান হাত বরদ মুদ্রায় ডান পায়ের উরুর ওপর সংস্থাপিত। বাম হাতে একটি পাত্র। পেছনের ডান হাতে বিতর্ক মুদ্রায় জপমালা এবং বাম হাতে একটি সনাল ফুটন্ত পদ্ম। তিনটি হাতের তালুতে চক্র আছে। একটিতে নেই। মাথার ওপর সর্প বাসকির ছত্র। মূর্তিটির মাথায় মুকুট, গলায় হার, কানে দুল, হাতে অঙ্গদ বালা ও বক্ষে যজ্ঞপোবীত বিদ্যমান। দুজন নারী পূজারী অঞ্জলি মুদ্রারত। রথের উভয় পাশে দুটি সিংহের প্রতিকৃতি এবং ডান পাশে আরও একজন অঞ্জলিরত পূজারীর প্রতিকৃতি রয়েছে। মূর্তিটির পেছনে উভয় পাশে মুক্তোর মালা মুখে রাজহংস ও এর ওপরিভাগে মালা হাতে উড়ন্ত বিদ্যাধরের প্রতিকৃতি রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন গঠনশৈলীর দিক থেকে মূর্তিটির সময়কাল আনুমানিক একাদশ শতক।

বিষ্ণু মূর্তি

চান্দিনা থানা থেকে ময়নামতি জাদুঘরে মূর্তিটি হস্তান্তর করা হয়। কালো পাথরের তৈরি। পরিমাপ ৭৯ সে.মি. × ৩৬ সে.মি.। ত্রিরত্নপাদীপঠের ওপরিভাগে ফুটন্ত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান। একটি মাথা ও চারটি হাত। চার হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মাথায় মুকুট। মাথার পেছনের ফলকে জ্যোতির্ময় বলয় (হ্যালোজ)। কানে দুল। বাহুতে অঙ্গদ। গলায় হার। বক্ষে যজ্ঞপবিত। ডান পাশে লক্ষ্মী। বাম পাশে স্বরসতী দণ্ডায়মান। বিষ্ণুর বাহন গরুড় ত্রিরত্ন পাদীপঠের মাঝখানে নতজানু ভঙ্গিতে অঞ্জলি দিচ্ছে। পাদপীঠের ডানে-বামে একজন করে পূজারী ছাড়াও মালা হাতে একজন ঋষি রয়েছে। স্বরসতীর বাম পাশে ঘোড়ার ওপর চক্রপুরুষ ও লক্ষ্মীর ডান পাশে শঙ্খপুরুষ উপবিষ্ট। শঙ্খ পুরুষের ওপরিভাগে বিষ্ণুর ডান পাশের ফলকে নরসিংহ ও বরাহ অবতারসহ চারটি অবতারের প্রতিকৃতি রয়েছে। বাম পাশে রাম ও বলরামের প্রতিকৃতিসহ্ আরও চারটি অর্থাৎ সর্বমোট ৮টি অবতারের প্রতিকৃতি রয়েছে। বিষ্ণুর মাথার উভয় পাশের ফলকে মালা হাতে দু উড়ন্ত বিদ্যাধরের প্রতিকৃতি আছে। কৌশাকৃতির ফলকের একদম ওপরিভাগে কীর্তিমুখ। নানা বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় এ মূর্তিটি নির্মাণশৈলীর দিক থেকে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর বলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধারণা করছেন।

অন্যান্য

লালমাই ময়নামতি এলাকার চিহ্নিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর বাইরেও মূর্তি বা ভাস্কর্য ব্যতীত অন্যান্য বস্তু যেমন : পোড়ামাটির ফলক, লোহার পেরেক, গুটিকা, অলংকারের অংশ, ঘরে ব্যবহৃত হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং প্রাচীনকালের ইতিহাস

লালমাই-ময়নামতির নয়নাভিরাম ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন কালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং এগুলোতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত তথ্য থেকে কুমিল্লা তথা বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা প্রাচীন ইতিহাস অংশে সেসব কথা বলেছি। গুপ্তদের শাসনামল থেকে শুরু করে মুসলমানদের আগমণের আগ পর্যন্ত প্রায় ৭-৮ শত বছর এখানকার ইতিহাস সুদীর্ঘ সময় ধরে মাটি চাপা পড়েছিল। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্নসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার সে ইতিহাসকে খণ্ডখণ্ড আকারে আমাদের কাছে উপস্থাপন করে।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, ইট ও প্রত্ননিদর্শন লুটেরাদের দৌরাত্ম, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে সামরিক অপতৎপরতা প্রভৃতি এখানকার সবরকম প্রত্নসম্পদকে পাওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সবগুলো প্রত্ন এলাক'য় খনন কাজও

সমাপ্ত করা যায়নি। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ থেকে যেমন জাতি বঞ্চিত হয়েছে তেমনি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও হাতের কাছে পায়নি। আজ প্রাচীন ইতিহাস কষ্টকল্প। তা সত্ত্বেও ইতিহাসের মহামূল্যবান অনেক উপাদান প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলোর মধ্যে জীবন্ত রয়েছে।

তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামের তিন নরপতি গুপ্ত সম্রাটদের আধিপত্য খর্ব করে এ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপচন্দ্রদেবকে বিতাড়িত করে ব্রাহ্মণ এক রাজবংশ সমতটে রাজত্ব করেন। ব্রাহ্মণ রাজবংশের উচ্ছেদ করে খড়গ রাজবংশের রাজারা প্রায় ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁদের তাম্রশাসন, মুদ্রা সে কথাই বলে। তাঁদের রাজধানী ছিল কুমিল্লা জেলার জয়কর্মান্তবাসক যা পরবর্তীকালে বড়কামতা হিসেবে চিহ্নিত। তাঁদের সমসাময়িক সপ্তম শতকে আরও দুটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রী জীবধারণদের রাতবংশ এবং লোকনাথদের নাথ বংশ। নালন্দার মহাস্থবির গুরু শীলভদ্র রাতবংশেরই সন্তান বলে অনেকে মনে করেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে 'শ্রীভঙ্গালমৃঙ্গাঙ্কশ্য' উপাধিধারী দেব বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব অনেককাল এ অঞ্চল দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করেন। এর পর সমতট রাজ্য চলে যায় বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজাদের হাতে। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী এ রাজারাও দশম ও একাদশ শতাব্দীতে প্রায় ১৫০ বছর স্বাধীনভাবে সমতট শাসন করেন। পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র। চন্দ্রদের উদ্ভব রোহিতগিরি থেকে। এ চন্দ্রবংশের রাজাদের সঙ্গে আরাকানের সমসাময়িক চন্দ্র রাজাদের গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা মুদ্রাগুলো থেকে জানা যায়। দু' চন্দ্রবংশের রাজাদের নিয়ে বহু কিংবদন্তী ও উপকথা চালু আছে। চন্দ্র রাজারা শুধু সমতট নয়, বঙ্গ, শ্রীহট্ট ইত্যাদি স্থানও দখল করে নেন। পাল রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাঁদের। পাল রাজাদের ও প্রাক্‌জ্যোতিষপুত্রদের (রাজাদের) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাম্রশাসন থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশের রাজত্বকালেই পালবংশের রাজাদের অধীনে সমতট কিছুকাল শাসিত হয়েছে। মহীপাল ও গোপালের তাম্রশাসন থেকে একথা জানা যায়। চন্দ্র রাজাদের পর 'বর্মণ' উপাধিধারী এক গোড়াব্রাহ্মণ বংশ সমতট শাসন করেন। এ বংশের রাজা জাতবর্মণ। তিনি যুদ্ধে কৈবর্তরাজ দিব্যকে পরাজিত করেন এবং দুর্বল পালদের নিকট থেকে ভাগলপুর বিহার অধিকার করে পূর্ববঙ্গে একক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সমতটে তাদের রাজত্বকাল সম্ভবত একাদশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধ। পাল ও বর্মণদের পরে সেনবংশের রাজারা সমতটে রাজ্য বিস্তার করেন। তাম্রশাসন থেকে তাঁদের রাজ্যবিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। আরও পরিচয় পাওয়া যায় পট্টিকেরা রাজ্য ও রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেবের।

দামোদরদেবের আদাবাড়ি তাম্রশাসন থেকে পট্টিকেরায় আর এক দেব বংশের রাজত্বের কথা জানা যায়।

প্রাচীনকালে পট্টিকেরা রাজ্য নিয়ে নানা কাহিনী-উপকাহিনীর জন্ম হয়েছে। রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের পট্টিকেরা নগরী লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ের নিকট বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। তাম্রশাসনের বাইরেও এ রাজ্যের কথা জানা যায়। একাদশ শতকের পুনর্লিখিত গ্রন্থ (নিশ্চয়ই এটি আরও অনেক আগে লিখিত) 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'য় পট্টিকেরার কথা বলা আছে (পট্টিকেরে চুণ্ডাবরা ভবনে ভবনে চুণ্ডা)। লামা তারানাথের বই ছাড়াও বার্মার ইতিহাস গ্রন্থ 'হানান' এর বহুস্থানে পট্টিকেরা রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে রাজা অনুরথের (১০৪৪-১০৭৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় কালরাজ্য (বিদেশী রাজ্য) পট্টিকেরা অবস্থিত। পট্টিকেরা রাজ্যের রাজকুমার এবং বার্মার রাজা ক্যানঝিল্বার (১০৮৪-১১২২ খ্রিস্টাব্দ) কন্যা সুয়েণথির প্রণয় উপাখ্যান এখনও লোকজনের মুখে মুখে। পট্টিকেরা রাজকুমারের জীবননাশ যে করুণ ট্রাজেডির সৃষ্টি করেছে তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে বর্মী ভাষায় বহু কাব্য ও নাটক। এসব নাটক এখনও বার্মায় মঞ্চায়িত হয়। রাষ্ট্রের স্বার্থে পট্টিকেরা রাজকুমারের জন্য সুয়েনথির প্রেম বিসর্জন দিতে হলেও তাঁর পুত্র অলংসিথু পট্টিকেরার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। অর্থাৎ পট্টিকেরার রাজাদের সাথে বার্মার রাজাদের সম্পর্ক পারিবারিক পর্যায়ে পৌছেছিল। বার্মা ও আরাকানের ইতিহাসে এ নিয়ে অনেক কাহিনী আছে (পট্টিকেরার ইতিহাস অংশ দ্রষ্টব্য)।

শালবন বিহারে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে পট্টিকের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। তখনকার বাংলাদেশে রৌপ্য মুদ্রা ছিল দুর্লভ মুদ্রা এবং তা স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে বেশি দামী ছিল।

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে খননের ফলে চারশরও বেশি মুদ্রা পাওয়া গেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও এসব মুদ্রার মধ্যে অংকিত আছে সিলমোহর, স্থানের নাম, প্রাণীর ছবি, চন্দ্র-সূর্যের ছবি, ধর্মচক্রের সিল। এসব থেকে ধর্ম বিশ্বাস এবং সামাজিক জীবন চিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য জানতে পারা গেছে। তাম্রশাসনগুলোতেও একই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। আব্বাসীয় মুদ্রা প্রাপ্তির বিষয়টি আরবদের সঙ্গে সমতটের অধিবাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে দেয়। এতে ধারণা করা যায় এ বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরব শাসকদের সঙ্গে এখানকার শাসকদের সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করেছিল।

ময়নামতি অঞ্চলে খননকার্যের সময় ব্রোঞ্জের মূর্তি, ব্রোঞ্জের স্তূপ প্রতিকৃতি ব্রোঞ্জের ঘন্টা, ব্রোঞ্জের ভাঙ্গা অংশ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্পবোধ, সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে।

বেলে পাথর এবং কালো পাথরের প্রচুর ভাস্কর্য (মূর্তি) পাওয়া গেছে। বেলে পাথরের মূর্তিগুলো অনেক প্রাচীন। অর্থাৎ কালো পাথর বা কষ্টি পাথরের মূর্তির আগের যুগের। তবে বেলে পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে হাতে গোনা কয়েকটি। বিহারের রাজমহল পাহাড়ে পাওয়া যেত কৃষ্ণ বর্ণের কষ্টি পাথর। পন্ডিতেরা মনে করেন তা ব্যয়সাপেক্ষ ছিল বলে এ পাথরের পরিবর্তে আমাদের শিল্পীরা ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের সহজলভ্য বেলে পাথরের ওপর পরীক্ষামূলকভাবে শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছিলেন। সম্ভবত ক্ষীণ ভঙ্গুর ও মজবুত না হওয়ায় তাঁদের এ প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। পরিণামে কালো (কষ্টি) পাথরের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। এসব মূর্তি-ভাস্কর্যে ধর্ম চেতনার পাশাপাশি সমসাময়িক ধর্মকেন্দ্রিক জীবন চিত্র এবং মন্দিরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি উঠে এসেছে সময়কাল এবং মানুষের অর্থনৈতিক জীবনচিত্র।

খননের ফলে পাওয়া গেছে মাটির সিলমোহর এবং নিবেদন স্তূপ। নিবেদন স্তূপগুলো থেকে স্তূপস্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নলাকার ড্রাম, চতুষ্কোণ হারমিকা ও সূচাঁলো চূড়া বিশিষ্ট নিবেদন স্তূপগুলোর ভেতরে পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্ত্রযুক্ত সিল ও অস্থি ধাতু। এছাড়া রয়েছে ধর্মচক্রের সিল। এসব সিল লেখার ও নিবেদন স্তূপ থেকে ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ধর্মীয় সমাজ শাসন তথা ধর্ম সংস্কৃতির কলাকৌশলগত দিকটি অনাবৃত হয়।

সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে পোড়া মাটির চিত্রফলক। এগুলো তৎকালীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পোড়ামাটির ফলকে লোকজ শিল্পীরা তাঁদের সমসাময়িক কালের পরিচিত প্রায় সকল চিত্রই তুলে ধরেছেন। তাঁদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা, হাসি-তামাশা, ধর্মীয় বোধ, শ্রদ্ধা ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র হিসেবে এগুলো তুলনাহীন। এ ফলকচিত্রগুলোর আঙ্গিকে পাহাড়পুরসহ অন্যান্য বিহারগুলোতেও পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হয়েছে।

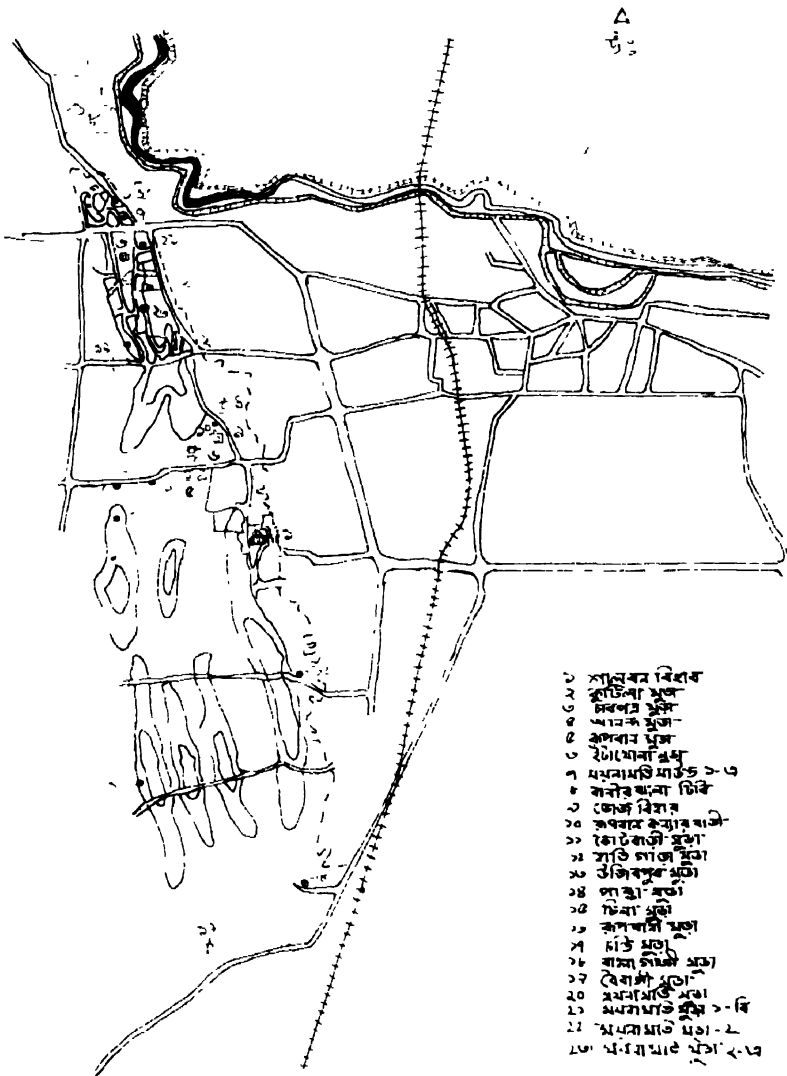
ময়নামতি খননের ফলে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের বহু মাটির হাঁড়ি-পাতিল এবং নিত্যব্যবহার্য নানা রকম জিনিষপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব হাঁড়ি-পাতিল থেকে ব্যবহারিক জীবনের একাংশের ধারণা পাওয়া গেলেও তার মধ্যে আছে জীবন ব্যবস্থার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রুচিগত বৈশিষ্ট্যের দিক। মাটির হাড়ি-পাতিলের ওপরে থাকা লিপি থেকে এগুলোর সময়কালও সহজে জানা যায়। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ নির্মিত আংটি, কানের দুল ও হাতের বালা প্রভৃতি অলংকার, রৌপ্য খণ্ড, লোহার পেরেক, কড়া, বড়শী নানা প্রকার খনন যন্ত্র, দা, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদিও রয়েছে। এসব জিনিসপত্রের মধ্যে তৎকালীন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে। ময়নামতি খননের ফলে অশ্মীভূত কাঠের নির্মিত প্রত্নপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র ছুরি, বাটালী প্রভৃতি পাওয়া গেছে, যাঁদের সময়ে এগুলো

পাওয়া গেছে এঁরা নিশ্চয় এগুলো ব্যবহার করতেন না। অত্যন্ত প্রাচীন প্রাক-ঐতিহাসিক কালের একএকটি সামগ্রী সম্ভবত এঁরা আজকের আমাদের মতোই সযত্নে সংগ্রহ করে রাখতেন।

ময়নামতি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার তৎকালীন রাষ্ট্র, শাসন ব্যবস্থা, ধর্মীয় বোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর প্রভূত আলোক সম্পাত করেছে। এ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেই ময়নামতি অঞ্চলের প্রায় ৭/৮ শত বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক (বাণিজ্যসহ) জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাচীন কালের বাঙালির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় যথার্থই বলেছেন, ময়নামতির খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও বিভিন্ন মুদ্রা বাঙালির ইতিহাসকে নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করেছে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। আর এ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভাবনায় খননকাজে তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি যেসব নিদর্শন চুরি গেছে বা হারিয়ে গেছে সেগুলো উদ্ধার জরুরি হয়ে পড়েছে।

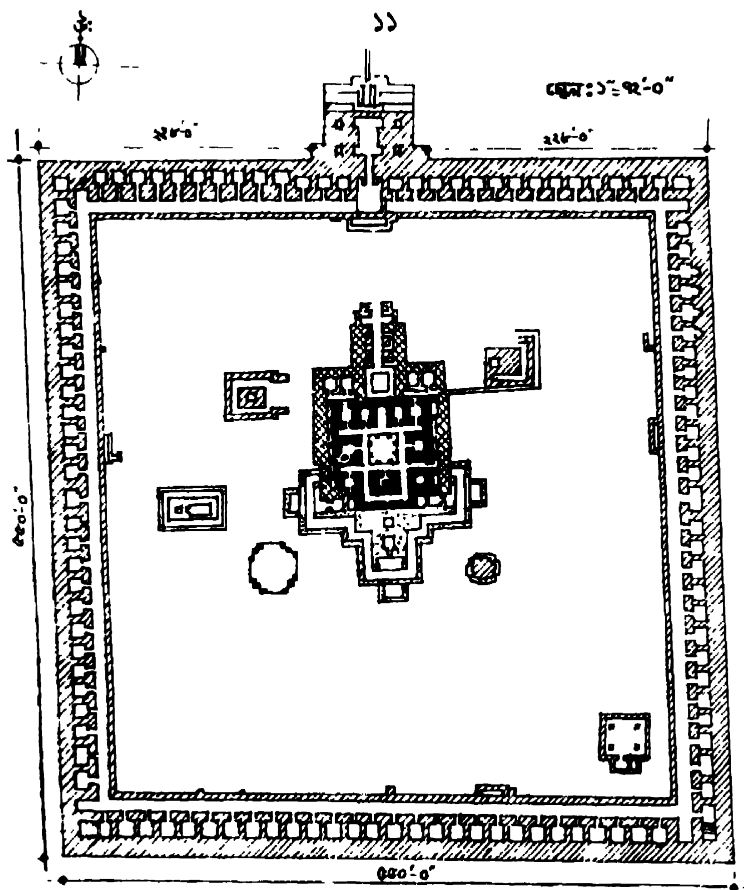
১. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭, ।
২. ময়নামতি-লালমাই, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, পৃ ১২।
৩. Bangladesh Archaelogy. 1979, P 141-143, Two Mainamati Copperplate Inscriptions of the Khadya and Early Deva Times- M.R Kamalakanta Gupta
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯।
৫. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশে প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, পৃ. ৫৩১।
৬. লড়হচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক) Prodcedings of the Indian History Congress, Aligarh,1960. Pasti.p.36ff Pakistan Archaeology, Karachi 1966 3pp 22-55; SED.P 45ff and p.69ff.
৭. A.F Khan and AH Dani "Excavations on Mainamati Hills near Comilla" in farther Eceavations in East Pakistan Mainamati, 1956 P 20 f
৮. R.C Majumdar, History of Ancient Bengal, 1974, Calcutta, P. 199-206
৯. ড. নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীব ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৩১।
১০. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, বাংলাদেশেব প্রত্নসম্পদ, পৃ. ৫৩৪।
১১. শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮, বাং, পৃ. ৬৭৮।
১২. এ লিপির পাঠ ও অনুবাদ শ্রীরর্ণজিত কুমার শর্মা রচিত 'দক্ষিণ বঙ্গের পাল শাসক কে' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।
১৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, পৃ. ৫৪৮।

নক্‌শা সূচি

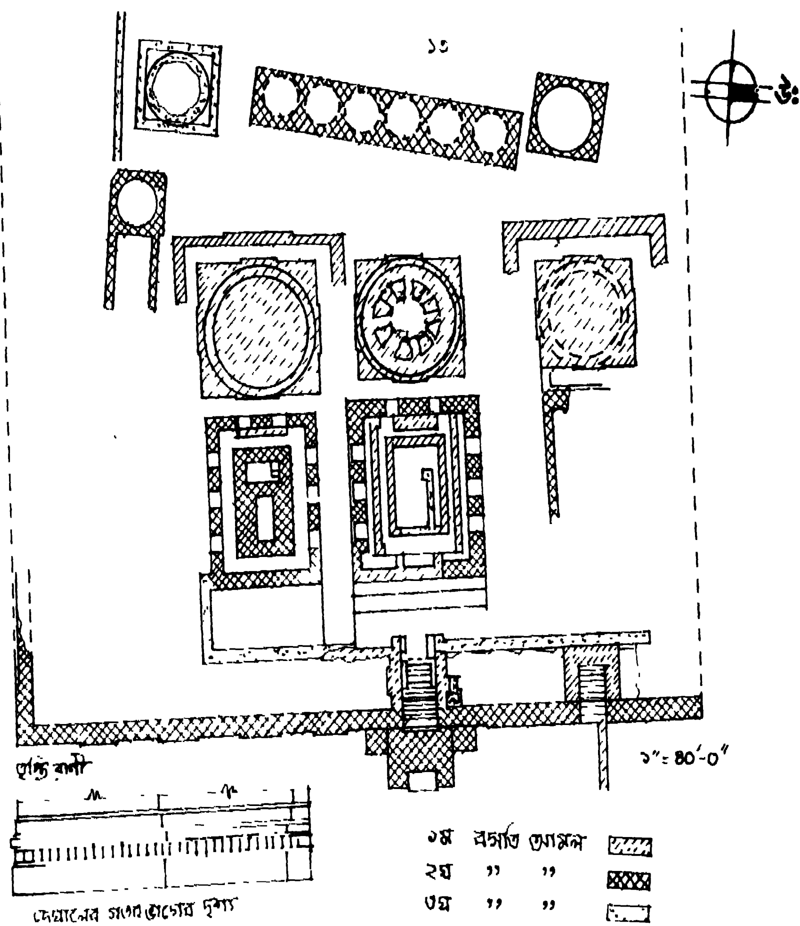


১. পুরাকীর্তির অবস্থান দেখিয়ে লালমাই-ময়নামতি

১১



২. শালবন বিহার, ভিত-নকশা



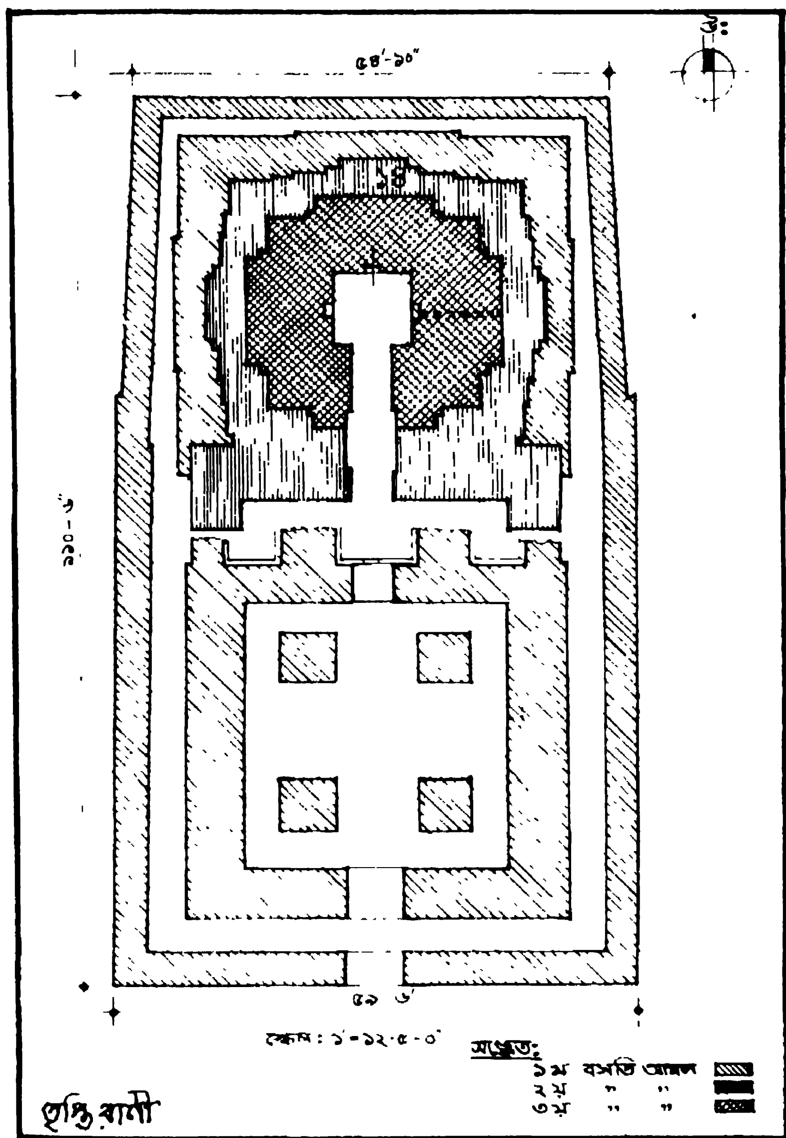
৩. ভূমি নকশা, ময়নামতি, কোটিলামুড়া



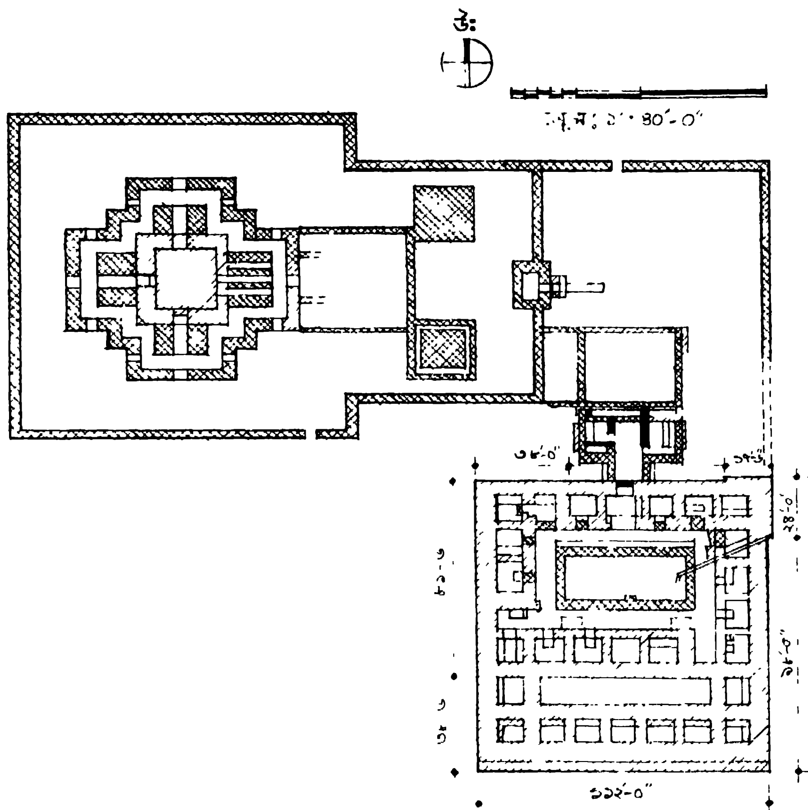
৪. আকাশ থেকে ধারণকৃত শালবন বিহারের আলোকচিত্র



৫. ত্রিরত্ন স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

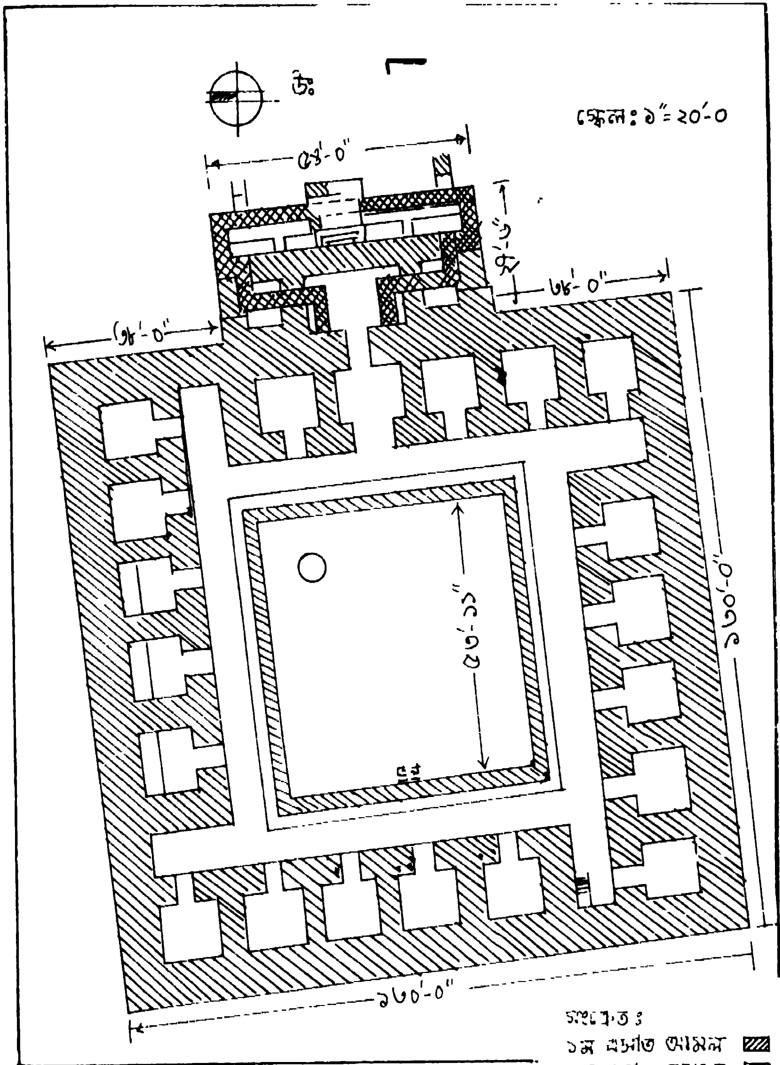


৬. চারপত্র মুড়ার নক্শা

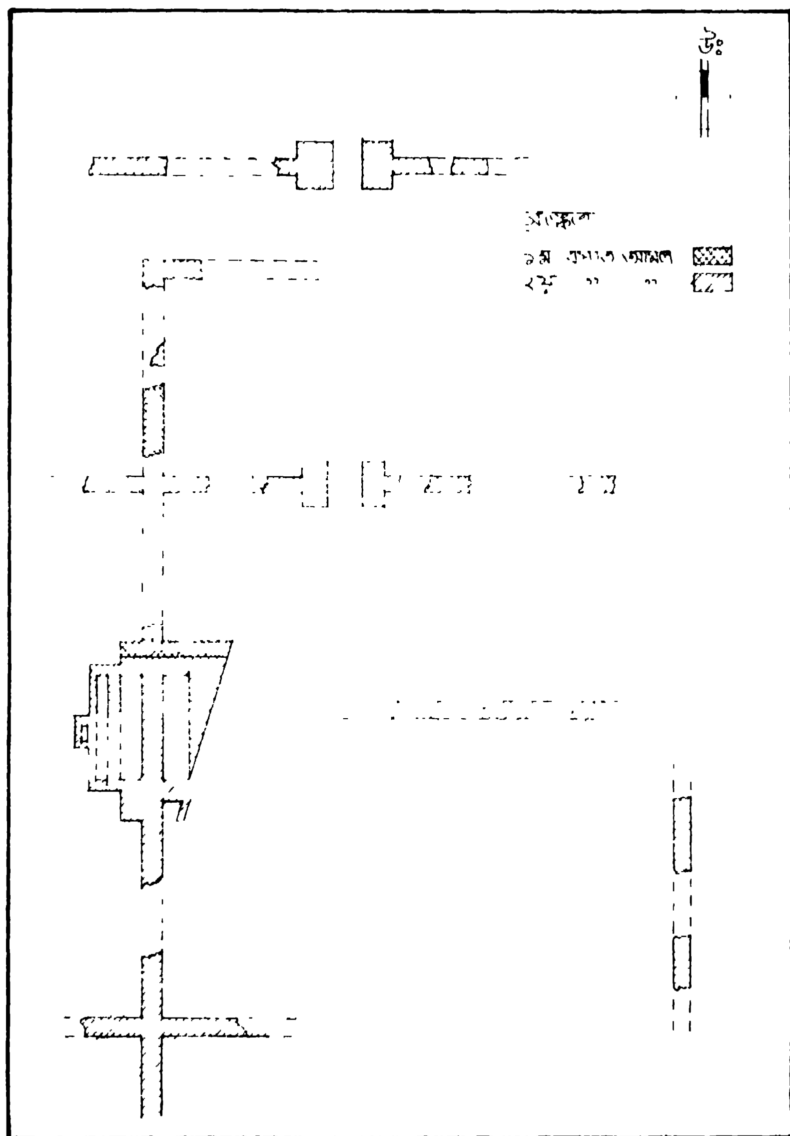


সংকেত ঃ
১ম বসতি আমল
২য় বসতি আমল
৩য় বসতি আমল

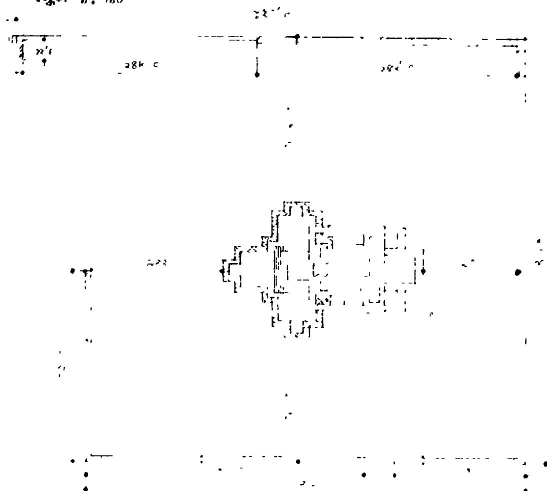
৭. রূপবান মুড়া, ভিত-নকশা



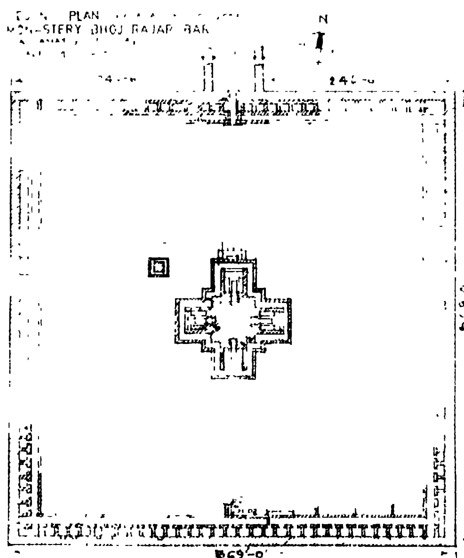
৮. ইটাখোলা বিহার, ভিত-নকশা



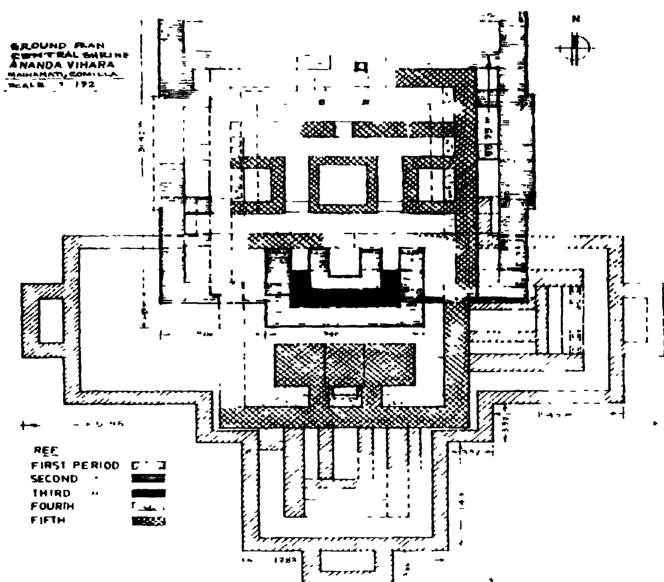
৯. ভিত-নকশা, ময়নামতি ঢিবি



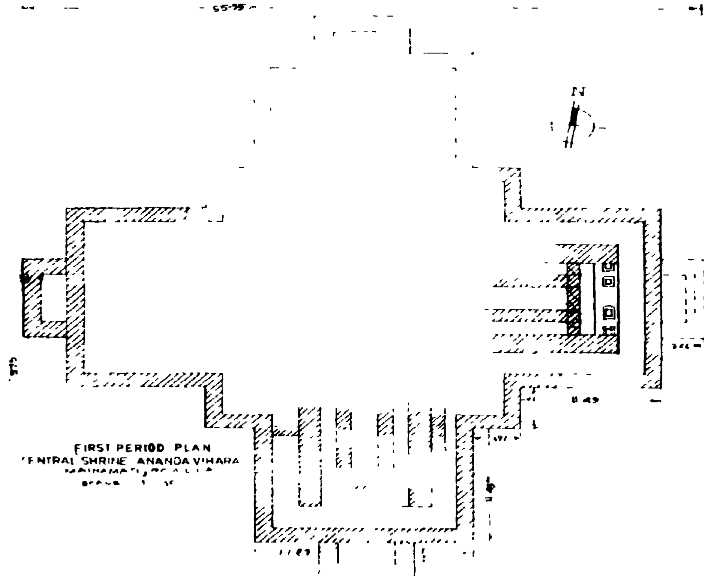
১০. বাণীর বাঙলো মন্দির, ভিত-নকশা



১১. ভোজ রাজার বাড়ির ভিত-নকশা



১২. আনন্দ বিহারের ভিত-নক্‌শা



১৩. আনন্দ বিহারের ভিত-নক্‌শা – প্রথম নির্মাণ যুগ

ECOND PERIOD PLAN .
NTRAL SHRINE,ANANDA VIHARA
COMILLA,

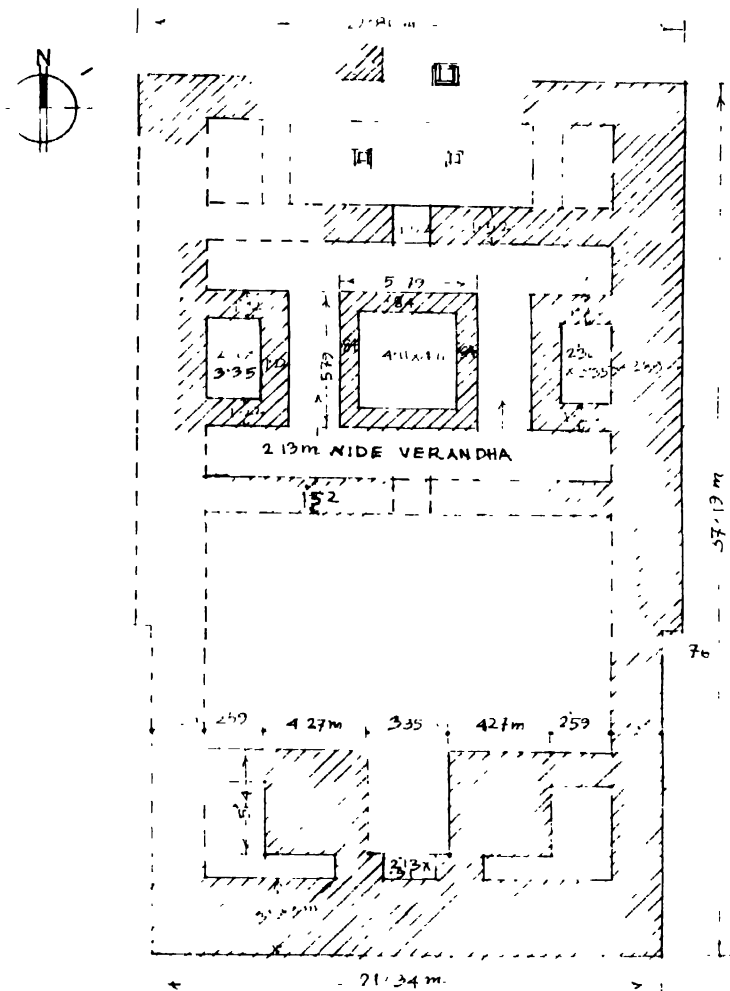
১৪. আনন্দ বিহারের ভিত-নক্শা – দ্বিতীয় নির্মাণ যুগ

31·40 m

3·00 m 13 40 m 9 00 m

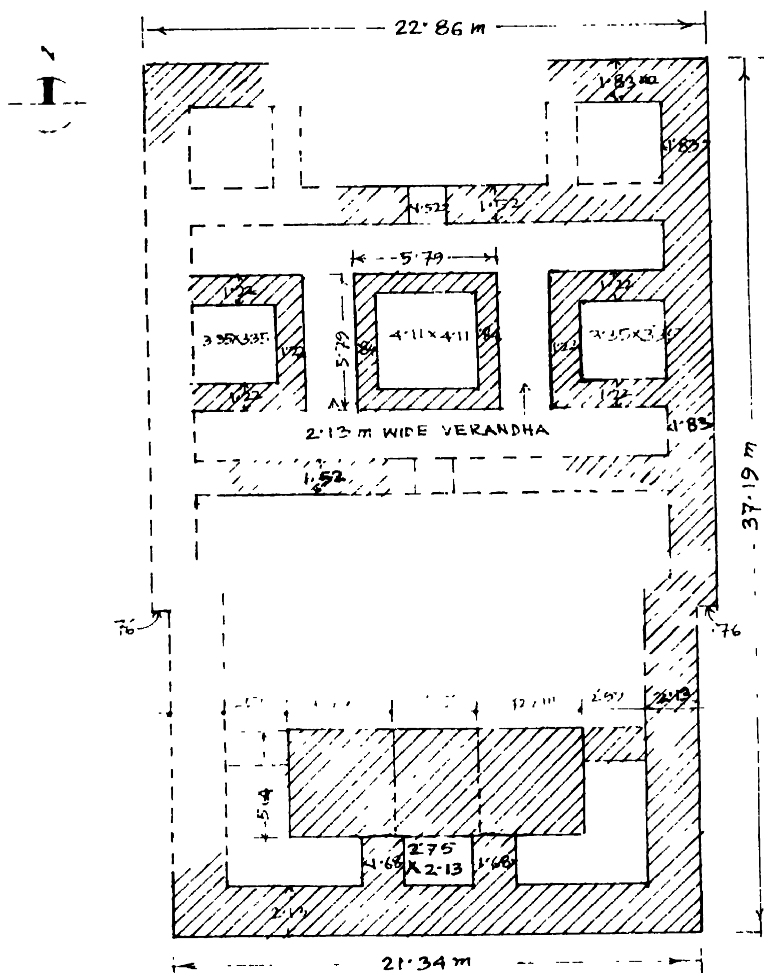
RD PER OD PLAN
NTRAL SHRINE ANANDA VIHARA

১৫. আনন্দ বিহারের ভিত-নকশা-তৃতীয় নির্মাণ যুগ



:RIOD PLAN
SHRINE ANANDA VIHARA
1 : 192

১৬. আনন্দ বিহারের ভিত-নক্‌শা – চতুর্থ নির্মাণ যুগ



F[illegible]TH PERIOD PLAN
[illegible]AL SHRINE, ANANDA VIHARA
[illegible]ATI, COMILLA

১৭. আনন্দ বিহারের ভিত-নক্‌শা – পঞ্চম নির্মাণ যুগ

চতুর্থ অধ্যায়
নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

প্রাচীন বঙ্গভূমির প্রান্তিক দেশ সমতট। সমকালীন ইতিহাসে পুরো বঙ্গভূমি জুড়ে চারটি জনপদের পরিচয় রয়েছে। রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং সমতট। প্রাচীন বাংলার মূল অধিবাসী কারা এবং এ বঙ্গভূমিতে কখন কারা বাইরে থেকে এসে আবাসভূমি গড়ে তুলেছে তা আজও গবেষণার বিষয়। কেননা এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন কালের ইতিহাস এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং প্রামাণ্য কোন দলিল না পাওয়ায় নানা রকম বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাংস্কৃতিক উপাদান, প্রাচীন বই-পুস্তক প্রভৃতিতে যৎসামান্য তথ্য পাওয়া গেলেও নৃতত্ত্বের বিষয়ে এরকম কোন দালিলিক কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক (জীবাশ্ম বা কংকাল) নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ধর্ম বিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক কারণে প্রাচীন মানবের অস্থি সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। মিসরের মমীর মত প্রাচীন বাংলা কিংবা সমতটে কোন রাজা বা প্রজার দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। তাই বাঙালির নৃতত্ত্ব নিরূপণের একমাত্র এবং প্রধানতম উপায় হচ্ছে বাংলাদেশের, আরও সংক্ষিপ্ত করে বললে সমতটের সমস্ত শ্রেণী ও বর্ণের বিশেষ করে প্রত্যন্তশায়ী জনপদবাসীদের রক্ত এবং দেহ গঠনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। রক্ত পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ করে ডি.এন.এ টেস্টের মাধ্যমে বর্তমানে উত্তরাধিকার নিরূপণ করা হয়। দেহ গঠনের বিশ্লেষণের মধ্যে নরমুণ্ড, নরকপাল, নাসিকার পরিমিতি, কপাল ও নাসিকার পরস্পর অনুপাত, চুল, চোখ ও চামড়ার রং প্রভৃতি নিরীক্ষা করে দেখা হয়। পাশ্চাত্য বিশ্বে বিশেষ করে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় দেহ-গঠনতান্ত্রিক বিশ্লেষণ বেশ অগ্রসর। জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার গায়ের চামড়ার উপাদান বৈশিষ্ট্য, কেশমূল, কেশ বৈশিষ্ট্য, নখ বৈশিষ্ট্য হাত ও পায়ের তালু এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হচ্ছে। আমাদের দেশে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে নরমুণ্ড, কপাল ও নাসিকার পরিমিতি এবং পরস্পরের অনুপাত বিবেচনা পেয়ে আসছে। বাঙালির নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের পথিকৃৎ এইচ.এইচ. রিজলি। এরপর ফন আইকস্টেড, জে.এইচ. হাটন, বিরজাশংকর গুহ, খগেন্দ্রনাথ দত্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, শরৎচন্দ্র রায়, হারাণ চন্দ্র চাকলাদার, মীনেন্দ্রনাথ বসু, তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী, অতুল সুর প্রমুখ পণ্ডিতগণ নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে কিছু নতুন পরিমিতি গ্রহণ করেছেন। বর্তমান কালে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রসরের যুগে ডি.এন.এ পরীক্ষার মাধ্যমে কেউ কেউ অগ্রসর হচ্ছেন।

খুব সম্প্রতিকালে জার্মান এবং অস্ট্রিয়ার সীমান্ত এলাকায় বরফ আচ্ছাদিত এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। বর্তমানে তা অস্ট্রিয়ায় সংরক্ষিত আছে যদিও জার্মানি তার মালিকানার দাবী ছাড়েনি। তুষার মানব বলে কথিত সে মানুষটির মৃত্যুর কারণ এবং তার মৃত্যুর দিনে ভক্ষণ করা খাদ্য-বস্তু যা তার পেটে পাওয়া গেছে তা নিয়ে চমৎকার সব বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রসরমানতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে এই তথ্য-প্রযুক্তি এতটা অগ্রসর নয়। তাই আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়ার প্রক্রিয়াও বেশ জটিল। নৃতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভাষা বিশ্লেষণের সহায়ক দিকটিকেও বিবেচনায় আনা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে কোনও নৃগোষ্ঠীর ভাষা বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় সে ভাষায় ব্যবহৃত প্রাত্যহিক জীবনের মূল শব্দগুলো কিংবা বাক্‌ভঙ্গি, মানুষ বা স্থানের নাম অন্য কোনও নৃগোষ্ঠীর ভাষা থেকে গৃহীত বা উদ্ভূত তখন স্বভাবতই অনুমান করা চলে উভয় নৃগোষ্ঠীর মধ্যে একটি যোগাযোগ রয়েছে। যোগাযোগটি রক্তের সম্পর্কে কিংবা অন্য কারণেও হতে পারে। তবে রক্তের সর্ম্পক স্বীকার করে এক মুখ থেকে অন্য মুখে ভাষার বিস্তার লাভ ঘটে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আচার্য গ্রিয়ার্সন থেকে আরম্ভ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত খ্যাতিমান পণ্ডিতরা নৃতাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়গুলোর সম্পর্ক স্বীকার করে আর্যপূর্ব এবং দ্রাবিড় পূর্ব ভারতীয় নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং নৃতত্ত্ব নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করে গেছেন।

নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা ভারতীয় নৃগোষ্ঠীর যে পিরামিড তার প্রথম স্তরটি হচ্ছে নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটুজনদের। তাদের আদিবাস ছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কিংবা মালয় উপদ্বীপে। পণ্ডিতদের অনেকেই (হাটন, লাপিক, বিরজা শংকর গুহ প্রমুখ) মনে করেন আসামের অঙ্গামিনাগা, দক্ষিণ ভারতের পেরাম্ব-কুলম, আন্নামালাই পাহাড়ের কাদার ও পুলায়ানদের ভেতর এ নিগ্রোবটু রক্তপ্রবাহ স্পষ্ট। বিহার এবং বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে তাজমহল পাহাড়ের বাগদীদের মধ্যে, সুন্দরবনের মৎস শিকারিদের মধ্যে, ময়মনসিংহ এবং নিম্নবঙ্গের কোথাও কোথাও যে কৃষ্ণাভ ঘনশ্যামবর্ণ, প্রায় উর্ণাভকেশ, পুরো উল্টানো ঠোঁট, খর্বাকায় অতি চ্যাপটা নাকের লোক দেখা যায় ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে এরা নিগ্রোবটু রক্তেরই ধারক এবং বাহক। কিন্তু জার্মান পণ্ডিত ফন আইকস্টেড মনে করেন ভারতবর্ষে নিগ্রোবটুদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। নিম্নবর্ণের বাঙালি বা বাংলার আদিম অধিবাসীদের ভেতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি নৃতত্ত্ববিদরা তাদের নামকরণ করেছেন আদি-অস্ট্রেলিয় (Proto Australoid)।[১]

প্রাচ্য দেশের আদিম অধিবাসী অস্ট্রিক ভাষা-ভাষি লোকদের নৃতত্ত্বের ভাষায় প্রাক্-দ্রাবিড় আদি-অস্ট্রেলিয় (Proto Australid) বলা হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম

অধিবাসীদের সঙ্গে মিল থাকার কারণে তাদের এই নাম পরিচয়। আদি অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে দৈহিক গড়নের মিল ছাড়াও এদের রক্তের মিল রয়েছে। উভয়ের রক্তেই 'এ' এগ্লুটিনোজেনের ('A' Agglutinogen) শতকরা হার খুব বেশি।[২]

প্রাক্-দ্রাবিড় লোকদের দৈহিক গড়নের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকার এবং লম্বা থেকে মাঝারি। নাক চৌরা ও চ্যাপ্টা। গায়ের রং কালো। মাথার চুল ঢেউ খেলানো। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নিষাদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে এরা অনার্য, এদের গায়ের রং কালো, এদের আচার-ব্যবহার, ভাষা অদ্ভুদ ধরনের।[৩] প্রাচীন সাহিত্যের নিষাদরাই যে আদি অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর কোনো উপজাতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মনে হয় এই মূল জাতির এক শাখা দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং মেলেনেশিয়ায় যায়। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়। বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে তথাকথিত অন্তজ জাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক।[৪]

তবে কেউ কেউ বাংলার আদিবাসীদের আদি অস্ট্রেলিয় মানতে রাজি নন। তারা মনে করেন বাংলার আদিবাসীরা হচ্ছে ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীর মানুষ।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস উদ্ধৃত করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন, এদেশে আগে যাদের আদি অস্ট্রেলিয় বলা হতো এখন তাদের বলা হয় ভেড্ডিড।[৫] নৃতত্ত্ববিদ ম্যানচিপ হোয়াইট ভেড্ডিড নরগোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র এক নরগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেন। এরা মনে করেন ভেড্ডিডদের সঙ্গে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভেড্ডিডদের দেহের গড়ন মাঝারি ধরনের, তবে খর্বাকৃতির দিকে ঝোঁক বেশি। এরা ছিল দীর্ঘমুণ্ড, কপাল ছিল উন্নত। নাক ছিল লম্বা ও উঁচু। কিন্তু নাসারন্ধ্র ছিল বেশ প্রশস্থ। এদের ঠোঁট ছিল মাঝারি ধরনের, খুব পুরুও নয়, পাতলাও নয়। চিবুক ও চোয়ালের গঠন ছিল মাঝারি ধরনের। এদের গায়ের রং ছিল কালো থেকে বাদামী। তবে কালোরই প্রাধান্য বেশি। এদের মাথার চুলও ছিল কালো থেকে বাদামী এবং তা ঢেউ খেলানো। ম্যানচিপ হোয়াইটের মতে সুডোল গড়ন এবং অঙ্গসৌষ্ঠরের দিক থেকে এরা ককেশীয়দের কাছাকাছি।

ফন আইকস্টেডের মতে ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনটি নরগোষ্ঠীর রক্ত প্রবাহ উপস্থিত।

১. ভেড্ডিড বা ভেড্ডিও নরগোষ্ঠী : দক্ষিণ ভারতের ঘোষ কৃষৎ মেলিড এবং সিংহলের ভেড্ডারা তাঁর মতে এ জনগোষ্ঠীর মানুষ। তিনি গোলমুণ্ডা-নরগোষ্ঠীকে – যারা আদি অস্ট্রেলিয় তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করছেন না।

২. মেলানিড বা ভারতীয় মেলালিও – ফন আইকস্টেড গোলমুণ্ডা নরগোষ্ঠীকে দ্রাবিড় মেলানিড নরগোষ্ঠীর আত্মীয় বলে মনে করেছেন।

৩. ইন্ডিড বা ভারতীয় নরগোষ্ঠীর এখানে তিনটি শাখা দেখা যায় :

ক. ইন্ডিড আদি নর্ডিক

খ. উত্তর ইন্ডিড প্রাচ্য বা অরিয়েন্টাল

গ. ব্র্যাকিড যাদের আলপাইন বা আলপ্লোবিনারিয় মনে করা হয়।

দক্ষিণ ও মধ্য ভারত, উড়িষ্যা, বিহার, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে এদের বসতি ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বইটি প্রকাশ হয় ১৯৬০ সালে। ড. অতুল সুরের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস ২য় বার প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। এ বই থেকেই মনে হয় পণ্ডিতেরা বাংলার আদিবাসীদের আদি-অস্ট্রেলিয় জনগোষ্ঠীর লোক বলে নিশ্চিত হয়েছেন। বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্বে (চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১১) নীরহাররঞ্জন রায় নিজেও স্বীকার করেছেন দ্রাবিড় বা ভেড্ডিড নয়, আদি অস্ট্রেলীয়রাই হচ্ছে বাংলার আদি বাসিন্দা। শুধু তাই নয়, এ সংস্করণে তিনি ড. অতুল সুর রচিত বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৭) পড়ার পরামর্শ দেন। দ্রাবিড় ভাষা-ভাষি লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে বিধায় তাদেরকে মেডিটেরিয়ান নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের আকৃতি মধ্যম আকার, মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট এবং রং ময়লা। আদি মিসরীয়দের সঙ্গে তাদের মিল বেশি। আদি তান্নালুর অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতের সমাধিসমূহে তাদের নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। এরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে আসে।

কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন একটি সাধারণ প্রচলিত ধারণা এই যে, উচ্চ জাতির জনগণ ব্যতীত অন্য সকল অনুন্নত হিন্দু জাতির জনগণ ইন্দো-ইউরেশীয় নৃগোষ্ঠী বহির্ভূত অর্থাৎ অনার্য। ১৯০১ সালের লোকগণনার হিসেবে দেখানো হয়েছে সাবেক বঙ্গদেশের মোট হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা ৬২ ভাগ অনার্য উপাদান সম্ভূত।[৬] এর অবশ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। দ্রাবিড় ও আদি-অস্ট্রেলীয় অনার্য উপাদান বাঙালি নৃগোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতিতেও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তবে এতে দ্রাবিড় নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির উপাদান অপেক্ষাকৃত কম। দ্রাবিড়ভাষি জনগণের জীবনচর্চার বৈশ্য রূপটি বাঙালি চরিত্রে তাদের প্রভাবজাত। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠনে দ্রাবিড় ভাষাভাষির কিছু প্রভাব অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। তবে তা থেকে বাঙালি নৃতত্ত্বে দ্রাবিড়দের প্রাধান্য প্রমাণিত হয় না। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, বাংলা ভাষার গঠন, বাক্যরীতি, উচ্চারণ এবং শব্দ ভাণ্ডারে অবশ্য দ্রাবিড় প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ঐক্য কেবল বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় রয়েছে।[৭]

বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক ভাষার উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে অতি প্রাচীনকালে অস্ট্রিকভাষি নৃগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। আধুনিক বাঙালির জীবন চর্চায়ও অস্ট্রিক উপাদান কম-বেশি রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞারীরা মনে করেন কোলমুণ্ডাদের ভাষা, আসামের খাসিয়া ভাষা, বার্মার পালং, মালয় উপদ্বীপের সাকাই, স্যামাং, ফিলিপিন, সামওয়াং, বালি, জাভা প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের সদস্য। লেভি এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন প্রাচীন ভারতে ভারতীয় আর্য দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা বিকাশের পূর্বে ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল তা অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষাগোষ্টী জনগণের সৃষ্টি। তবে কেউ কেউ মনে করেন বঙ্গজনদের সমাজ সংগঠন, ভাষা ও সংস্কৃতিতে আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর অবদান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যতটা দাবি করেন তা অনেক বেশি কষ্টকল্পিত। উদাহরণস্বরূপ এরা বলেন বঙ্গদেশের কৃষি এবং ধান চাষ পদ্ধতি অস্ট্রিক ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর বলে এ দাবি সঙ্গত নয়। কারণ, সিন্ধু নদের উপত্যকায় কৃষি কার্যের প্রবর্তন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরেরও আগে।

এ ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। কারণ প্রত্ন-উদ্ভিদবিদদের ধারণা ভারতবর্ষে ধান ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের মাটিতে নানা জাতের বন্য ধান এমনিতেই জন্মাত।[৮]

ভারতের আর্য ভাষাভাষি লোকেরা দুটি নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত বলে নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন : আলপিয় (Alpine) এবং নরডিক (Nordic)। মাথার আকারের কারণে এ বিভক্তি। আলপিয়রা হ্রস্ব কপাল আর নরডিকরা দীর্ঘ কপাল জাতি। মালভূমিতে বসবাস করার কারণেই আলপিয়রা মধ্যম আকার। ছোট্ট মাথার খুলি, লম্বা নাক, গোল মুখ ও ফর্সা রঙের অধিকারী। মনে করা হয় তাদের একটি দল এশিয়া মাইনর থেকে পশ্চিম সাগরের পূর্ব উপকূল ধরে বাংলা ও উড়িষ্যায় আসে। কেউ কেউ মনে করেন এরা দ্রাবিড়দের অনুসরণ করে আসে। অন্যদিকে নরডিকরা ছিল উত্তর এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসী। তাদের একটি অংশ অনুমান ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পঞ্চনদের উপত্যকায় অগ্রসর হয়। ভারতের জনসমাজের মধ্যে নরডিক উপাদান পূর্ব দিকে বারানসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্বে আলপিয়দের উপাদানই বেশি।

বাঙালি সংকর বা মিশ্র জাতি এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে উচ্চ শ্রেণীর বাঙালিরা হচ্ছে আর্য ভাষাভাষি আলপিয় নরগোষ্ঠীর লোক। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে (অষ্টম শতাব্দীতে রচিত) বলা হয়েছে বাংলাদেশের আর্যভাষা-ভাষি লোকেরা অসুরজাতিভুক্ত। অনেকে মনে করেন অসুর বলতে আর্য-পূর্ব যুগের দেশজ অধিবাসীদের বুঝায়। বৈদিক সাহিত্যে অসুরদের কথা উল্লেখ আছে। কৈশিক সাহিত্যে দাস, দস্যু, নিশাত ইত্যাদি দেশজ জাতিরও নাম আছে। কেউ কেউ মনে করেন আর্য এবং অসুররা একই স্থান থেকে

ভারতবর্ষে এসেছিল। আর্যদের কেউ কেউ অসুরের আরাধনাও করেছেন। বৈদিক আর্যদের কারো কারো কাছে অসুর দেবতার নাম। তবে অসুরের প্রতি নিন্দাবাদই বেশি। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অসুরকে বহু জায়গায় কটাক্ষ করা হয়েছে। অনার্য দেবতা হিসেবেও অসুর পূজিত হয়েছেন। ত্রিপুরাসুরের নাম আমরা জানি। তবে সাধারণ্যে অসুর আজও অপশক্তির প্রতীক। রিজলি বাংলার অধিবাসীদের অর্থাৎ বাঙালিদের মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বাঙালি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী মগ, বাকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জলপাইগুড়ি ও রংপুরের কোচদেরকে একই পর্যায়ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা যেহেতু বিস্তৃত শিরোস্কতা ও বিস্তৃত নাসিকা যথাক্রমে মঙ্গেলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং তা বাঙালিদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় সেহেতু এরা মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভুত। ১৯১৬ সালে রমাপ্রসাদ চন্দ্র Rizly-র মতবাদকে ভুল বলে আখ্যায়িত করেন। পরে ড. বিরজাশঙ্কর গুহ এই মতকে প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গোলীয়রা বাংলাদেশের মৌলিক আদিবাসী নয়। এরা ইন্দো-চীন নামক মঙ্গোলীয় পর্যায়ের অন্তর্গত। কয়েকশ বছর আগে এরা আরাকান থেকে পূর্ব দিকে সরে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তাদের চেহারা ও দৈহিক গড়ন বাঙালিদের মতো নয়। তাদের নামও অবাঙালি নাম। কয়েকশ বছর আগে আসলেও কুমিল্লায় প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জাতির গোষ্ঠীর ত্রিপুরারা ময়নামতি ও লালমাই অঞ্চলে বসবাস করে। পীতকায় নৃগোষ্ঠীর লোক হচ্ছে মঙ্গোলীয়রা। এরা উত্তর মঙ্গোলীয়, দক্ষিণ মঙ্গোলীয় এবং আমেরিকান ইন্ডিয়ান এই তিন ভাগে বিভক্ত। এদের উপ-বিভাগও আছে। তাদের শরীরের গঠন বেশ শক্ত, মাথা গোলাকার চ্যাপ্টা, কপাল চ্যাপ্টা, চোখের রং বাদামী থেকে কালো। চোখ ছোট। ঠোঁট দুটি পুরু এবং বাইরে প্রসারিত। এদের গায়ের রং পীত থেকে বাদামী হয়ে যায়। এদের গায়ে লোম নেই বললেই চলে। মুখমণ্ডলে দাঁড়ি-গোফ অত্যন্ত কম। মাথার চুল শক্ত ও খাড়া। এদের কাঁধ ও বুক ভেড়া।

রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গার মতো কুমিল্লাও বারবার বিদেশীদের শাসনাধীনে গেছে। মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর লোক, তুর্কি, মোগল, আফগান, ইংরেজ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানীদের শাসনাধীনে গেছে। এতে নানা রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত মঙ্গোলীয়দের রক্তধারা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে বেশি।

এ.এন. চ্যাটার্জী বাঙালি কলেজ ছাত্রদের নৃগোষ্ঠী বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক নৃপরিমাপের বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে (১৯৪৮) সভাপতির ভাষণে বলেন, বঙ্গদেশের পাঁচটি প্রাচীন জনপদ অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টলা এবং কলকাতার ব্রাহ্মণ (৩০২৫), বৌদ্ধ (৭১৬), কায়স্থ (২৫৪০), অন্যান্য– হিন্দু (২১৯৮) ও মুসলমান (৯২৮) জনগোষ্ঠীর মোট ৯২৮১ জনের নৃপরিমাণ গ্রহণ করে পার্থক্য পাওয়া গেছে সামান্যই।[৯]

সারণী-৫ (চ্যাটার্জী)
বিভিন্ন জনপদে শিরাকৃতির বন্টনবিন্যাস

জনপদ	মোট সংখ্যা	খাটোদেহী দীর্ঘ শিরস্ক	খাটোদেহী মধ্যম শিরস্ত	খাটোদেহী বিস্তৃত শিরস্ক	মধ্যমদেহী দীর্ঘ শিরস্ক	মধ্যমদেহী মধ্যম শিরস্ক	মধ্যমদেহী বিস্তৃত শিরস্ত	দীর্ঘদেহী দীর্ঘ শিরস্ক	দীর্ঘদেহী মধ্যম শিরস্ক	দীর্ঘদেহী বিস্তৃত শিরস্ক
	(পরিমাপিত)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
রাঢ়	১১০১	২.৮	৬ ৬	৪.৯	১০.৮	২৮.২	১৮.৭	৬.৪	১২.৭	৮.৯
বরেন্দ্র	৫০৯	৩.১	৭.৫	৪.১	১১.৮	৩০.৮	১৯.৬	৪.৩	১১.০	৭.৭
বঙ্গ	২৩৯১	২.৫	৮.৪	৪.৯	১১.৫	২৭.৭	২০.৩	৪.৭	১২.৩	৭.৬
চট্টলা	৩১৬	৪.৭	৭.৯	৫.১	১৯.৩	২৫.৩	১৭.১	৬.৬	৮.৫	৫.৪
সমতট	৩৮৩৪	০.৯৫	৫.৬	৬.৩	৪.৮	২৭.২	২৬.৯	২.৭	১৩.৪	১১.৯
কলিকাতা	১১৩০	০.৫৩	৩.৫	৫.৩	৫.৫	২১.২	৩০.৪	২.৩	১৫.০	১৬.১
সমগ্র বঙ্গদেশ	৯২৮১	১.৮	৬.৪	৫.৫	৮.২	২৩.৯	২৩.৯	৩.৮	১২.৯	১০.৫

সারণী-৪ (চ্যাটার্জী)
নৃগোষ্ঠিবৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক সূচক

জনপদ	মুসলমান উচ্চতা (সেমি)	মুসলমান শিরাঙ্ক	অন্যান্য হিন্দু উচ্চতা (সেমি)	অন্যান্য হিন্দু শিরাঙ্ক	ব্রাহ্মণ উচ্চতা (সেমি)	ব্রাহ্মণ শিরাঙ্ক	কায়স্থ উচ্চতা (সেমি)	কায়স্থ দীর্ঘ শিরস্ক	বৈদ্য উচ্চতা (সেমি)	বৈদ্য শিরাঙ্ক
রাঢ়	১৬৬.৩	৭৮.৬	১৬৫.৯	৭৮.৭	১৬৬.৭	৭৯.৭	১৬৬.৯	৭৯.৮	১৬৬.২	৮০.৫
বরেন্দ্র	১৬৬.৪	৭৮.৭	১৬৬.৫	৭৯.৩	১৬৬.৪	৮০.১	১৬৬.০	৭৯.১	১৬৬.০	৭৮.৩
বঙ্গ	১৬৫.১	৭৯.৯	১৬৫.০	৭৯.৩	১৬৫.৯	৭৯.৫	১৬৫.৫	৭৯.৩	১৬৮.০	৭৯.২
চট্টলা	১৬৫.৪	৭৯.৭	১৬৫.০	৭৯.৭	১৬৪.৬	৭৭.৭	১৬৫.১	৭৭.২	১৬৪.১	৭৭.২
সমতট	১৬৪.৮	৮০.৩	১৬৫.৩	৮০.৩	১৬৭.৪	৮১.৩	১৬৬.৪	৮১.১	১৬৬.৩	৮০.২
কলিকাতা	১৬৬.০	৮০.০	১৬৭.৫	৮১.৬	১৬৮.০	৮১.০	১৬৭.৬	৮১.৪	১৬৯.২	৮০.৯
সমগ্র বঙ্গদেশ	১৬৫.৪	৭৯.৭	১৬৫.৭	৮০.০	১৬৬.৯	৮০.৬	১৬৬.৩	৮০.৩	১৬৭.৩	৭৯.৬

এই ছক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দৈহিক উচ্চতা ও শিরাকৃতিতে রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে উল্লিখিত পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনও তাৎপর্যময় পার্থক্য নেই। অন্যদিকে সমতটে তাৎপর্যময় তারতম্য লক্ষ করা যায়। ছকে দেখা যায় সমতটে বিস্তৃত শিরস্কতা সবচেয়ে অধিক এবং দীর্ঘ শিরস্কতা সর্বাপেক্ষা কম। যেমন দীর্ঘ শিরস্ক ৮.৪%, মধ্যম শিরস্ক ৪৬.২%, বিস্তৃত শিরস্ক ৪৫.১%। এই পার্থক্য বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদের মানুষদের সঙ্গে সমতটের মানুষদের পার্থক্য

সূচিত করে এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে এখানকার জনগোষ্ঠী আলাদা নৃবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ছকে দেখা যাবে এ নৃবৈশিষ্ট্য বা পরিমাপের সঙ্গে কলকাতার মানুষের খুব কাছাকাছির মিল রয়েছে। এর কারণ কি সম্ভবত অভিজাত্য?

কুমিল্লা অঞ্চলে বসবাসকারী আদি বাসিন্দারা কবে থেকে এখানে বসবাস করেছে এটি নিশ্চিত করে বলা শক্ত। তবে কুমিল্লার মানুষ কতটা প্রাচীন তার উত্তরে ধারণাগত কিছু তথ্য দেয়া যায়। এর জন্য আমাদের যেতে হবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। পৃথিবীতে নরাকার জীবের বিবর্তন ঘটে প্লায়োসিন যুগে। এর পরের যুগ প্লাইস্টোসীন। মানুষের আবির্ভাব এই যুগেই। প্লায়োসিন যুগের মানুষের কোনো কঙ্কাল আমরা উপমহাদেশে পাইনি। এ যুগের অণুনরজীবের কঙ্কাল এশিয়ার তিন জায়গায় পাওয়া গেছে : ভারতের শিবালিক গিরিমালা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা এবং চীনের চুংকিং প্রদেশে। এ তিনটিকে কিছু সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে যে ত্রিভুজ তৈরি হয় বাংলাদেশ তার কেন্দ্রে অবস্থিত। সুতরাং অণুনর জীবেরা সে যুগে বাংলাদেশের ওপর দিয়েই যাতায়াত করত এ অনুমান অসঙ্গত নয়। মনে করা হয় দেড় বিলিয়ন বছর বা তার কাছাকাছি সময় বাংলা ব-দ্বীপে মানুষের অস্তিত্ব ছিল।

প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের নরকঙ্কাল না পাওয়া গেলেও তাদের ব্যবহৃত পাথরের তৈরি হাতিয়ার থেকে অনুমান করা হয় সে যুগে এ অঞ্চলেও মানুষের বসবাস ছিল। বাংলাদেশের বহু স্থানে বাকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে এ অস্ত্র পাওয়া গেছে। এ অস্ত্র দ্বারা পশু শিকার করে এরা মাংস ভক্ষণ করতো।আড়াই লক্ষ বছর আগে মানুষ বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত হয়। এরা গুহায় বাস করতে শেখে। নিজের তৈরি পাথরের অস্ত্র দ্বারা পশু শিকার করতে শেখে। এরপর বহু বছর অতিক্রান্ত হয়। দশ থেকে পনের হাজার বছর আগে মানুষ ছবি আঁকতে শুরু করে। এ সময় থেকে নব্য প্রস্তর যুগের শুরু। তাদের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। আগের মানুষ যাযাবর হলেও বিশেষ বিশেষ জায়গায় এ সময়ের মানুষ বসবাস শুরু করে। কৃষি ও বয়নের উদ্ভব ঘটে, পশু পালন করতে শুরু করে। তবে পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের মতোই এরা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত এবং মৃত ব্যক্তির সমাধির ওপর লম্বা পাথর খাড়া ভাবে পুতে দিত। এ পাথরকে বীরকার বলা হতো। বাকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জায়গায় এরকম স্মৃতিফলক পাওয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদরা মনে করেন এটি আদি অস্ট্রেলিয় জাতির অনুদান।

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে কিছু আচার-অনুষ্ঠান এবং দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারেও আদিম যুগের মানুষের বসবাসের বিষয়টি নিশ্চিত করে। ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, আমাদের নানা আচারানুষ্ঠানে ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আজও ধান,

ধানের গুচ্ছ, ধান দুর্বার আশীর্বাদ, কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারিকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের ওপরে আঁকা প্রতীক চিহ্ন, নানা প্রকার আলপনা, গোবর, কড়ি প্রভৃতি অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। বস্তুত, আমাদের আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে যা কিছু সুষমাময় তার অনেকখানিই এই আদিবাসীদের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশ, বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায় বিবাহ ব্যাপারেই পানখিলি, গাত্রহরিদ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, খৈ ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দধিমঙ্গল প্রভৃতি সবই আদিবাসীদের দান বলে অনুমিত।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি বর্ধমান জেলার আউসগ্রামে অবস্থিত। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর মতো অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে এ পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। এখানে চারটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে করা হয় এখানে মানুষ বসবাস শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর আগে থেকে। 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থের গণনা অনুসারে ৬৫৩ কল্যাব্দে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভিষেক হয়েছিল। বর্তমানে (১৪১৪ বঙ্গাব্দ) ৫১০৮ কল্যাব্দ চলছে। সে হিসাব অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভিষেকের সময় ছিল ৪,৫৫৫ বছর পূর্বে বা খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ অব্দে। পুণ্ড্রবর্ধনের শেষ রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব এ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক এবং পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাসুদেবের সঙ্গে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজাদের অংশগ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ সালেই এ অঞ্চলে জনবসতির অস্তিত্ব ছিল।

এ যুগের লোকেরা কাঁকড়পেটা গৃহতল নির্মাণ করতো। চক্রে লাল-কালো ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করতো ও ধানের চাষ করতো। ধারণা করা হয় এক মহাপ্লাবন ঐ স্থান থেকে সাময়িক ভাবে লোকদেরকে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় যুগের নিদর্শন তাম্রাশ্মযুগের সভ্যতার বাহক। এরা সুপরিকল্পিত নগর ও রাস্তাঘাট তৈরি করতে পারতো। গৃহ কিংবা দূর্গ নির্মাণ করতে জানত। তামার ব্যবহার, কৃষি ও বাণিজ্যে অংশগ্রহণ তাদের অর্থনৈতিক ভাবে চাঙ্গা করে তুলেছিল। সুদৃশ কলস তাম্র তৈজসপত্রের ব্যবহার, মৃৎপাত্রের ওপর চিত্রাদি অঙ্কন তাদের আভিজাত্য ও সংস্কৃতি রুচিকে তুলে ধরে। এছাড়া ক্ষুদ্রাশ্ম ছুরিকা, হাড়ের আয়ুধ, তামার অলঙ্কার, পোড়ামাটির তপলী এবং শিমুল তুলা হতে বোনা চিকন শুভ্র বস্ত্র তখনকার ঐশ্বর্যের পরিচয়বাহী। কার্বন ১৪ পরীক্ষায় ২য় যুগের বয়স নির্ণিত হয়েছে ১০১২ + ১২০ বছর।

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে বসবাসকারী মানুষের তৃতীয় যুগ মৌর্যদের সময় থেকে। সমসাময়িক কালে ত্রিপুরায় বা এতদঞ্চলে লোকজনের বসবাসের কথা অনুমান করা যায় মাত্র।

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে খননকার্যে সময় শালবন বিহার ও আনন্দ বিহারে

প্রস্তর যুগের বহু অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গেছে। অশ্মীভূত কাষ্ঠ ও স্ফটিক শিলা নির্মিত এসব অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে আছে সংকীর্ণ হাতল বিশিষ্ট হাত কুড়াল এবং বাটাল। এগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ কী তদুর্ধ কালের বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। অশ্মীভূত কাঠের অস্ত্র থেকে ধারণা করা চলে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ হাজার বছর কিংবা তারও আগে এখানে লোক বসতি ছিল।

কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার অন্তর্গত গুনাইঘর গ্রামে মহারাজাধিরাজ বৈন্যগুপ্তের একটি তাম্রলিপি (৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) পাওয়া যায়। তা থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বৈদিক আর্যরা কুমিল্লা পর্যন্ত এসেছিলেন।'

১৯০৫ সালে গুপ্ত যুগের একটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার থানাই দহগ্রামে। তাম্রলিপিটি গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের (৪১৫-৪৫৫) আমলের। ১১৩ গুপ্ত সংবৎসরে অর্থাৎ ৪৩২-৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তা উৎকীর্ণ। তাম্রলিপিটি মূলত ভূমি দানপত্র।[১৩]

এর আগের নিদর্শনও অবশ্য আমাদের হাতের কাছে আছে। কুমিল্লা জেলায় উত্তর-পশ্চিম সীমারেখা থেকে মাত্র ১৫ মাইল উত্তরে নরসিংদীর রায়পুরা থানার অন্তর্গত ওয়ারী বটেশ্বর নামক স্থানে বহু প্রাচীনকালের অসংখ্য প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। অন্যান্য মূল্যবান প্রত্নবস্তুর মধ্যে এখানে ছাপযুক্ত ছাঁচে ঢালা হাজার হাজার মুদ্রা (punch Marked cast coins) পাওয়া গেছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। এ মুদ্রাগুলো যে মৌর্য যুগের এবং খ্রিস্ট জন্মের অন্তত ২০০ বছর আগের এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এছাড়া এ থেকে প্রমাণিত হয় এই পুরো অঞ্চল মৌর্যদের শাসনাধীনেই ছিল। তবে মন্দবংশীয় মৌর্যরা ছিলেন শূদ্রবংশজাত। এরা বৈদিক আর্য ছিলেন না বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এদের ওপর আর্য প্রভাব এসে গেলেও রক্ত ছিল ভিন্ন। গুপ্তদের শাসনামলেই আর্যরা যথেষ্ট সংখ্যায় কুমিল্লা অঞ্চলে আসে ও বসবাস শুরু করে। তাদের রক্তধারার প্রভাবও এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। তবে তা সীমিত পর্যায়ে। বাংলায় আর্যদের প্রভাব সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা কুমিল্লা অঞ্চলের জন্য তাৎপর্যবহ। তিনি বলেন, পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষি আদি নর্ডিক রক্ত প্রবাহ ও সংস্কৃতি তার ওপরের স্তরের একটি ক্ষীণ প্রবাহমাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালির জীবন ও সমাজ বিন্যাসের উচ্চস্তরেই আবদ্ধ। এই ধারা বাঙালির জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হতে পারেনি।[১৪]

১৯৮৭ সালের ২৬-২৭ ডিসেম্বর সুকান্ত একাডেমী দুদিনব্যাপী এক সেমিনারের আয়োজন করে। প্রথম দিনের সেমিনারে নরেন বিশ্বাসের প্রবন্ধের ওপর অন্যান্যের সঙ্গে ড. আহমদ শরীফ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমরা যদি এ কথা স্বীকার করার সৎ সাহস অর্জন করিয়ে আমাদের দেহে

শেষ-সৈয়দ-কোরেশীর রক্ত নেই, তুর্কী-মোগল-পাঠানেরও রক্ত নেই, আর্য রক্তও নেই– আমরা এদেশের এ মাটিরই সন্তান। আমরা যদি মানতে পারি যে আমরা শতকরা ৭০ ভাগ অস্ট্রিক ২৫ ভাগ মঙ্গোল এবং বাকি ৫ ভাগ হাবশি, তুর্কি, মোগল, আফগান, ইরানি, ইউরোপীয় ইত্যাদি শঙ্কর রক্তের এবং যদি উপলব্ধি করি যে অস্ট্রিক, মঙ্গোল, হাবশি, তুর্কি, মোগল আফগান, ইরানি সব আজ এক দেহে লীন এবং আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি যে আমাদেব দেব-দেবী, ধর্ম-চিন্তা এবং এগুলোর উৎস কোথায়, আদি কোথায় তাহলে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারব এবং অনেক সমস্যারই সমাধান সহজ হবে।[১৫]

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৩১।
২. ড. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, পৃ. ৪১।
৩. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃ. ৫৯।
৪. Teach yourself Anthropology by Manchip While, P. 58.
৫. বাঙালির ইতিহাস, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় (সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষিপ্ত রচনা), ১৯৬০ সং, ২য় পর্ব, পৃ. ৪৩।
৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা জেলা পরিষদ প্রকাশিত, পৃ. ২৫-২৬।
৭. ড. অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৮. A.H. Dani, Race and Cultural Cumpley in Bengal, Social Research in East Pakistan (December 1960), P. 96.
৯. A.N. Chatterjee, Presidential Address, 1948.
১০. S.K Chatterjee, Indo-Aryans and Hined (Ambedabad, 1942), P. 31.
১১. Pater smidt, Asiatic Society (1907), P. 187-191.
১২. Sylvin Levi, Asaticque (1907), P. 1923.
১৩. সমরপাল নাটোরের ইতিহাস, গতিধারা প্রকাশনী (জুলাই ২০০৭), পৃ. ১১।
১৪. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৩।
১৫. আহমদ শরীফ, ইতিহাসের আলোকে, সুকান্ত একাডেমী, মুক্তধারা ১৯৭৮, পৃ. ৪২।

বর্ণবৃত্তি

বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি এবং বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের মধ্যে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের আলামত দেখা গেলেও এইচ.এইচ. রিজলি, বিরজাশংকরগুহ, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ হাটন প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদদের বক্তব্যের মর্ম অনুসরণ করে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন, নমশূদ্র, ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির মধ্যে নরতত্ত্বের দিক হতে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর ভাষায়, এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নমঃশূদ্রের কথা বলতেই হয়, কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকদের সঙ্গে, নরতত্ত্বের দিক হতে এদের কোনো পার্থক্য নেই, একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের মতো এরাও মধ্যমাকৃতি, মুণ্ডের গঠন মাধ্যমিক এবং নাসা তীক্ষ্ম ও উন্নত; ইঁহাদের চোখ ও চামড়ার রঙও মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মতো, অথচ স্মৃতিশাসিত হিন্দু সমাজে এদের স্থান এত নিচে যে নরতত্ত্বের পরিমিতি গণনার মধ্যে তার কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যুক্তি হয়ত পাওয়া যাবে জাত সংঘর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।[১]

বর্ণ ও বৃত্তিভিত্তিক পরিচয়

বৈদিক গ্রন্থসমূহে চারটি বর্ণের কথা বলা আছে। বাংলাদেশের বেলায় প্রাচীনকালে দুটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। একটি ব্রাহ্মণ ও অন্যটি শূদ্র। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' গ্রন্থে এই পরিচয় জানা যায়। শূদ্ররা ছত্রিশ বর্ণে বিভক্ত থাকার কথা থাকলেও এই গ্রন্থের তালিকায় আছে ৪১টি বর্ণের কথা। তালিকাটি এরকম–

ক. উত্তম শংকর বা সৎশূদ্র (সংখ্যা-২০)

১. করণ-কায়স্থ (লেখক, অফিসের কাজে দক্ষ)
২. অম্বষ্ঠ (বৈদ্য, চিকিৎসা-বিদ্যা ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র চর্চায় নিযুক্ত)
৩. উগ্র (ক্ষত্রিয় বৃত্তি ও যুদ্ধ কর্মে নিয়োজিত)
৪. মাগধ (যুদ্ধকার্যে অনিচ্ছুক বিধায় চারণ ও বার্তাবাহক)
৫. তন্তুবায় (তাঁতী)
৬. গান্ধিক বণিক (গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়কারী বণিক, হাল আমলের গন্ধবণিক।
৭. নাপিত (নরসুন্দর)
৮. গোপ (লেখক)
৯. কর্মকার (কামার)
১০. তৌলিক (গুবাক বা সুপারি ব্যবসায়ী)

১১. কুম্ভকার (কুমার)
১২. কংসকার (কাঁসারী)
১৩. শাঙ্খিক বা শঙ্খকার (শাঁখারী)
১৪. দাস (কৃষি কাজে লিপ্ত চাষি)
১৫. বারজীবী (বারই, পান উৎপাদনকারী)
১৬. মোদক (মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী ময়রা)
১৭. মালাকর (ফুল উৎপাদনকারী মালী)
১৮. সূত (খুব সম্ভব সূত্রধর বা ছুতার)
১৯. রাজপুত্র (রাজপুত?)
২০ তাম্বলী (পান বিক্রেতা)

খ. মধ্যম-সংকর (সংখ্যা ১২)
২১. তক্ষণ (খোদাইকর বা সূত্রধর)
২২. রজক (ধোপা, শোভাসুন্দর)
২৩. স্বর্ণকার (স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারক)
২৪. সুবর্ণ বণিক (স্বর্ণ, মণিমুক্তা ইত্যাদি ব্যবসায়ী)
২৫. আভীর (আহীর, গোরক্ষক, গোয়ালা)
২৬. তৈলকার (তেলী, কলু)
২৭. ধীবর (মৎস ব্যবসায়ী, কৈবর্ত?)
২৮. শৌণ্ডিক (মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিতরণকারী, শুঁড়ি, সাহা)
২৯. নট (নৃত্য, বাজি, খেলা ইত্যাদি প্রদর্শনকারী)
৩০. শাবাক, শাবক, শারক, শাবার (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩১. শেখর (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩২. জালিক (মৎসজীবী জেলে বা জালিয়া)

গ. অধম সংকর বা অন্ত্যজ বর্ণ (সংখ্যা-৯)
৩৩. মলেগ্রহী (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩৪. কুড়ব (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩৫. চণ্ডাল (চাঁড়াল, বর্তমান নমঃশুদ্র)
৩৬. বরুড় (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩৭. তক্ষ (বৃত্তির উল্লেখ নেই)
৩৮. চর্মকার (চামার, মুচি)
৩৯. ঘট্টজীবী বা ঘন্টজীবী (খেয়াঘাটের রক্ষক, খেয়ামাঝি, পাটনী)
৪০. ডোলাবাহী (ডুলী বহনকারী, পালকী বেহারা)
৪১. মল্ল (বৃত্তির উল্লেখ নেই, বর্তমানে মালো?)

এগুলো ছাড়াও ম্লেচ্ছজাতীয় আরও কয়েকটি দেশী-বিদেশী কোমের নাম পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে : ১. পুককশ ২. পুলিন্দ, ৩. খস, ৪. খর, ৫. কম্বোজ, ৬. যবন, ৭. সুক্ষা, ৮. শবর ইত্যাদি।

প্রদত্ত তালিকা থেকে দেখা যায় তৎকালীন জাতিসমূহের উৎপত্তি তিনভাবে ঘটেছিল-

ক. বৃত্তিগত

খ. কর্মগত

গ. নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত।

আর্যদের আসার আগে বাঙালি সমাজে কোনো বর্ণবিভেদ ছিল না। সেখানে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল সেটি ছিল কৌমসমাজ। বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতি গোষ্ঠী সমাজ। সে সমাজের মধ্যে ছিল নানা বৃত্তিধারী মানুষ। চার বর্ণের বিভেদ ছিল না বলে আর্যরা প্রাচ্য দেশের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত। কৌম জাতির মধ্যে অন্যতম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ ও কৈবর্ত। পুণ্ড্রদের বর্তমান বংশধররা হচ্ছে পোদ ও কৈবর্ত জাতির বংশধর কর্বট। আর একটা কৌম জাতি ছিল বাগদী। প্রাচীন গ্রিক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায় মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগদীরাই রাঢ় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। 'মনুসংহিতায়' কৈবর্তদের বর্ণ সংকর বলা হয়েছে। বিষ্ণু পূরাণে এদের অব্রাহ্মণও বলা হয়েছে। কৈবর্তরা মূলত মৎস্যজীবী। পরে এরা কৃষি সভ্যতায় যুক্ত হয়। কৈবর্তদের কৃতীপুরুষ দিব্য পালদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করে। জনৈক কৈবর্ত কবি পপিপ কর্তৃক রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। আরেকটি জাতি বৃত্তিগতভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল সেটি হচ্ছে সদগোপ জাতির পূর্বপুরুষেরা। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রচলনে তাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গে তাদের প্রাধান্য লক্ষ্যযোগ্য ছিল। কেউ কেউ মনে করেন পাল ও সুর বংশের রাজারা সদগোপ ছিলেন। শিবশক্তির উপাসক ছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন বাঙলায় তন্ত্রধর্মের প্রচার তাদের দ্বারাই হয়েছিল। এরা কেউ কেউ পালদের সামন্ত রাজাও ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ। দধি বিক্রির বৃত্তি থেকে এই নাম তা সহজে অনুমেয়। এছাড়া মল্ল বলে আর এক অন্তজ জাতির পরিচয় পাওয়া যায় বৃহদ্ধর্মপূরাণে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁইপ্রথার প্রচলন ছিল। এরাই পরবর্তীকালে ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি উপধিতে ভূষিত হন। ভূমিদান সম্পর্কিত তাম্রপট্টলিপি থেকে আমরা ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের অনেকগুলো উপাধি পাই। যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, সেন, ঘোষ, দেব, কুন্ডু, পালিত, নাগ, চন্দ্র, ধাম, বিষ্ণু, যশো, শিব, রুদ্র ইত্যাদি। এসকল উপাধি বর্তমানে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিরা ব্যবহার করলেও সে সময় স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে কায়স্থদের উদ্ভব ঘটেনি। প্রাচীন গ্রন্থ থেকেও আমরা জানতে পারি প্রথমে কায়স্থ এক বিশেষ বৃত্তিধারী

গোষ্ঠীর নাম ছিল, কোনো বিশেষ জাতির নাম নয়। কোনো কোনো তাম্রপট্টলিপিতে প্রথম কায়স্থ জ্যেষ্ঠ কায়স্থ প্রভৃতি রাজকীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কর্মচারীদের মধ্যে নগরসৃষ্টি, সার্থবাহ ও ব্যাপারী নামের উল্লেখ আছে। এরা কিন্তু বৈশ্য নয়। তখনকার অনুশাসনে অন্যান্য রাজকর্মচারীদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় এরা 'প্রতিবেশী', 'ক্ষেত্রকার' (ভূমিকর্ষক) প্রভৃতি। অনুশাসনে নিম্নকোটির অন্ত র্ভুক্ত যাদের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অন্যতম মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল। চর্যাপদে আছে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিকের কথা। ডোমদের বৃত্তি ছিল ঝুড়ি-ঝুপড়ি ইত্যাদি তৈরি করা এবং নাচ গানে এরা পারদর্শী ছিলেন। অন্যদের পেশার পরিচয় পাওয়া যায় না।

সেন রাজাদের সময় বিশেষ করে বল্লালসেনের সময় কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন ও বিস্তার লাভ করে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত পূজা-অর্চনাদি ও যাগযজ্ঞ-সম্পাদনে এরা ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পুনরায় ঘটে। এরা স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের অনুশাসন অনুযায়ী বিধান দিতে থাকেন এবং এই সকল বিধান সমাজকে ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে। এই যুগেই রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ছাড়া, বৈদিক, শাকদ্বীপি প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ছড়াছড়ি ঘটায় এই যুগে নতুন করে ব্রাহ্মণসমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী সেনরাজা বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁই (গাঞ্রী)-এর প্রাধান্য এই যুগে পরিলক্ষিত হয় এবং বন্দো, চট্ট, মুখটী, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল– এরা প্রধান বা 'মুখ্যকুলীন' হিসেবে পরিগণিত হন। আর রাঢ়ী, গুড়, মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘন্টাঘরী, কেশারকোণা, দিমসাই, পরিহল, হড়, পিতমুণ্ডী ও দীর্ঘতি এরা হন গৌণকুলীন। বাকি ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত হয়। রাঢ়ীসদের ৫৬টি গাঁই (কারো মতে ৫২ বা ৫৯)। আর বরেন্দ্রদের ১০০টি গাঁই। কিন্তু কিংবদন্তি অনুযায়ী বল্লালসেন কর্তৃক মাত্র পাঁচটি বরেন্দ্র গাঁই, যথা– লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র ও ভাদুড়ী কুলীন বলে স্বীকৃত হয়। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা– সিদ্ধশ্রোত্রীয়, সাধ্য-শ্রোত্রীয় ও কাষ্ট-শ্রোত্রীয়।

বর্মনরাজদের আমলে সমতট কথা তথা কুমিল্লা অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে। শ্যামলবর্মার সময়ে এরা বঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অবশ্য লোকনাথের সময়ে দু'শ' বেশি ব্রাহ্মণকে ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি দেয়া হয়।

জাতি, বৃত্তি ও বর্ণগত পরিচয়ের দিক থেকে কুমিল্লা জেলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমানে যেহেতু শুধু ধর্ম ও আলাদা পেশার ভিত্তিতে

পরিসংখ্যান নির্ণয় করা হয় তাই ইংরেজ আমলের আদমশুমারির কিছু পরিসংখ্যান বর্ণনাকালে উপস্থাপন করা হলো :

ব্রাহ্মণ

বাঙালি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে চণ্ডাল (নমঃশূদ্র) ও অন্যান্য শূদ্র বর্ণের মানুষের অনেক নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য রয়েছে। সপ্তম শতকের ত্রিপুরার লোকনাথ লিপিতে ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা অনন্তনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ জন চতুর্বেদ ব্রাহ্মণের বসতির জন্য ভূমিদান করেছিলেন। এর আগে (৫০৭-৮ খ্রিস্টাব্দ) গুনাইঘর লিপিতে ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেবজ্জ স্বামীর নাম জানা যায়। বৈদিক আর্যদের রক্তের প্রভাব এ জেলার অন্যান্য বর্ণের তুলনায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি বলা যেতে পারে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে এ জেলার ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল ৩১,০২০।

বৈদ্য

বৈদ্যদের অস্তিত্ব শুধু বাংলাদেশেই ছিল। অষ্টম শতক থেকে এখানে বৈদ্য উপবর্ণ গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্য রমণীর গর্ভে জাত বলে বৈদ্যদের একটা পরিচয় আছে। অন্য মতে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের ঔরসে বৈদ্যের জন্ম। এ সম্পর্কে অন্য বর্ণনাও আছে। তবে পূরাণে এদেরকে শূদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। আদিতে শূদ্র বলে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে এরা উঁচু বর্ণ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারীতে এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২৫১ ও ৬৪৭০।

কায়স্থ

শুধুমাত্র বাংলাদেশেই এ বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দের কলচুরিরাজ কর্ণের কায়স্থ মন্দিরকে 'দ্বিজ' বলা হয়েছে। বিভিন্ন পূরাণে এদের বিভিন্ন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কায়স্থদেরকে বর্ণ-সাংকর্যের সফল নিদর্শনরূপে ধরে নেয়া হয়। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৭২,৮০৪।

আগুরী

ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতার গর্ভে জাত বলে কথিত আগুরী বর্ণকে অনেকে বৃহদ্ধর্মপূরাণে বর্ণিত উগ্র বর্ণ বলা হয়। মৎস্যজীবী ও শিকারিদের সমশ্রেণীর এই আগুরীরা ছিল জল অচল শূদ্র। খুব সম্ভব অনেক পরে এরা পশ্চিম বঙ্গ থেকে এ জেলায় এসেছিল। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০ ও ৩২৪।

কামার

বিশ্বকর্মার ঔরসে ও শূদ্রা রমণীর গর্ভে জাত বলে কথিত কামার বা কর্মকারদের দৈহিক গঠন অনেকটা বাঙালিদের মতোই। এরা জল চল শূদ্র এবং নবশাখদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৫৪০৩।

কুণ্ডু

কাহার পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান কুণ্ডুরা আদিতে বিহার থেকে বাংলাদেশে এসেছিল। ধান থেকে খৈ, মুড়ি ইত্যাদি এবং মিষ্টি প্রস্তুত করা ছিল এদের ব্যবসা। হিন্দু সমাজে এরা জল চল শূদ্র। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৪০৭।

কাহার

ব্রাহ্মণ পিতা নিষাদ বা চণ্ডাল মাতার সন্তান বলে কথিত কাহাররা আদিতে বিহারের অধিবাসী ছিল। পাল্কী বহন করা ছিল এদের প্রধান পেশা। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২১৭।

কাপালী

কারো কারো মতে এরা কামার পিতা ও তেলী মাতার সন্তান। ভিন্ন মতে তিয়ার (জেলে) পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান। এরা ছিল তন্তুবায়ী ও কৃষিজীবী। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৮১৯৭।

কাঁসারী

কারো কারো মতে এরা সুবর্ণ বণিকদের অংশবিশেষ। এরা কামারদেরই বংশজাত। শূদ্র হলেও এরা উত্তম সংকর বলে পরিচিত।

কুমার

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ অনুসারে এরা ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান। পরাশরসংহিতা মতে মালাকর পিতা ও চামার মাতার সন্তান এবং অন্য মতে, এরা পট্টিকার (রেশমী বস্ত্র বুননকারী) পিতা ও তিলি মাতার সন্তান। নবশাখদের অন্তর্গত এরা জলচল শূদ্র বলে বিবেচিত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১০,৯৪৫।

কৈবর্ত

কৈবর্ত দাস, চাষিদাস, হালিয়াদাস, পরাশদাস, ধীবর, মাহিষ্যদাস প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এরা পরিচিত। পণ্ডিতেরা মনে করেন, কৈবর্তরা প্রাচীন অধিবাসীদের রক্তধারার বাহক হলেও বহিরাগতদের রক্তধারার কিছু সংমিশ্রণ ঘটার ফলে এরা এক সংকর বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। কৈবর্তরাই যে এদেশের প্রাচীন অধিবাসী তা মহাভারত থেকে জানা যায়। তবে এরা এদেশের মূল বাসিন্দা নন, বহিরাগত। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৫৩,৮০৬।

গোয়ালা

কারো কারো মতে ব্রাহ্মণ পিতা ও অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) মাতার সন্তান। অন্যমতে, এরা পতিত বৈশ্য। নৃতত্ত্বের বিচারে গোয়ালাদের মধ্যে বৈদিক আর্য রক্তধারার প্রভাব বেশি বলে মনে করেন কেউ কেউ। খুব সম্ভব আদি অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে যারা গোচারণ ও দুগ্ধ ব্যবসা করত, এরাই বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এসে এক সংকর বর্ণে পরিণত হয়। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৯০২২।

গোনরি

গুণরী, মল্ল, মাছুয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত এ বর্ণের আদি নিবাস ছিল বিহারে। এরা নিষাদের বংশধর বলে কথিত। নৌকা চালনা ও মৎস শিকার এদের প্রধান পেশা। খুব সম্ভব এরা আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ২৫১০।

গন্ধবণিক

এরা আর্য বৈশ্যদের বংশধর বলে দাবী করে। কারো কারো মতে এরা বৈদ্য পিতা ও রাজপূত মাতার সন্তান। এদের মধ্যে আলপাইন বা ভূমধ্যসাগরীয় মানুষের রক্তধারার প্রভাব বেশ আছে বলে মনে করা হয়। তবে আদিবাসীদের রক্তধারার প্রভাবও যথেষ্ট। এরা উত্তম সংকর শূদ্র। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪১৭৬।

চণ্ডাল

চাঁড়াল, নমঃশূদ্র, নম, নিষাদ ইত্যাদি নামে পরিচিত এ বর্ণের লোকেরা অতি প্রাচীন কাল থেকেই অন্তজ ও অস্পৃশ্য বর্ণ হিসেবে পরিচিত ছিল। অথচ নৃতাত্ত্বিক পরিমিতি-গণনায় এরা এদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের প্রায় সমকক্ষ। রিজলি মনে করেন এরা এদেশের আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। বর্তমানে এরা মৎস ও কৃষিজীবীরূপে অধিক পরিচিত। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৮১,১৫৫।

চামার

এক মতে, এরা চণ্ডাল মাতা ও নৌকার মাঝি পিতার বংশধর। ভিন্ন মতে, ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান নিষাদ এদের পিতা এবং বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান বৈদেহ এদের মাতা। এরা এদেশের প্রাচীন আদিবাসীদের বংশধর বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এবং পরবর্তী কালে বহিরাগতদের রক্তের কিছু কিছু প্রভাব এদের মধ্যে পড়ে। এরা হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য বর্ণ। এরা দৃশ্যত জুতো সেলাই করেন। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৪২৫৬।

চাষাধোবা

বৈশ্য পিতা ও বৈদেহ মাতার সন্তান বলে কথিত চাষাধোবা ধোপা নয়। তবে সমশ্রেণীর বলা যেতে পারে। চাষবাস ও ব্যবসা এদের বৃত্তি। খুব সম্ভব এরা আদিবাসীদের রক্তসম্ভূত এক পিতা বর্ণের লোক। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৪৩।

জালো

এরা জালিয়া, জেলে, জালোয়া, জেলিয়া ইত্যাদি নামেও পরিচিত। কৈবর্তদের মতো এরা জাল দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও এরা কৈবর্তদের থেকে পৃথক বর্ণ বলে পরিচিত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৭১০৫।

ডোম

অনেকে এদেরকে চণ্ডালও বলে থাকে। নৃতত্ত্ববিদের মতে আর্যদের আগে বসবাসকারী কোনো নরগোষ্ঠীর মানুষ এরা। বর্তমানে রক্ত-সাংকর্যের ফলে এদের চেহারায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। বিরুবা পাঁ, সরহপাঁ প্রমুখ চর্যা কবিদের পদে ডোম বা ডোমনীর কথা আছে। এরা হিন্দু হলেও আদি এনিমিস্ট (animisti) ধর্মের অনেক প্রভাব এদের মধ্যে দেখা যায়। এরা অস্পৃশ্য। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৯০৫।

তাঁতী

তন্দ্রবায়, তন্ত্রবায়, আঁতোয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত বস্ত্র প্রস্তুতকারক এই হিন্দু বর্ণ একই পেশায় রত নাথযোগীদের থেকে স্বাতন্ত্র। এরা এককালে ঢাকাই মসলিনসহ উৎকৃষ্টমানের বস্ত্র উৎপাদন করত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৭৯২।

তাম্বলী

পান ব্যবসায়ী (পান উৎপাদনকারী নয়) বলে পরিচিত এ বর্ণ একমতে বৈশ্য পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার বংশধর। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে এরা উত্তম সংকর শূদ্র। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৩২২।

তিয়ার

সমতটে এরা রাজবংশী, ত্রিলক দাস ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। এরা সাধারণত মৎস্যজীবী তবে চাষবাস, নৌকাচালনা ইত্যাদি কাজও করে। খুব সম্ভব এরা আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৩৭৯।

তেলি

তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপাল, কলু ইত্যাদি নামেও এরা পরিচিত ছিল। বৃহদ্ধর্মপূরাণ মতে এরা মধ্যম সংকর শূদ্র। পরবর্তীকালে নবশাখদের মধ্যে অন্ত

র্ভুক্ত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪৯১৪।

নাপিত

এরা ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান। অন্যমতে কোবেরী পিতা ও পট্টিকর মাতার সন্তান। এরা নবশাখদের অন্তর্গত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২১,৬৪২।

পাটিয়াল

পাটি প্রস্তুতকারী খুব অল্প সংখ্যক শূদ্র জাতীয় সংকর বর্ণের পাটিয়ালদের বাস এ জেলায় ছিল। এরা নিজ হাতে চাষাবাদের কাজ করত না।

পাটনী

নদীমাতৃক সমতটে এরা পাটুনী, পাটৌনী, ডোম পাটনী ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও পরিচিত ছিল। ড. ওয়াইজের (Dr. Wise) মতে এরা আদিতে ডোম ছিল। এরা সাধারণত খেয়াপারাপারের কাজ করত। পরে চাষবাসের কাজও করে। এরা কৈবর্তদের প্রায় সমশ্রেণীর। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৬৩০৫।

পোদ

কায়স্থ পিতা ও নাপিত মাতার সন্তান বলে দাবীকৃত পোদ বর্ণের লোকেরা পুণ্ড্রদেরই বংশজাত। এই অন্ত্যজ লোকেরা যে এদেশের আদিবাসীদের বংশধর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৩৫।

বাউরী

মাটি খননকারী, পাল্‌কী বহনকারী অন্ত্যজ বর্ণের শূদ্র। এরা খুব সম্ভব আদিবাসীদের রক্তসম্ভূত। ১৮৮১ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৯।

বাইতি

চুনারী বা চুনিয়া নামেও পরিচিত হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক বলে এরা পরিচিত। চুন তৈরি করা ছিল এদের প্রধান পেশা। এরা এ জেলার আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৯০৬।

বাগদী

অতি নিম্নশ্রেণীর বর্ণ। চাষ করা, মাছ ধরা ছিল এদের পেশা। এরা এদেশের আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। হিন্দু সমাজে এরা অস্পৃশ্য বলে পরিচিত। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১০১।

বারুই

বৃহদ্ধর্মপূরাণ মতে, ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্র মাতার সন্তান এরা। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৮৯৮২। বর্তমানে অনেক বারুই এ জেলায় আছে।

বেড়ুয়া

বেড়া দিয়ে মাছ ধরত বলে এদের বেড়ুয়া বলা হয়। রিজলির মতে এরা চণ্ডালদেরই একাংশ। একসময় কিছু কিছু বেড়ুয়া এ জেলায় দেখা যেত।

বেলদার

মাটি খননকারী নিকৃষ্ট বর্ণের মানুষ। এরা আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক বলে রিজলি মনে করেন। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৫৪, ১৮৮১-তে ছিল মাত্র ৩।

ভুঁইমালী

দেখতে আর দশজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মতো মনে হলেও হিন্দু সমাজে এরা শূদ্র বলেও ঠাঁই পেত না। গ্রামের বাইরে ছিল এদের বাস। পাল্‌কী বহন, দিনমজুরি ও ময়লা পরিষ্কারের কাজে এরা নিয়োজিত হতো। এরা অবশ্য নৌকাও চালাত। এরা এদেশের আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৫৫২২, ১৮৮১ সালে ছিল ১২,৪৯০।

ময়রা

মোদক এবং কুরি নামেও পরিচিত এ বর্ণের লোক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী এবং নবশাখদের অন্তর্ভুক্ত। আদিবাসী ও বহিরাগতদের রক্ত সাংকর্যে এরা সৃষ্ট। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৫৯০১।

মাল

মালদেরকে আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক বলে পরিচিত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হিন্দু বলে পরিচিত হলেও এরা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এবং বাগদীরাও এদের হাতে পানি খেত না এরা সাধারণত কৃষিজীবী ছিল। তবে এদের মধ্যে যাযাবর শ্রেণীরও একটা দল ছিল। কেউ কেউ এদেরকে চণ্ডালদের বংশজাত বলেও মনে করেন। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৩৯৭০।

মালী

ভুঁইমালী থেকে এরা সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণ। মালাকর বা ফুলমালী বলে এরা পরিচিত। এরা উত্তম সংকর শূদ্র বলে পরিচিত ছিল। পরে নবশাখদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৫২৪৪, ১৮৮১ সালে ছিল ২৪৫০।

মালো

এরা মালো-পাটনী নামেও পরিচিত ছিল। কৈর্বত, জালো বা ঝালো (তিয়ার) এরা সবাই মৎস্যজীবী এবং প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ২৬০০।

মুচি

এরা নিজেদেরকে ঋষিও বলে থাকে। চামাররাও নিজেদেরকে ঋষি বলে। তবে মুচিরা চামারদের একটু উঁচু স্তরের বলে দাবী করে। কুমিল্লা জেলায় মুচি ও চামার এই দু' শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরা দ্রাবিড়দের আগেকার কোনও রক্তধারার মানুষ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ১৮৮১ সালে এ জেলায় মুচির সংখ্যা ছিল ২৬১৩।

রজক

ধোবা, শোভা সুন্দর নামেও এরা পরিচিত। এরা এদেশের আদিম অধিবাসী। ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৬,১৯৭।

শুঁড়ি

শৌণ্ডিক, শোণ্ডক, সাহা ইত্যাদি নামেও এরা পরিচিত। চর্যাপদে এদের কথা আছে। আদিতে এরা মাদকদব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করত। বর্তমানে সাহা নামে পরিচিত এরা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী। পূর্বেকার পেশা আর প্রচলিত নেই। বৃহদ্ধর্মপূরাণে শৌণ্ডিক (শুঁড়ি, সাহা) মধ্যম সংকর বর্ণ। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৩৫,৩২৩।

শাঁখারী

শঙ্খকার, শঙ্খবণিক ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও পরিচিত এ বর্ণের লোকেরা নবশাখদের অন্তর্গত জলঅচল শূদ্র। ১৮৭২ সালে এ বর্ণের লোক সংখ্যা ছিল ১৭১।

সদগোপ

গোয়ালাদের বংশজাত বলে মূলত এরা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। কুমিল্লা জেলার ১৮৭২ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৫৮।

সুবর্ণবণিক

বানিয়া, বণিক, স্বর্ণবণিক, সোনার বানিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামেও এরা পরিচিত। এরা জলচল শূদ্র এবং নবশাখদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের দেহের গড়ন দেখে মনে হয় বৈদিক আর্যদের রক্তধারার প্রভাব এদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। তবে বল্লান সেন

এদের শূদ্র বানিয়ে দেন বলে বল্লাল চরিতে আছে। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ১৮৪১।

সূত্রধর

ছুতার নামে অধিক পরিচিত এ বর্ণের লোকেরা বিশ্বকর্মার বংশধর বলে কথিত হয়। ড. ওয়াইজের (Dr. Wise)-এর মতে এরা আদিবাসীদের রক্তধারার বাহক এবং পরে বহিরাগতদের সংমিশ্রণের ফলে এক সংকর বর্ণ। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ১১,৮০৪।

হাড়ি

মেথর, হর, সন্তান ইত্যাদি নামে পরিচিত এ বর্ণের লোক অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা অস্পশ্য। এরা খুব সম্ভব এদেশের আদিবাসীদের রক্তসম্ভূত। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৭৬০।

নাথযোগী

বর্তমানকালে হিন্দু বলে পরিচয় দিলেও নাথযোগীরা আদিতে হিন্দু ছিল না। বাংলায় পাল রাজত্বের অবসানে বর্মণ-সেন যুগে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণ ও বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধনের কালে বৌদ্ধ ধর্মাবলাম্বীদের মধ্যে সহজযান বৌদ্ধপন্থীরা নাথধর্ম নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে। নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ এ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন বলে জানা যায়। তবে তাঁর প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ এ ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করেন। হিন্দু সমাজের কাছে নাথযোগীরা বরাবরই ছিল অবজ্ঞার পাত্র। এদের প্রধান পেশা ছিল কাপড় বোনা। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৬৬,৮১২।

বিভিন্ন বর্ণ ও বৃত্তির লোকদের যে পরিচয় ওপরে তুলে ধরা হলো তাদের এই পরিচয় অতি প্রাচীন কাল থেকেই। বর্তমানে এদের অনেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিংবা নিজেদের পরিচয় গোপন করে নিয়েছে।

কুমিল্লা, সমতট কিংবা প্রাচীন বাংলার সমাজের গতি প্রকৃতি, রাজ্যের রাজার পরিবর্তন, রাজবংশের পরিবর্তন, বহিরাগত রাজাদের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে উচ্চকোটি তো বটেই নিম্নকোটির লোকদের বর্ণ এবং বৃত্তির পরিবর্তন ঘটে। তবে তা খুব দ্রুত ঘটেছে সে কথা বলা যাবে না।

গুপ্তদের সময় থেকে ব্রাক্ষণদের পরিচয় পাওয়া গেলেও নিম্নবর্ণের মানুষদের পরিচয় অনুমান মাত্র। তবে সমতট বা লালমাই-ময়নামতিতে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় ছ'শ বছরই বৌদ্ধরাজাদের শাসন এখানে বর্ণ বা বৃত্তিগত পরিবর্তনে খুব সামান্যই প্রভাব ফেলেছে! ভিক্ষু রা শ্রমণরা বৌদ্ধবিহারে ধর্মকর্মে ব্যস্ত থেকেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের

বিভাজন ছিল না বলে সমাজে প্রচলিত বৃত্তি কেউ ছেড়েছে বলে মনে হয় না। পৈত্রিক পেশার উত্তরাধিকার বরাবরই অন্ত্যজ শ্রেণীর সকল পরিবর্তনেও একই রূপ ছিল তা সহজেই ধারণা করা যায়। সমতটের রাত, খড়গ, দেব, চন্দ্র, পাল প্রভৃতি রাজ বংশের রাজত্বকালে সে পরিবর্তন মোটামুটি একই রকম ছিল।

সেন এবং বর্মণ যুগকে বর্ণবিন্যাসের চতুর্থ পর্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। তাদের আগে সমতটে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার এবং নমনীয়। রাষ্ট্রক্ষমতার কারণে এ উদারতা ও নমনীয়তা তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেন-বর্মণদের কালে। এরা বাঙালির কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না একথা খুব জোর দিয়ে বলেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রেক্ষিতে এরা ব্রাহ্মণ্য প্রথা প্রচলনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্ণবিন্যাসের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বর্মণ রাজারা ব্যাপক পরিমাণে সমতটে ব্রাহ্মণদের বসতি দেন।

চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করে বর্মণবংশের প্রতিষ্ঠা। ড. রায় বলেন, পালদের সেন এবং বর্মণরা বিলুপ্ত যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করলেন এরা ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত। এরা উভয়ই নৈষ্টিক ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে এ দু'টি তথ্যই অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ।

ব্রাহ্মণতান্ত্রিক স্মৃতিশাসনের সূচনা এ সময় থেকেই। নালন্দার একটি লিপিতে আছে জাতবর্মার সৈন্যরা সোমপুর মহাবিহার পুড়িয়ে দিয়েছিল। লিখিত তথ্য না পাওয়া গেলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না লালমাই-ময়নামতির বৌদ্ধ বিহারগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল। ব্রাহ্মণতান্ত্রিক সমাজশাসনের সূচনার আদিগুরু বর্মণরাজাদেরই মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব। সমসাময়িককালে বাঙালি চিন্তানায়কদের অন্যতম ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এই 'পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের' বুদ্ধে ব্রাহ্মণতন্ত্রের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি ভবদেবভট্টের রচনাতেই সুস্পষ্ট।[২] সেনদের আমলে পুরোপুরিভাবে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। গাঁই প্রথার প্রচলন ভট্টভবদেবের আমলে।

ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিপিগুলোয় রাজবংশের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রয়ী বিষ্ণুভক্তির পরিচয় রয়েছে। রাজা দামোদরদেব জনৈক যুর্জুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ পৃথ্বীধরশর্মাকে কিছু ভূমিদান করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও সংঘে বর্মণ ও সেনদের দীর্ঘ সময়ে কোনো ভূমিদানের নজির নেই। অথচ রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের (১২২০) পট্টিকারা লিপিতে দেখা যায় তিনি পট্টিকারা নগরীর এক বৌদ্ধবিহারে একখণ্ড ভূমিদান করেছিলেন। ড. রায় বলেন, সেন-বর্মণদের আমলে ঔদার্যের এতটুকু দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। সেন-বর্মন-দেবরাষ্ট্রে গৌরবময় পাল-চন্দ্র যুগের ধারা, গতি, প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অস্বীকার করে বৈদিক, স্মার্ত ও

পৌরাণিকযুগ বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এ সংস্কার ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিনিধি হলায়ুধ।[৩]

শুধু ধর্মীয় মতবাদ নয়, রাজকার্যের বিভিন্ন দিকের ওপর তাদের প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। এরাই কোনটি চলবে কোনটি চলবে না নির্ধারণ করে দিতেন। শূদ্রবর্ণের শিক্ষাদীক্ষা, পূজায় পৌরহিত্যকরণ, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য শিল্প বিদ্যার চর্চাবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল। করলে 'পতিত' হতে হতো। এরাই তো আইন করে দিয়েছিলেন দেশীয় ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণাদির চর্চা করলে রৌরব নরকে পতিত হতে হবে। ড. রায় আক্ষেপ করে বলেছেন, ব্রাহ্মণদের কৃষিবৃত্তি নিষিদ্ধ ছিল না, যুদ্ধবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না, অথচ বর্ণবিশেষের অধ্যাপনা বা পৌরহিত্য নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণবিভাগের একটি রূপরেখা প্রথমেই দেয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে ৩৬ জাতের কথা প্রচলিত থাকলেও তালিকায় ৪১টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ৫টি সম্ভবত উপবর্ণ। সৎশূদ্রে ১৯ এবং অসৎশূদ্রেও ১৯টি বর্ণ বা জাতের কথা আছে।

এই বর্ণ বা জাত বিভক্তি সমাজে শ্রেণী বিভক্তির সৃষ্টি করেছে। কার্লমার্ক্সের শ্রেণীচিন্তার নানা উপাদানের বাইরেও সমতটের বাঙালি সমাজে ব্রাহ্মণ্য রীতি নির্ভর শ্রেণীর পরিচয় এখনো বিদ্যমান।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব

পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকের মতে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর রক্তধারার কিছুটা প্রভাব বাঙালির দেহে আছে। শুরুতে হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী এসব নরগোষ্ঠীর লোকেরা ইতিহাসযুগে হিমালয় অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলে এবং সংলগ্ন সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে বলে মনে করা হয়। সে সময় এরা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় এরা বহুকাল ধরে বসবাস করতে থাকে। এরা সাধারণত কোচ, মেচ, থারো, পালিয়া, রাজবংশ, গারো, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি নামে পরিচিত। এদের অনেক পরে আর একটি নরগোষ্ঠী বাংলাদেশের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এরা বার্মা, চীন ইত্যাদি দেশ থেকে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বসতি স্থাপন করে। এরা সাধারণত চাকমা, মঙ, মোমঙ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর যে সীমিত সংখ্যক মানুষ কুমিল্লা জেলায় বসবাস করে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো :

ত্রিপুরা

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী এই কোমের লোকদের ত্রিপুরা বা টিপরা বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এই শ্রেণীর লোকেরা তিব্বতের বড়ো কোমের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং কোচ, মেচ, পলিয়া, গারো, হাজং প্রভৃতি কোমের লোকেরা নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এদেরই সমগোত্রীয়। এরা শুরুতে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করলেও পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ৩০০৪, ১৮৮১ সালে ১৮৯৫। বর্তমানে এরা নেই বললেই চলে।

চাইন

রিজলীর মতে এ বর্ণের লোকেরা মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা চাই, বরচাঁই নামেও পরিচিত। ১৮৮১ সালে এদের সংখ্যা ৩১৪। বর্তমানে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই বললেও চলে।

কোচ

বাংলাদেশের মূলত উত্তরাঞ্চলে কোচ জাতি বহুসংখ্যাক রয়েছে। ১৮৭২ সালে এ জেলায় এদের সংখ্যা ছিল ১২৯৫। ১৮৮১-তে ২৪৯৫। বর্তমানে নেই বললেও চলে।

সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধ

কুমিল্লার লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম ও বরুড়া অঞ্চলে 'সংহ' উপাধিধারী প্রায় ৮ থেকে ৯

হাজার বৌদ্ধের বসতি রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের 'বরুয়া' উপাধিধারী বৌদ্ধদের মতোই এদের দেহের গঠন। অনেকের মতে মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী এ বাঙালির রক্তধারার সংমিশ্রণে এরেদ উৎপত্তি হয়েছি।

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর এই সীমিত সংখ্যা লোক ছাড়া এ নরগোষ্ঠীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আর কোনও বর্ণ বা কোম ঐ জেলায় ছিল না বা আছে এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুসলমান রক্তধারীর প্রভাব

কুমিল্লার জেলার মুসলমানরা শুরু থেকেই মোটামুটি কৃষিজীবী। এ থেকে ধারণা করা হয় যে কৃষিজীবী এক বা একাধিক সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং পেশা হিসেবে তাদের আদি পেশাকেই অব্যহত রাখে এবং বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। এরা কোনও বর্ণ বা বর্ণসমূহের অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না।

ইসলাম ধর্ম আরবে প্রচলিত হলেও ধীরে ধীরে তা আর্য, মোঙ্গোলীয়, নিগ্রো ইত্যাদি নরগোষ্ঠীর লোকেরা এ ধর্ম গ্রহণ করে এবং সকলের সম্মিলনে এটি একটি ধর্মভিত্তিক মুসলমান জাতিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন রক্তধারার সংমিশ্রণে গঠিত এ জাতিকে নৃতত্ত্বভিত্তিক জাতি না বলে ধর্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতি বলা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হলেও কুমিল্লা জেলায় এ অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে আরও প্রায় একশ বছর লাগে। কুমিল্লা জেলার মুসলমানদেরকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– বহিরাগত এবং স্থানীয় ধর্মান্তরিত। পশ্চিমের দেশসমূহ থেকে আগত রাজকর্মচারী, সৈনিক, ফকির, দরবেশ এঁরা স্থানীয়ভাবে এ জেলায় বসতি স্থাপন করে বলে অনেকের অভিমত। পশ্চিমের দেশসমূহ থেকে আগত এবং এ জেলায় বসবাসকারী তথাকথিত অভিজাত মুসলমানদের কথা বাদ দিলে বাকি থাকে এ জেলার অগণিত মুসলমান অধিবাসী। পণ্ডিতদের মতে এরা এ জেলায় স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান।

বাদ্যকর

এরা বাজানিয়া নামেও পরিচিত। এরা সাধারণত বিবাহ, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি উৎসবে মানুষের বাড়িতে ঢাক, ঢোল, বাঁশী, খোল, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বাজনা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। অবসরে এরা কৃষিকাজও করে। অনেকের মতে, ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে থেকেই এরা বাদ্যাদির কাজে লিপ্ত ছিল এবং পরেও এই কাজই করতে থাকে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা করা হয় যে, এদের মধ্যে এ জেলার আদিবাসীদের রক্তধারার প্রভাবই বেশি ছিল।

হাজাম

মুসলমান বালকদের 'সুন্নত' করানো, ষাঁড়, পাঁঠাকে খাসী করানোর কাজ এরা করে থাকে। বাদ্যকরদের মতো এরাও খুব সম্ভব কোনো আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক ছিল। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর দশটি মুসলমানের সঙ্গে এদের তেমন কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না। এরা বাদ্যকরদের চেয়ে বেশি সংখ্যক না হলেও এ জেলার সর্বত্র এরা বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে।

বেদে

এরা যাযাবর কোমের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। বেদিয়া, বাদিয়া, বাদ্য ইত্যাদি নামেও এরা পরিচিত। এরা সাধারণত নৌকায় বাস করে এবং নৌকাতেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। মি. রিজলী এদেরকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন :

১. **বাবাজিয়া, লব, পটুয়া :** এরা জাতে মুসলমান হলেও হিন্দুদের আচার-আচরণই এদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এরা নাম-লক্ষণের গান গেয়ে বেড়ায়।

২. **বাজিকর, কবুতরী, ভানুমতী, দোররাজ :** এদের মেয়েরা নানা প্রকার বাজী ও খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। এরা অনেকটা হিন্দু নটদের মতো।

৩. **মাল বা পোঁকেয়া :** এদের মেয়েরা দাঁত থেকে পোঁকা বের করে। দেহে শিঙ্গা লাগিয়ে রসবাত বের করে ও অন্যান্য চিকিৎসা করে।

৪. **মীর শিকারি বা চিরিমার (পক্ষীমার) :** এরা বিভিন্ন রকমের পাখি শিকারের কাজ করে। খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত পাখি ছাড়াও নানান ঔষধে ব্যবহৃত পাখি এরা শিকার করে।

৫. **সাপুড়িয়া :** এরা গাওড়াল নামেও পরিচিত। এরা সাধারণত সাপ ধরে এবং সাপের খেলা দেখায়।

৬. **সানদার :** এ গোত্রের মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুড়ি, বেলোয়ারী দ্রব্যাদি বিক্রি করে এবং এদের পুরুষরা এ সকল দ্রব্য হাটে-বাজারে বসে বিক্রি করে আর অবসরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরে।

৭. **রমিয়া বেদিয়া :** এরা দস্তা দ্বারা পায়ের অলংকার, খাড়ু ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করে। কুমিল্লা জেলায় সব শ্রেণীর বেদে চোখে পড়ে না। বেদেদের মধ্যে সাধারণত যারা দাঁতের পোঁকা তোলে ও শিঙ্গা লাগায় এরা। আর এক শ্রেণীর বেদে যারা সাপ ধরে ও সাপের খেলা দেখায় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বেদে যারা সানদার, চুড়ি, বেলোয়ারী দ্রব্যাদি বিক্রি করে তাদেরকে এ জেলায় দেখা যায়। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, আর দশজন বাঙালির মতো হলেও এরা আদিতে কোনো অন্তজ শ্রেণীর মানুষ ছিল।

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ২৩৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

সমতটের প্রাচীন নারী

প্রত্নযুগ থেকেই নারী-পুরুষ একসাথে বাস করেছে এই সমতটে। প্রস্তর যুগে এমনকি ইতিহাস যুগেও নারীরা পুরুষদের প্রায় সমান কাজ সম্পাদন করেছে। জীবিকার জন্য পশু-পাখি শিকার, ফল-মূল সংগ্রহ এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব পালন করেছে, কখনো কখনো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সংসারের আয়-উপার্জন, খাদ্য সংস্থান প্রভৃতির পর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পালন করেছে ঘরকন্যার কাজ। রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, সন্তান ধারণ, লালন-পালন এসব কাজ নারীরা বহুকাল আগে থেকেই করে আসছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেবার কথা প্রাচীন ইতিহাসে বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে পুরুষের সঙ্গ হিসেবে নারী সবকালে পুরুষের বিজয় এবং সাফল্যে প্রেরণা দিয়ে এসেছে। সমতটের প্রাচীন নারীদের পরিচয় রাজাদের সঙ্গে প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ করে পোড়ামাটির ফলক, বেলে পাথর, কালো কষ্টি পাথর, ব্রোঞ্জের তৈরি নানা প্রতিমায় এবং প্রাচীন মুদ্রায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে নারীদের কথা আছে।

'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাসের লেখক শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ ত্রিপুরার মহারাজ সেং থুম ফা-র রাজমহিষী সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প বলেছেন। হীরাবন্ত নামক ধনবান এক সামন্ত ব্যক্তি গৌড় রাজাদের অধীনে চাকরী করতেন। কিন্তু বাস করতেন ত্রিপুরা রাজ্যে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি তার অবজ্ঞার ভাব ছিল। প্রকাশ্য অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য তাকে ধরতে মহারাজা সৈন্যসহ তিনজন সেনাপতি প্রেরণ করেন। ত্রিপুরার সৈন্যগণ গঙ্গাতীরে উপনীত হলে হীরাবন্ত গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং গৌরেশ্বরকে ত্রিপুরার সৈন্যদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। গৌড়াধিপতি মহাক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিশাল এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। গৌড় সৈন্যগণ ত্রিপুরার সৈন্যদের তাড়িয়ে একেবারে ত্রিপুরার রাজ্যসীমায় উপনীত হন। রাজা এতে ভীত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক সৈন্য প্রেরণ কিংবা নিজের গমন থেকে বিরত থাকেন। তাঁর রাণী স্বামীকে রণবিমুখ দেখে স্বয়ং সেনাপতিকে ডেকে নিজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার ঘোষণা দেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। পরদিন প্রত্যুষে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ত্রিপুরেশ্বরী হস্তিতে আরোহণপূর্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁর দেখাদেখি মহারাজ নিজেও বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ভীষণ রণে উভয় পক্ষেরই প্রচুর হতাহত হয় এবং রক্তের প্লাবন বয়ে যায়। ত্রিপুরেশ্বরী এই যুদ্ধে জয়ী হন। কৈলাস চন্দ্র বলেন, ভারতীয় মহিলা কূলমধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। গড়গুলের অধিশ্বরী দুর্গাবতী এবং ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাই ভীষণ সমরে স্ব স্ব প্রাণ আহুতি প্রদানপূর্বক অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করত: বীরেন্দ্র সমাজে বরণীয়া হয়ে রয়েছেন। কিন্তু বিজয় লক্ষ্মীর সাহচর্য

তাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। বিজয়ী পতাকা তাদের শীর্ষে উড্ডীন হয় নাই। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে রাজমালা লেখক বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়া এহেন রমণীরত্নের নাম স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন নাই। প্রাচীন কালের নারীদের এমন বীরত্বপূর্ণ কাহিনী দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না।

দেবখড়্গের আশ্রাফপুর পট্টলীতে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রাজমহিষী এবং অপর এক মহিলার ভূমি রাজা বিহারের অনুকুলে দান করে দিয়েছেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় তাম্রপট্টলীর লিপি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সেখানে রাণী বা রাজমহিষী শ্রীমতী প্রভাবতীর ভোগকৃত ২ পাটক ভূমি রাজা বিহারে দান করেছেন। এতে বোঝা যায় তখন রাজমহিষীরা জমির ভোগদখলকারী বা স্বত্বাধিকারী হতে পারতেন। এই পট্টলিতে আরো দেখা যায় যে, তখন সাধারণ নারীরাও ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকার বা মালিকানা লাভ করতেন। রাণী এবং এই দু মহিলা অন্যান্যের সঙ্গে এই ভূমির ক্ষতিপুরণ পেয়েছিলেন কি না তা অবশ্য জানা যায় না।

সপ্তম শতাব্দীর খড়গ বংশীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা দেবখড়্গের মহিষী রাণীপ্রভাবতীর একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবী সর্বাণীর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। রাণী প্রভাবতী হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। দেবখড়্গের আমলের দেউলবাড়িতে পাওয়া একটি মূর্তিলেখ থেকে এসব তথ্য জানা যায়। এসব তথ্য থেকে আরো জানা যায় রাজা ঐ মন্দির এবং মূর্তি স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করে দিয়েছিলেন। ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও সেকালের রাণী প্রভাবতী যথেষ্ট প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন এতে কোনও সন্দেহ নেই।

রাত রাজবংশের রাজা শ্রীধারণ রাতের স্ত্রী বন্ধুদেবীর কথা ইতিহাসে জানা যায়। পাশাপাশি জানা যায় ত্রৈলোক্যচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, জাতবর্মা, শ্যামল বর্মা, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন প্রমুখদের অগ্রমহিষী ও রাণীদের নাম। শ্রীচন্দ্রের পত্নী শ্রীকাঞ্চনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে শোচী, গৌরী প্রমুখদের। বিজয় সেনের মহিষী বিলাস দেবীকে তুলনা করা হয়েছে লক্ষ্মী এবং গৌরী দেবীর সঙ্গে। কল্যাণদেবী (কল্যাণচন্দ্র), বীরশ্রী (জাতবর্মা), মালব্য দেবী (শ্যামল বর্ম) প্রমুখেরা প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন।

সমতটরাজ লোকনাথের মাতামহ ছিলেন পারশব কেশব। কেশবের পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা ছিলেন শূদ্রকন্যা। কেশবের পারশব পরিচয়ের এটাই কারণ। এতে কেশবকে সমাজে মোটেই হীনতা স্বীকার করতে হয়নি। তাঁর কন্যা গোত্র দেবী এবং দৌহিত্র লোকনাথকেও কোনও রকম সমস্যায় পড়তে হয়নি। গোত্র দেবীর বিয়েটা হয়েছিল অযবর্ণ বিয়ে। ব্রাহ্মণদের তখন নিম্নতর গোত্রের স্ত্রী গ্রহণে কোনও বাধা ছিল না। শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে সুবর্ণচন্দ্রের নামকরণ

সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রসূতির স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী সুবর্ণ চন্দ্রের মাতার ইচ্ছা হয়েছিল শুক্লপক্ষে নবোদিত চন্দ্রের পূর্ণবেশে রেখা দেখার। তাঁর সেই ইচ্ছে পূরণ হওয়ায় তিনি সোনার মতো উজ্জ্বল অর্থাৎ সুবর্ণময় একটি চন্দ্র (অর্থাৎ সুবর্ণচন্দ্র রূপ পুত্র) দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন। জননীদের মধ্যে এখনও এই ইচ্ছে এবং প্রবণতা রয়েছে।

রাণী ময়নামতি এবং রাজা গোপীচন্দ্রের কথা আমরা ইতিহাস অংশে উল্লেখ করেছি। রাণী ময়নামতির কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। নাথ সাহিত্যে রাণী ময়নামতি, তাঁর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্র এবং তাঁদের পূর্ববর্তী রাজা মানিক চন্দ্র, রাজা তিলক চন্দ্র, রাজা পূর্ণচন্দ্র, রাজা সুবর্ণ চন্দ্র প্রমুখের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাণী ময়নামতি অত্যন্ত জনপ্রিয় মহিষী ছিলেন। কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর কথা লোকজনের মুখে মুখে। সঙ্গত কারণেই মনে করা যেতে পারে যে রাণী ময়নামতি প্রাচীন কালের সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং প্রসিদ্ধ মহিলা ছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে জানা যায় ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা ধর্মমাণিক্য সুবিখ্যাত ধর্মসাগর দীঘি খনন করেছিলেন কুমিল্লা শহরে। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রাজমহিষী নানুয়া দেবী নানুয়ার দীঘি খনন করিয়েছিলেন কুমিল্লা শহরেই। ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সম্মুখে অবস্থিত রাণীর দীঘি খনন করিয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে সমতটের রাজ পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের কথা শুধু এদেশেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের উপাখ্যান আজও বার্মায় ইহিহাস হয়ে আছে। বার্মার ইতিহাস রাজোয়াং'-এ আছে বার্মার রাজা ক্যানঝিল্লার কন্যা সুয়েন থি পট্টিকেরার এক রাজপুত্রকে ভালোবেসেছিলেন। রাজ অমাত্যদের বিরোধিতার কারণে তাদের বিয়ে হয়নি। কিন্তু মেলামেশার ফলে রাজকুমারী এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। ষড়যন্ত্র করে পট্টিকেরার রাজকুমারকে হত্যা করা হয়। আরাকানের ইতিহাস থেকে আরো জানা যায় রাজকুমারের পুত্র অলং সি থু পট্টিকেরার এক রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। অলং সি থুর পুত্র নরথু পট্টিকের এক রাজকুমারী এবং তাঁর বিধবা মাকে হত্যা করে। আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় মারোয়া রাজ্যের জনৈক রাজা পট্টিকেরা তাঁর দুকন্যাকে যৌতুকস্বরূপ আরাকান এবং তম্পদ্বীপে পাঠান। এসব উপাখ্যান বা কাহিনী থেকে রাজ পরিবারের নারীদেব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায়।

ওপরে যা বলা হয়েছে সবই উচ্চকোটির নারীদের কথা। সাধারণ নারীদের কথা খুব একটা জানা যায় না। তবে ফলকচিত্রগুলোর নারী চিত্রে পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলোতে দেবতাদের পাশাপাশি সাধারণ নারীর যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে আন্দাজ করা যায় সেকালের সাধারণ নারীদের জীবন কেমন ছিল। মূর্তিগুলোর

আড়ালেও সেকালের নারীদের মুখশ্রী কষ্টকল্প নয়। এসব থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে উচ্চকোটির কিংবা নিম্নকোটির নারীরা নৃত্যগীত করতেন পুরুষের সঙ্গে নারীদের মদ্যপানের চিত্র পাওয়া যায় চর্যাপদে। বিরূবাপাদ (ত্রিপুরায় জন্মগ্রহণকারী) বলেন :

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চিয়ন বাকলঅ বারুণী বান্দঅ ॥

বাররামা এবং দেবদাসীরা নৃত্য-গীত-বাদ্য পটিয়সী ছিলেন। কলা নিপুণা হিসেবে তাদের সুখ্যাতি ছিল। লালমাই ময়নামতির পোড়ামাটির ফলক, অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তর মূর্তিতে নানা ভঙ্গিতে নারীর সে কলানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে। নৃত্য-গীত পরায়ণা ছিলেন বলেই সম্ভবত শুণ্ডিনী, ডোম্বী, শবরী এবং অন্যান্য তথাকথিত নিচু জাতের রমণীদের সামাজিক নীতিবন্দন কিছুটা অস্থির ও শিথিল হতো। এরা উচ্চকোটির মানুষের যেমন মনোরঞ্জন করতেন তেমনি কাপালিকদের যোগের সঙ্গিনীও হতেন। কাহ্নপাদ কোন জায়গার বাসিন্দা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তা সত্ত্বেও তাঁর একটি পদে দেখা যায় তিনি আফসোস করে বলছেন 'ডোম্বিকে বিয়ে করে জাত খেলাম কিন্তু যৌতুকে লাভ করলাম আত্মধাম।' এতে স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে তখন যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল এবং নারীদের মর্যাদা যৌতুকের মূল্যে কেনা বেচা হতো।

নিচু জাতের মেয়েদের জীবনে নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের কারণেই এরা সে সমাজে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নানা রকম ছলা-কলার আশ্রয় নিয়েছে। বিরূবা কিংবা কাহ্নপাদের একটি চর্যায় এরকম চিত্র পাওয়া যায়–

কইসণি হালো ডোম্বী তোহেরি ভাঙরী আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী।
* * *
কেহো কেহো তোহেরে বিরুআ বোলআ।
বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠন মেলই ॥
কাহ্নে গায় তু কামচণ্ডালী।
ডোম্বীত আগলি নাহি ছিনালী ॥

হালো ডোম্বী, কিরূপ (আশ্চর্য) তোর চাতুরী! তোর (এক) অন্তে কুলীন জন, (আর) মধ্যে কাপালী! কেউ কেউ তোকে বলে বিরূপ (তাদের প্রীত), (কিন্তু) বিদ্বজ্জন তোকে কণ্ঠ হতে ছাড়ে না। কাহ্ন (কাহ্ন) গায়। তুই কামচণ্ডালী, ডোম্বীর চেয়ে বেশি ছিনালী (আর) কেউ নেই।

নারীদের জীবনের নৈতিকভাব শিথিল দিকগুলোর পরিচয় বাৎসায়নের কামসূত্র এবং বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষদ লিপিতে আছে। কিন্তু পাশাপাশি

মর্যাদার আসনে সিক্ত হতে দেখা যায় যখন আমরা লক্ষ করি লালমাই ময়নামতিতে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলোর মধ্যে পুরুষের পাশাপাশি নারীর চিত্র মুদ্রিত আছে।

প্রাচীন কালের পোশাক-আশাক, কেশ বিন্যাস, প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার, অলংকারের ব্যবহার প্রভৃতি থেকেও নারীদের সম্পর্কে একটা পরিচয় পাওয়া যায়। নারীরা সেকালের পোশাক পরতেন হাঁটুর কিছু নিম্নে। তাদের উর্ধ্বাংগ আবরিত করার কোনও বালাই ছিল না। সে যুগের ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা যায় নারীর উর্ধ্বাংগে কাঁচুলী জাতীয় ক্ষুদ্র পরিসর এক খণ্ড বস্ত্র। এ ছাড়া অন্য কোনও বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। এটি নগরের চিত্র। গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ। এখানে কাঁচুলীর ব্যবহারও নেই। বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব থেকে জানা যায় নারীরা শাড়ি পরতেন। তা পায়ের কব্জি পর্যন্ত ঝুলান থাকত। বসনপ্রান্ত পশ্চাদ দিকে টেনে রাখা হতো। আজকার মতো প্রাচীন বাঙালি নারী শাড়ির সাহায্যে উত্তরবাস রচনা করে দেহ আবৃত করতেন না। তাদের উত্তর দেহাংশ অনাবৃত রাখাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কেহ কেহ উত্তরী বা ওড়নার সাহায্যে উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢেকে রাখতেন এবং স্তনযুগলকে রক্ষা করতেন চেলি বা স্তনপট্টের সাহায্যে। নর্তকীরা আঁট-সাঁট পাজামা পরতেন বলে জানা যায়। আজকের মতই এরা লম্বা চুল রাখতেন। ঘাঁড়ের ওপর থাকত খোঁপা। সমতটের নারীদের পাদুকা পরবার কথা জানা যায় না। তবে এখানকার সধবা মহিলারা কপালে পরতেন কাজলের টিপ, সীমান্তে সিঁদুরের রেখা, পায়ে লাক্ষারস অলক্তক এবং ঠোঁটে সিন্দুরের রেখা। দেহ ও মুখমণ্ডল প্রষাধনে ব্যবহার করতেন চন্দনের গুড়া, মৃগনাভি এবং জাফরান। চোখে কাজল মাখার রেওয়াজ আরো পুরনো। খোপায় ফুল গুঁজে দেয়া এবং গলায় কাঁচা ফুলের মালা পড়বার কথা প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে আছে। ময়নামতি খননের ফলে নারীদের ব্যবহৃত বহু অলংকারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। গলার হার, আংটি, হাতের চুড়ি প্রভৃতি ছিল স্বর্ণনির্মিত। নিম্নকোটির নারীদেরও নিশ্চয়ই সাজসজ্জা করতে ইচ্ছে হত। কর্ণকুণ্ডল, কর্ণাঙ্গুরী, কণ্ঠ হার, বলয়, কেউর, মেঘলা প্রভৃতি নারী-পুরুষ সকলেই পরিধান করতেন। রাজবাড়ির ভৃত্যের স্ত্রীরা নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরী, মালা, মল এবং সুবর্ণ বলয় পরিধান করতেন। হীরা, মুক্তা, জহরত, নীলকণ্ঠমণি, চূণী ইত্যাদি দামী পাথরের ব্যবহার বাংলার অন্যান্য জায়গায় হয়ে থাকলেও সমতটে এসবের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। নিম্নবর্ণের লোকদের কার্পাস বীজ, ডালিমের বীজ, কুমড়ার বীজ প্রভৃতি দ্বারা মালা তৈরি করে পরবার কথা শোনা যায়। পাশাপাশি লাউ ফুল এবং কুমড়া ফলের ব্যবহারের কথাও প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবদাসী প্রথা এবং উচ্চবিত্তের লোকদের রক্ষিতা রাখার কথা প্রাচীন গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায়। নগর জীবনের চিত্রে এসবের প্রতিফলন দেখা যায়। পল্লী জীবনের চিত্রটি ভিন্ন। সেখানে স্ত্রী এবং কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্তা।

আলাদা ভাবে সমতট অঞ্চলের নারীদের পরিচয় এবং জীবন ধারা তুলে ধরা সহজ ব্যাপার নয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে সমতট অঞ্চলের নারীদের তুলনা বোধ হয় সঠিকও হবে না। কারণ এখানে বৌদ্ধ রাজারা প্রায় পাঁচ-ছয়শত বছর লালমাই-ময়নামতি অঞ্চল শাসন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখানে নারী জীবনেও ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এখানকার নারীরা অহিংসা পরম ধর্মের দীক্ষায় নিশ্চয়ই মার্জিত এবং পরিশীলিত জীবন যাপন করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগের শিক্ষা তাদের বঙ্গদেশের অন্যান্য নারীদের মতো ভোগপ্রবণ করে তোলেনি। বাঙালি নারীর সহজ-সবল-সৌম্য ও বিনয়ের দিকটি বিশেষ করে স্বামীভক্তি এবং সন্তান বাৎসল্যের সহজাত প্রবৃত্তি তাকে কমনীয়, মোহনীয় ও সম্মানিত করে তুলেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

কুমিল্লার প্রাচীন অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, বৈষয়িক জীবন, আহার-বিহার, ধর্ম-কর্ম, আনন্দ-বেদনা এবং শিল্প-সংস্কৃতি কী ছিল এটি নিশ্চয়ই অনেকের কৌতূহলের বিষয়। লালমাই-ময়নামতি পাহাড় অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এবং ত্রিপুরার রাজাদের দীর্ঘকালের ইতিহাসে এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাচীন যুগের মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগের মানুষের বসবাসের কথা জানা যায় লালমাই-ময়নামতিতে। শিকারের এসব অস্ত্র থেকে সহজেই রোঝা যায় জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের শিকারের ওপর নির্ভরশীলতা ছিল বেশি।

অতি প্রাচীন বাংলার কৌম সমাজে পশুপাখি শিকার দ্বারাই খাদ্য আহরণ করা হতো। সেজন্য পাহাড়-জঙ্গলের নিকটবর্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় জনমানুষের বসতি গড়ে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের জীবিকার ক্ষেত্রে এ চিত্রই সর্বত্র দেখা গেছে। কুমিল্লা তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিহাস যুগে বাঙালি জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য নতুন মাত্রা পায়। কুমিল্লার আদি অধিবাসীরা কোথা থেকে এসেছিল এবং কোন ধারার মানুষ সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া হয়েছে নৃতত্ত্ব অধ্যায়ে। প্রাক-দ্রাবিড়, অনার্য, আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর আদি মানবেরা শিকার করেই জীবন নির্বাহ করেছে এবং আহারের অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কোনও কাজ করেছে বলে মনে হয় না। এরা পশু-পাখির পাশাপাশি প্রকৃতি থেকে লাভ করেছে ফল-মূল এবং ভোজন করা যায় এমন উপাদেয় বৃক্ষ ও তৃণলতা। আগুনের ব্যবহার জানার আগে হয়তো কাঁচাই খেয়েছে। মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখলে তখন পুড়িয়ে খেয়েছে। মসলার ব্যবহার আরও পরের। মসলার মধ্যে মরিচের ব্যবহার যে সর্বপ্রথম ঘটেছিল এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই।

ইতিহাস যুগে মানুষের জীবন যাত্রায় প্রথম যে পরিবর্তনটি আসে তা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি কৃষি সভ্যতার গোড়াপত্তন এবং দ্বিতীয়টি মৎস শিকার। আর্যদের আসার আগে থেকেই প্রাচীন বাংলায় চাষাবাদ শুরু হয়ে যায়; প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকজন বিশেষ করে অস্ট্রিক ভাষাভাষি লোকজন এদেশে ধানের চাষ শুরু করে, প্রাচীন রাজা বাদশাদের ইতিহাসে কিংবা প্রাচীন সাহিত্যে এতদঞ্চলের ফসলাদির

পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। কালিদাসের 'রঘুবংশে' শালীধানের কথা আছে। তবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও সপ্তম শতাব্দীর অনুশাসনগুলোতে ধানের উল্লেখ না থাকলেও ক্ষেত্রকরণ, কর্মকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি কাজের উল্লেখ থাকায় কৃষির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতায় সমতট এবং বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলো কৃষি সভ্যতার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে নতুন নতুন পলিমাটি ছড়িয়ে দিয়ে। আদি-অস্ট্রেলীয়দের মতো দ্রাবিড়রাও কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ধান অর্থাৎ ভাতই বাঙালির প্রধান খাদ্য। কুমিল্লা তার ব্যতিক্রম নয়। ধানের সঙ্গে মরিচ। কুমড়া, বেগুন, লাউ, ঝিঙা, কাকরোল, কচু, সরিষা, আদা, লবঙ্গ প্রভৃতির চাষ হতো এবং এ নামগুলো অস্ট্রিক ভাষা থেকে পাওয়া। পর্তুগিজরা এদেশে আলু আনে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা অর্থাৎ আদি-অস্ট্রেলীয় অস্ট্রিক ভাষাভাষি লোকেরা কী কী উপকরণ ব্যবহার করেছে তা জানা না গেলেও কোনও না কোনও বস্তু যেমন ধারাল পাথর, ধারাল অশ্মীভূত বৃক্ষ, পশুর হাড় প্রভৃতি প্রাথমিক অবস্থায় মাটি কর্ষণের কাজে ব্যবহার করেছিল। এর পরে হয়তো ধাতুর আবিষ্কার কৃষি সভ্যতাকে আরও অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। তখন খুনতি, কোদাল, কুঠারের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। চাষাবাদে কবে থেকে লাঙলের ব্যবহার শুরু হয় তাও এক কঠিন গবেষণার বিষয়। লাঙল প্রথমে হয়তো মানুষেরাই টেনেছে। লাঙলের নমুনাও হয়তো স্থানভেদে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। কৃষি সভ্যতার সঙ্গে এ লাঙলের ব্যবহার বাঙালির আদি ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। লাঙলের সঙ্গে জোঁয়াল, মই এসব প্রথমে হয়তো মানুষই টেনেছে। পশু কখন থেকে লাঙল টানছে সে তথ্য আমাদের অজানা। কয়টি পশু এবং কোন জাতের পশু প্রাচীনকালে লাঙল টেনেছে তা-ও আমরা জানি না। প্রাচীনকালে পৃথিবীর সব দেশেই লাঙলের ব্যবহার ছিল। কিন্তু লাঙলের ধরন এক ছিল না। বাংলাদেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লাঙলের ব্যবহার হয়েছে। থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ায় এখনও লাঙলের ব্যবহার আছে। সেখানে একটি মহিষ লাঙল টানে। প্রাচীনকালে লাঙলের উপকরণ কুড়ি, ইশ্, গাদা, জোয়াল, হাল (সাল) প্রভৃতি মেলার উৎসবে বিক্রি হতো প্রচুর পরিমাণে। বৈশাখি মেলার সঙ্গে লাঙল শিল্পের সম্পর্ক বহু প্রাচীনকালের। তাই লাঙল বাঙালির শুধু কৃষি সভ্যতা নয়, কৃষি নির্ভর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

ধান চাষের ক্ষেত্রে লাঙ্গলের পাশাপাশি দু'টি উপকরণের কথা না বললেই নয়। এর একটি হচ্ছে কাস্তে। অন্যটি ভার। কাস্তে কেমন ছিল আজকের নমুনা থেকে আন্দাজ করা যায়। ভার বোধহয় এখনকার মতোই দু'রকম ছিল- সূচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট এবং খাজকাটা অগ্রভাগ বিশিষ্ট। পাতলা, জোংরা, গামছা, শানকি- এসব কৃষি সংস্কৃতিরই উপাদান।

ধানের পরে বড় কৃষিজাত পণ্য ছিল ইক্ষু। রামচরিতে বরেন্দ্রভূমির ইক্ষুর কথা আছে। পূর্ববঙ্গেও ইক্ষুর চাষ হয়েছে প্রাচীন কাল হতে। পূর্বকালে বরেন্দ্রর নাম ছিল পৌণ্ড্র। পুরি আখ থেকে পৌণ্ড্র শব্দটি এসেছে। পৌণ্ড্রক দেবতা, গুড় শব্দ থেকেই নাকি গৌড় শব্দের উৎপত্তি। গুড় যে বাংলার দ্বিতীয় পণ্য ছিল শুধু তাই নয় খ্রিস্টপূর্ব কালে এখানকার একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্যও ছিল। খ্রিস্টপূর্ব কালের গ্রিক লেখক ইলিয়াস এবং লোকেন-এর রচনা থেকে জানা যায় এদেশের গুড় তখন সমুদ্র পথে গ্রিসেও যেতো। ইক্ষু সমতট অঞ্চলেও প্রচুর জন্মাত।

তুলার চাষ ছিল সর্বত্র। তুলা দিয়ে সূতা বোনা হতো। সূতা দিয়ে বস্ত্র। সূতীবস্ত্র বাঙালির প্রধান পরিধেয়। সমতট তথা কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষ এ বস্ত্রই পরিধান করেছে। কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরি বস্ত্র তখন মানুষ একহারা বা ধূতির মতো করে সেলাইবিহীন অবস্থায় পড়ত। উচ্চকোটির মানুষেরা পট্টবস্ত্র এবং সিল্কের (পত্রানৌক) বস্ত্র পরিধান করতো। এতে মনে হয় পাটের চাষ হতো এবং গুটিপোকারও চাষ হতো। তবে কুমিল্লা অঞ্চলে গুঁটিপোকা চাষের কোনও নজির নেই।

মরিচের নাম কখন লঙ্কা হয়েছে তা জানা যায় না। মরিচ শব্দটি অস্ট্রিক ভাষাভাষিদের। জানা যায় অন্যান্য মসলার সঙ্গে সুপারি এবং মরিচ শুধু গ্রিসে নয় রোম সাম্রাজেও বাজার সৃষ্টি করেছিল। রামচরিতে মসলা জাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা জানা যায়। আর টলেমি এবং পেরি-প্লাসকের গ্রন্থ্ থেকে জানা যায় রোমে ১ সের লঙ্কার দাম ছিল ৩০ স্বর্ণদিনার। সুপারির পাশাপাশি নারকেল, পানের বরজ প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পান খাওয়ার রীতিও অস্ট্রিক ভাষাভাষিদের সময় থেকে চলে এসেছে। পানের বরজ অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। কলা বা কসুলি অস্ট্রিক যুগ থেকে বাঙালির প্রিয় খাদ্য। এছাড়া বাঙালি জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, আমলকি, ডুমুর, মহুয়া, খেঁজুর, দাড়িম্ব, পরকটি প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ। বন্য ফুলের পরিচয় বোধ হয় অরণ্যচাষি মানুষের জানা ছিল। কবি লেখকদের জানা ছিল না। তাই তার নাম নেই। সমতট অঞ্চলের মানুষ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এসব ফল-মূলের সঙ্গে পরিচিত।

'ভাতে-মাছে বাঙালি' এই প্রবাদ কতখানি পুরনো? বাংলার নদী নালা খাল বিল অতি প্রাচীন কাল থেকেই মৎস সম্পদে ভরপুর। মানুষ মৎস শিকার শুরু করে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। জলের মাছ অপেক্ষাকৃত নিরীহ প্রাণী। তাকে ধরা সহজ। বড়শী দিয়ে মাছ ধরার আলামত অর্থাৎ বড়শী প্রাচীন কালের সকল নিদর্শনের সঙ্গে পাওয়া গেছে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে উৎখনন কালেও পাওয়া গেছে। মাছের ওপর নির্ভরশীল যে জনগোষ্ঠীর পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় এরা হচ্ছে

কৈবর্ত্য। এরা বাংলার মূল বাসিন্দা নয়। কালক্রমে এরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছে। কালক্রমে বাংলার আদি বাসিন্দা প্রাক্-দ্রাবিড় লোকজনও জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্য শিকারে প্রবৃত্ত হয়। চাষের জমি এবং পুকুর-পুষ্করিণী একসময় কৃষি নির্ভর পরিবারগুলোর অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। উন্মুক্ত জলাশয় এবং ভাসান পানিতে নদী-নালা, হাওড়-বিলেও তখন মৎস শিকার অবারিত ছিল। বাঙালির খাদ্য-সংস্কৃতিতে নানা প্রজাতির মাছ নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পশু বা পাখি শিকার ক্রমে কঠিন হয়ে যাওয়াই বোধ হয় শিকারি মানুষ মৎস শিকারে পানিতে নামে। পলো, ডুলা, চালুন, জাল, ওঁছা, চাই (আর্নতা)– এসব শব্দগুলো বহু প্রাচীন এবং অস্ট্রিক বা কৈবর্ত্যদের থেকে পাওয়া। পশু-পাখি কিংবা মৎস শিকার করতে হয় পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। সমতট বা কুমিল্লা অঞ্চলের মানুষ খুব পরিশ্রমী ছিল সেকথা বলা যাবে না। কারণ, অতি প্রাচীন কাল থেকেই 'ভাদাইম্যা' শব্দটি এতদঞ্চলে প্রচলিত হয়ে আসছে।

গম এবং যব ফসল দুটি আর্যরা এদেশে নিয়ে আসে। এর প্রতি সাধারণ বাঙালির আজও তেমন উৎসাহ নেই। ভারতবর্ষে আগত আর্যরা কখনোই ভাত খেত না, মাছও খেত না সেকথা ইতিহাসে জানা যায়। এরা মাংস ভক্ষণ করতো। ড. অতুল সুর বলেন, এদের কেউ কেউ গো-মাংসও খেত। কিন্তু মাছ খেত না। খাদ্য সংস্কৃতিতে প্রাক্-দ্রাবিড় আদি-অস্ট্রেলীয়রা, দ্রাবিড়রা, কৈবর্তরা খুবই কাছাকাছির মানুষ। বহু দূরের মানুষ আর্যরা। বাঙালিরা তৈলের খাবার খেলেও আর্যরা খেতেন ঘি-এর খাবার। তৈল এবং ঘি-এর ব্যবহার-কৃষ্টি দু'জাতের মানুষের মধ্যে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা এনে দিয়েছে। বহু পরে অবশ্য এ কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে।

তবে সমতট-পট্টিকেরা তথা কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাচীন খাদ্যাভাসে একটি ধর্মীয় প্রভাবের কথা সহজেই আন্দাজ করা যায়। এ প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির পাশাপাশি মাংসের প্রতি বাঙালির একটা বিরাগ সৃষ্টি হওয়ার কথা জানা যায়। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ ক্রমান্বয়ে নিরামিষ আহার্যের প্রতি পক্ষপাতি হয়ে পড়ে। বাংলার অন্যতম প্রথম ও প্রধান স্মৃতিকার ভট্টভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করে বাঙালির এ অভ্যাস সমর্থন করেছেন। তবে ব্রাহ্মণরা নিরামিষ খেলেও বাঙালির প্রধান সহযোগী খাদ্য ছিল শাঁক। যে ধর্মের প্রভাবের কারণে সমতট অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভাস পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যায় বলে অনুমান করা হয় সে ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান বাণী হচ্ছে 'প্রাণী হত্যা মহাপাপ।'

পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লালমাই-ময়নামতি সভ্যতার যুগে প্রাচীন বাংলায় যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বা পুস্তকে পাওয়া গেছে– তার কথা আমরা তুলে ধরতে পারি। আহার্য হিসেবে ভাতের কথা আমরা আগেই বলেছি। ভাত ভক্ষণের অভ্যাস ও সংস্কার অস্ট্রিক ভাষাভাষি আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দান। সকল শ্রেণীর মানুষ, উঁচ্চ কোটি থেকে আরম্ভ করে নিম্ন কোটি পর্যন্ত, সকলেই ভাত ভক্ষণ করেছে। চর্যাপদে আছে, "হাড়িতো ভাত নাহি নিতি আবেশী।" আজকের মতো তখনও ভাতের অভাব ছিল। কিন্তু উঁচু স্তরের মানুষের খাদ্য-অভাব যে ছিল না তার প্রমাণ আছে। এরা বড় বড় ভোজের আয়োজন করেছে। 'নৈষধচরিতে' দময়ন্তীর বিবাহ ভোজের বর্ণনা আছে। গরম ভাতে ঘি খেত যারা তাদের কথাও আছে। তবে সবাই খেত কলা পাতায়, "ওগগরা ভত্তা গাইক গিত্তা" একথা 'নৈষধচরিতে' আছে। কলাপাতায় ঝরঝরে, সুস্বাদু, শুভ্র বর্ণ সরু, সৌরভময় ও অভগ্ন ভাতের কথা আছে। দুধ-ভাত উচ্চ কোটির মানুষের সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় খাবার ছিল। প্রাকৃত বাঙালি ভর্তা, শাক, ছোট মাছ– এসবই পছন্দ বেশি। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' আছে কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মোড়লা মাছের ঝোল, নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করতে পারে তার স্বামী পুণ্যবান।

ওগ্গরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা
মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কাত্তা খা(ই) পুণবন্তা।

ভোজ বাঙালি কৃষ্টির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীন বাঙলায় বিত্তবানেরা সামাজিক ভোজের ব্যবস্থা করেছেন। অগণিত মানুষকে নিমন্ত্রণ করে আজকের মেজবান, জেফত প্রভৃতির মতো প্রাচীন কালে বিশাল সব ভোজের পরিচয় পাওয়া যায়। অতীত কালের বৃহৎ ভোজের কথা ইৎসিঙ-এর বর্ণনায় আছে। কবি শ্রীহর্ষের বর্ণনায়ও আছে ব্যঞ্জনযুক্ত খাদ্যের কথা। দই ও রাই সরিষা দিয়ে ঝালযুক্ত তরকারি পরিবেশন করা হতো। হরিণ, ছাগল, পাখির মাংস ও মাছ রান্না হতো। পানীয় হিসেবে দেয়া হতো কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধি জল। মসলাযুক্ত পানের খিলি পরিবেশন ভোজের পরে আবশ্যকীয় ছিল। দই, পায়েস, ক্ষীর বাঙালির আদি খাদ্য। প্রাচীন সমতটেও স্বাভাবিকভাবেই এ খাদ্যাভাস প্রচলিত ছিল।

বাংলার আরেকজন স্মৃতিকার শ্রীনাথ আচার্য বলেছেন, বিষ্ণুপুরাণে আছে, কয়েকটি পর্বদিবস ছাড়া মৎস্য বা মাংস আহার গর্হিত কাজ নয়। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' আছে রুহিত, শফর, সকুল এবং শ্বেতবর্ণ ও আঁশযুক্ত অন্যান্য মাছ ব্রাহ্মণদের ভক্ষ। 'জীমুতবাহনে' আছে ইল্লিশ মাছ তৈলাক্ত এবং বহুল ব্যবহৃত। প্রাচীন সমতটে মেঘনার ইলিশ নিশ্চয়ই সকলের অত্যন্ত প্রিয় খাবার ছিল। ব্রাহ্মণরা কী মাছ খেয়েছে শাস্ত্র যেমন সে কথা বলে, ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ মাছ কোন কোনটি ছিল তাও বলে। যেমন, ব্রাহ্মণদের ভক্ষ ছিল না গর্তে বা কাদায় থাকে এমন সাপের মতো মাছ। আঁশহীন মাছ খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। পচা ও শুকনা মাছ এরা

খেত না। লেখক সর্বানন্দ টীকাসর্বস্ব গ্রন্থে বলেন, বঙ্গাল দেশের লোকেরা সিহুলী (সিদল) বা শুকনো মাছ খেতে ভালোবাসতো। সমতটের মানুষ এখনও তা পছন্দ করে। ব্রাহ্মণরা শামুক, কাঁকড়া, মোরগ (রামপাখি), সারস, বক, হাঁস, উট, গরু, শূকর প্রভৃতির মাংস খেত না। কিন্তু আদি বাসিন্দা কোম লোকেরা এগুলো ভক্ষণ করত। নিম্নস্তরের লোকেরা এখনও তা ভক্ষণ করে। বাঙালি সমাজে খৈ-এর প্রচলন আগে থেকেই। বিভিন্ন পার্বণ ও উৎসবে খৈ ছিটানোর কথা বহু গ্রন্থে আছে।

প্রাচীন বাঙালি দুধ, নারকেলের জল, ইক্ষু রস, তাল রস প্রভৃতি ছাড়াও মদ্য জাতীয় নানা প্রকারের পানীয়ের প্রতি আসক্ত ছিল। গুড়ের তৈরি গৌড়ীয় মদ ভারতবিখ্যাত ছিল। ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু ও তাল রস প্রভৃতি গাঁজিয়ে নানা প্রকার মদ তৈরি করা হতো। চর্যাপদে শুড়িখানার কথা আছে। মদ্যপানের কথা আছে। বিরূপা পাদানাম চর্যাপদের কবি। পণ্ডিতেরা মনে করেন বিরূপাপাদই একমাত্র চর্যাকবি যাঁর বাড়ি ছিল সমতটে।

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।
* * *
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিয়া ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী মরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল ॥

এক শুঁড়িনী দু ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই; সেই চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকলো তার আর সাড়াশব্দ কিছু নেই (মদের নেশায় এমনই বিভোর)! সরু নলের একটা ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে– বিরূপা সাবধান করছেন, সরু নাল দিয়ে চাল স্থির করে বারুনী ঢাল।

তখনও সমাজে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' এই নিষেধাজ্ঞার কথা আছে।

শিকারের কথা আমরা আগেই বলেছি। খেলাধুলার মধ্যে দাবা খেলা, পাশা খেলার কথা আছে। চর্যাপদে ঠাকুর (রাজা), মন্ত্রী, গজবর এবং বড়ে– এ চারটি গুটি 'খেলার দান' এবং চৌষট্টি ঘরের কথা আছে। সমতটেশ্বর শ্রীধারণ রাতের কৈলানলিপিতে আছে সতত হস্তি ও অশ্বক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকার ফলে শ্রীধারণের দেহ

ছিল পেশী সমৃদ্ধ ও সুদর্শন (গেজতুরগ– সতত পীড়ন–ক্রমোচিতশ্রম বলিততনুবিভাগ-রম্যদর্শন)। বাজি ধরা ও জুয়া খেলাও তখন প্রচলিত ছিল। গুটি খেলা বা ষোল ঘর, বাঘ-বন্দি প্রভৃতি কৌম সমাজেরই একেবারে মৌলিক গৃহক্রীড়া। সমতটে এসব খেলাধুলা সর্বজনবিদিত।

নৃত্য-গীত-বাদ্য এবং অভিনয় কলায় প্রাচীন বাঙালি সমাজের নৈপূণ্য ও প্রশংসার কথা শুধু প্রাচীন গ্রন্থে নয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতেও পাওয়া গেছে। রামচরিত, প্রবণ দূত, চর্যাগীতি, সদুক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ রয়েছে। বাররামা এবং দেব দাসীদের নৃত্য-গীত-বাদ্যে পটিয়সীতার কথা সেনলিপি ও পবনদূতে আছে। লালমাই-ময়নামতির পোড়ামাটির চিত্রফলক, অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তর মূর্তিতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্যরত নর-নারীর প্রতিকৃতি রয়েছে। পোড়ামাটির ফলক এবং মূর্তির গাত্রে নৃত্যরত নরনারীর নৃত্য নিবেদন দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য। কিন্তু শিল্পীরা নিজেদের অজান্তেই নৃত্য-গীতের দৃশ্যগুলো কলানৈপুণ্যের পরম উৎকর্ষে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। লালমাই-ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকে এমনকি প্রস্তর চিত্রেও বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কাসর, করতাল, ঢাক, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি অন্যতম। মুরজ বা মৃদঙ্গ বাঙালির আদি বাদ্যযন্ত্র। গীতাভিনয়ের কথা চর্যাগতিতে রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের কথাও আছে। যে লাউ এখনও মানুষকে বৈরাগী বানায় হাজার বছর আগে চর্যাগীতিতে লাউয়ের সে সঙ্গীত যন্ত্রের পরিচয় রয়েছে। নৃত্য-গীতের পাশাপাশি সমাজের নৈতিক স্খলনের চিত্র বিশেষ করে নিচু জাতের মেয়েদের নৈতিক চরিত্রের শৈথিল্য চর্যাপদ থেকে শুরু করে সকল প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যৌতুক প্রথা প্রাচীন বাঙালির আদিম রোগ। যৌতুকের লোভে নিচু কূল থেকে কন্যা গ্রহণেও আপত্তি ছিল না।

প্রাচীনকালে স্থলপথে লোকজন পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতো। তবে জলপথে চলাচলের পরিচয়ই বেশি পাওয়া যায়। ভেলা, ডিঙ্গ, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ। এর থেকে বোঝা যায় আদিমতম কাল থেকেই এর ব্যবহার। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসযুগে নৌকার ব্যবহার। নৌ-বন্দর, নৌ-ঘাট, নৌ-বাণিজ্য, নৌ-দণ্ডক প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় বাঙালির অন্যতম বাহন ছিল নৌযান। চর্যাপদে নৌকাব রূপক রয়েছে। চর্যার বহু পদে নৌকা কিংবা জলপথের পুনঃপুনঃ ব্যবহার সেকালেব নৌপথের গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নৌযানের পাশাপাশি স্থলভাগের চলাচলের জন্য গরুর গাড়ির কথা জানা যায়। প্রাচ্যের চুতরাশ্ব রথের কথা গ্রিক ঐতিহাসিকদের বিবরণেও রয়েছে। হস্তি সেনার এবং অশ্বসেনার কথা রয়েছে। গো-যান ছাড়া হস্তী ও অশ্বযান উচ্চকোটির মানুষের

বাহন এতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রতীক বা রূপক হিসেবে চর্যাপদে হাতির ব্যবহার রয়েছে। এখানে হাতি বাহন হিসেবে চিহ্নিত। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপিতে হস্তীদন্ত নির্মিত বাহুদণ্ডযুক্ত পাল্কীর উল্লেখ আছে। পাল্কী প্রাচীন বাংলার উচ্চকোটির বাহন ছিল। পরে অবশ্য নিম্নেকোটির লোকেরাও তা ব্যবহার করতে শুরু করে অন্তত বিয়ের সময়।

লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ে খনন কার্যের ফলে বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বেরিয়ে এসেছে। এতে রাজা-মহারাজা এবং উচ্চকোটির লোকজনদের বাড়ি-ঘরের এবং উপাসনা গৃহের পরিচয় পাওয়া যায়। বিহার, রাজার বাড়ি, রাণীর বাড়ি প্রভৃতি নির্মাণে ইট, চুন, শুড়কি, কাঠ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। ইট মাটি পুড়িয়ে তৈরি করতে হয়। ইট তৈরির বিদ্যা তখন থেকেই মানুষ জানত। তবে এর চেয়েও বড় বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় ইটগুলোর অলংকরণে। হয়তো এ প্রাসাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রাজা-মহারাজ, সামন্ত কিংবা পুরোহিতরা প্রাসাদ সাজিয়েছেন। কিন্তু তা আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। ধারণা করা হয় তাঁদের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষের গৃহের চিত্র একেবারেই ভিন্ন রকম। বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের বাঁশ-খড়ের নড়বড়ে গৃহই ছিল পূর্বাঞ্চলের মানুষের আদি বাসগৃহ। বাঁশের বা কাঠের খুঁটির ওপর ধনুক আকৃতির চালযুক্ত ঘরের ছবি বিভিন্ন প্রস্তর মূর্তিফলক, পোড়ামাটির ফলক প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের দরিদ্র গৃহস্থের জীর্ণ গৃহের দুর্দশার কথা সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে আছে–

চলৎ কাষ্টং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।
গণ্ডপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥

কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ ঘর আকীর্ণ।

আদিকালে সমাজে দুটি শ্রেণীই ছিল : উচ্চকোটি ও নিম্নকোটি। নিম্নকোটি সমতটবাসীরা নিঃসন্দেহে বাঁশ ও খড়ের তৈরি ঘরে বসবাস করেছে এবং এরই সংখ্যা ছিল বেশি। বাঁশ ও খড়ের সহজলভ্যতার কারণে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় এরা ঘর বানিয়েছে। মাটির ওপরে মাচা করে বাঁশ ও খড় দ্বারা নির্মিত গৃহ অবকাঠামোর কথা কোথাও জানা যায় না। কিন্তু পাহাড়ে বসবাসকারী জনগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। বাঁশের সাঁকো আদি বাঙালির খাল পাড় হওয়ার একমাত্র অবলম্বন ছিল।

লালমাই ও ময়নামতিতে পাওয়া পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর ফলকের বাইরে কিছু তৈজষ-পত্র পাওয়া গেছে। এগুলো থেকে তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রবসামগ্রীগুলো হলো–মাটির খেলনা, ফুলদানী,

নানা আকারের কলস, বাটি, পানপত্র, ভোজনপাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, প্রদীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তক-আধার প্রভৃতি। দোয়াত, পুস্তক আধার প্রভৃতি পাওয়া গেলেও প্রাচীন কোনও বই-পুস্তক পাওয়া যায়নি। প্রত্নস্থানের ধ্বংসাবশেষে অসংখ্য মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। মৃৎপাত্রের ব্যবহার কুমিল্লায় স্মরণাতীত কালেও দেখা গেছে। কুমোরদের জীবিকা নির্বাহ হতো এ মৃৎপাত্র বিক্রয় করে। বর্তমানে অলংকৃত মাটির পাত্র ও অন্যান্য বস্তু পাওয়া গেলেও নিত্যদিনের ব্যবহারের জন্য যেমন ভাতের হাঁড়ি, তরকারির পাতিল, ধান-চাল রাখার জালা, পানির লোটা, বদনা, তরি-তরকারির বাটি, মাটির সানকি প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। উচ্চকোটির মানুষেরা চীনা মাটির তৈজসপত্র ব্যবহার করার কথা ছিল। কারণ চীনা পরিব্রাজকরা যেমন সমতট মণ্ডল পরিভ্রমণ করেছেন তেমনি বার্মা কিংবা আরাকানী রাজাদের সাথে সম্পর্কের কারণে অতি প্রাচীন কালেই চীনা মাটির তৈজসপত্রের ব্যবহারের কথা ছিল। প্রত্নস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলোর মধ্যে চীনা মাটির কোনো নিদর্শন দেখা যায় না। সমৃদ্ধ ও বিত্তবান লোকেরা সোনা-রূপার থালা-বাসন ব্যবহার করেছেন। 'তবকাত-ই- নাসীরী' গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদে সোনা-রূপার ভোজনপাত্রের কথা বলা আছে। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে লোহার জলপাত্রের কথা উল্লেখ আছে। তৈজসপত্র রাখার জন্য অতি সাধারণ মানুষ সিকার ব্যবহার করেছে। সিকা তৈরি হতো সাধারণত পাটের রশি দিয়ে।

আমরা আগেই বলেছি সেলাইবিহীন কার্পাস বস্ত্র পরিধানের ঐতিহ্য বাঙালির। পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা শাড়ি। কিছুটা সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা ভদ্রতাবেশ ধারণের জন্য উত্তরবাসরূপে সেলাইবিহীন আর এক খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করতেন। এটা ছিল পুরুষদের জন্য উত্তরীয় ও মেয়েদের জন্য ওড়না। দরিদ্র ঘরের নারীরা এক বস্ত্রই পরিধান করতেন। প্রাচীন কালে আজকের মতো ধুতি পরিধান করা হতো না। হাঁটুর ওপরেই কাপড় পরিধান করা হতো। নারীরা দেহের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখার ঐতিহ্য বজায় রাখতেন। অতি সাধারণ লোকদের গামছা বা লেংটী পরিধানের কথা জানা যায়। এ বস্ত্র সাধারণত সাদা রঙের হতো। তবে ঠাকুর ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আজকের মতোই গেরুয়া রঙের পোশাক পরিধান করতেন। পাজামার ব্যবহার দেখা যায় নর্তকীদের পরিধানে। পাজামা কখনো বাঙালির পোশাক নয়। নারীর উত্তরবাস শাড়ি এবং পুরুষের ধুতিতে নানারকম লতা-পাতা, ফুল ও জ্যামিতিক নক্‌শা আঁকা থাকতো। সমতট অঞ্চলে এসব পোশাকের ব্যতিক্রম কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

বাঙালি দেহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কেশভূষণ। মাথাভর্তি চুলের পুরুষেরাও লম্বা বাবরি রাখতেন। থোকায় থোকায় কাঁধের ওপর তা ঝুলত। পেচানো ঝুঁটির কথাও জানা যায়। বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ফিতার মতো চুল বেঁধে রাখা যুবকদের ফ্যাশন ছিল। বাঙালি নারীর খোঁপা অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত। পাগল না হলে কোনও নারী খোঁপার চুল খুলে রাখতেন না। সন্নাসী-তপস্বীরা

ছিলেন জটাধারী। শিশুদের চুল ছিল অবিন্যস্ত। কালো চুলের অধিকারী সমতটের মানুষেরা নিশ্চয়ই চুলের যত্ন করতে ভুলতেন না। সিরাজউদ্দৌলা নাটকে আছে 'বাঙালি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'। চুলের মতো দাঁতও মুখের সৌন্দর্য বাড়ায়। কয়লা কিংবা ছাই দিয়ে দাঁত মাজার অভ্যাস আদি বাঙালির সংস্কৃতি। গাছের ডালের ব্যবহারও কখনো-সখনো হয়েছে। তবে বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বাজে প্রাচীন দিক হলো উন্মুক্ত স্থানে বাহ্যকর্ম সম্পাদন।

লালমাই-ময়নামতির চিত্রফলকে পাদুকা বা জুতোর ব্যবহার দেখা যায়। রাজা-মহারাজারা, যোদ্ধা, এবং প্রহরী পাদুকা ব্যবহার করতেন। তবে জুতোগুলো ছিল ফিতাবিহীন এবং হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত। সাধারণ লোকেরা জুতো পরত না, অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা কাষ্ট পাদুকা বা বৈলা-খড়ম ব্যবহার করতো। চর্ম পাদুকার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের। নারীদের পাদুকা ব্যবহারের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। বাঁশের লাঠি এবং ছাতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

বাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্র' গ্রন্থে পুরুষদের লম্বা লম্বা নখ রাখার কথা বলেছেন। সেই নখে রং লাগানো থাকতো যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য। নারীরা চোখে কাজল লাগাতেন। বাৎসায়ন ছাড়াও দামোদর দেবের 'চট্টগ্রামলিপি'তে তার ইঙ্গিতে আছে। প্রসাধন হিসেবে কর্পুরের ব্যবহারের কথা বহু জায়গায় আছে। সধবা নারীরা কপালে কাজলের টিপ, সীমন্তে সিঁদুর, পায়ে অলক্তক, ঠোঁটে সিঁদুর, শরীরে চন্দনের গুড়া, চন্দন পঙ্ক, মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি ব্যবহার করতেন। খোঁপায় ফুল গুঁজে দেওয়ার অনাবিল আনন্দ সেকালেও তরণীদের মধ্যে ছিল। নারীরা ফুলের মালা পরতেন। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে একথা আছে। 'বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ-লিপি' থেকে জানা যায় বিবাহিতা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে অবগাহন করে প্রসাধনে অলংকারে সজ্জিত ও শোভিত হয়ে আনন্দ ও ঔজ্জ্বল্যের প্রতীমারূপে বিরাজ করতেন। এগুলো বোধ হয় উচ্চকোটির নারীদের কথা। সাধারণ মানুষের প্রসাধনের কথা তেমন জানা যায় না। তবে রাজশেখরের কাব্যে প্রাচ্য জনপদবাসীদের প্রসাধনের একটি বর্ণনা আছে–

আদ্রার্দ্রচন্দন কুচার্পিত সূত্রহার ঃ
সীমন্তচূম্বিসিচয় ঃ স্ফুটবাহুমূল ঃ।
দুর্বাগ্রকান্ত রুচিরাস্বগুরূপভোগাদ্
গৌড়াঙ্গনাসু চিরমেষ চকাস্ত বেষ ঃ ॥

বুকে আর্দ্রচন্দন, গলায় সূতার হার, সীমন্ত পর্যন্ত আনত শিরোবসন, অনাবৃত বাহুমূল, শরীরে অগুরু প্রসাধন, দেহেরবর্ণ যেন 'দুর্বাগ্রকাণ্ডরুচির' অর্থাৎ দুর্বাদলের মতো শ্যাম– এটাই হচ্ছে গৌড়ললনাদের বেশ। চর্যাপদেও প্রসাধন এবং মালা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। সমতট অঞ্চলের নারী-পুরুষদের প্রসাধন কিংবা মালা ব্যবহারের পরিচয় শুধু উচ্চকোটি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তালপাতার

কর্ণভূষণ, পায়ের আল্‌তা (বনজ গোটা থেকে) গলায় গুলজার মালা এবং মাথায় দেয়ার নারকেল তেল পেলেই খুশি ছিল বাঙালি মেয়েরা।

লালমাই-ময়নামতি খননের ফলে স্বর্ণের চুড়ি, আংটি, গলার মালা প্রভৃতি অলংকার পাওয়া যায়। কবি উমাপতিধর পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ রমণীদের ব্যবহৃত মুক্তার মালা, কার্পাসবীজের মালা, রূপার হার, নানা রত্নের হার, পাকা ডালিমের বীজের হার, স্বর্ণের হার প্রভৃতির কথা বলেছেন। উৎসব ও অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জায় মার্জিত ও দামী অলংকার পরবার প্রবণতা দীর্ঘকালের। তবে শরীরের রঙের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রসাধন অলংকার ব্যবহারের বিষয়টিও কোনও কোনও লেখক উল্লেখ করেছেন। এতে সীমাবদ্ধ সামর্থের মধ্যেও শিল্পিত রুচিবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। একটি অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে বিভিন্ন রাজাদের প্রায় ৬-৭ শত বছরের শাসন, তাঁদের আভিজাত্য, জীবন-যাপনের জৌলুস ও চাকচিক্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের জীবনেও নানারকম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এসব রাজাদের সৈন্যবাহিনীতে এবং অন্যান্য রাজকর্মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজকীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার ফলে তাদের জীবন ধারায় রাজকীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ কষ্টকল্প নয়। তাই প্রাচীন সতমটের লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলসহ আশে-পাশের মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ আজকের মানদণ্ডে বোধ হয় বিচার করা যাবে না। পাশাপাশি ভিন্ন একটি প্রেক্ষিতকেও এখানে বিবেচনায় আনতে হবে। তা হলো এখানে ২/১ জন বাদ দিলে আর সকল বংশের রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁদের জীবনযাত্রা ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ত্যাগের সে অনুশাসনের প্রভাবও সমকালীন সমাজের ওপরে পড়ে থাকতে পারে। তাই ভোগ ও বিলাসপূর্ণ জীবনচিত্র নিঃসংশয়ে ধারণা করা নানা প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে।

ড. নীরহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্বে কাশ্মিরে বিদ্যার্থী গৌড়ীয় কতিপয় তরুণের গল্প বলেছেন। কবি ক্ষেমেন্দ্র 'দশোপদেশ' গ্রন্থে বলেছেন, এদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল রূঢ়, অমার্জিত ও অত্যন্ত ছুঁতমার্গী। দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালসার। একটু ধাক্কা লাগলেই ভেঙে পড়বে। এ আশঙ্কায় সকলেই এদের থেকে দূরে থাকতো। কিন্তু এরা কাশ্মিরে এসে বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠত। স্বস্তি উচ্চারণ তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। না পারলেও সব শাস্ত্রেই পড়তে উদ্যোগী হতো। শুদ্ধ ও মার্জিত ছিল না। এরা ধীরে ধীরে পথ চলে। দর্পিত মাথা এদিক সেদিক দোলায়। হাঁটবার সময় ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচমচ করে। তার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিকল্প। তার থেকে অর্থ পাওয়ার জন্য ভিক্ষুক ও পরাশ্রয়ী লোকেরা তার তোষামোদ করে গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কালো রঙের সাদা দাঁত বিশিষ্ট এই মানুষটিকে বানরের মতো দেখায়। তার কর্ণ লতিকায় তিন তিনটি করে স্বর্ণ কর্ণ ভূষণ। হাতে ষষ্টি। দেখে মনে সাক্ষাৎ কুবের। সামান্য অজুহাতেই রোষে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ কলহে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুরিকাঘাতে সহ-আবাসিকের পেট চিরে দেয়। গর্ব করে নিজের পরিচয় দেয় ঠক্কুর বা ঠাকুর। কম দাম দিয়ে বেশি জিনিস দাবী করে দোকানদারদের উত্যক্ত করে। বাঙালি বিদ্যার্থীদের এ যে মানসিক পরিচয় তা

হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত, কবি ক্ষেমেন্দ্রের ক্ষেপে যাওয়ার কারণেও হতে পারে। কিন্তু সবটা কাল্পনিক এমন মনে করারও কারণ নেই।

বাৎসায়ন বাংলার নগর চিত্রের বিশেষ করে গৌড়ের যুবক-যুবতীদের কামলীলার কথা, তাদের বাসনা, তাদের বেসন প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় জানা যায় রাজ অন্তপুরের নারীরা নির্লজ্জভাবে ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী এবং দাসভৃত্যদের সঙ্গে কাম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতেন। বৃহস্পতি দু'কারণে বাঙালিদের নিন্দা করেছেন। একটি হচ্ছে তাদের মৎস্য ভক্ষণ, অন্যটি তাদের সমাজের নারী-রা দুর্নীতিপরায়ণ। ধোয়ীর পবনদূত, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতিতে কামচরিতার্থতার কথা সাড়ম্বরে বিবৃত করা হয়েছে। ড. রায় মনে করেন প্রাচীন বাঙালি বোধ হয় কামবাসনায় সংযম অভ্যাসে অভ্যস্থ হয় নি। কেশবসেনের ইদিলপুর লিপি ও বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে আছে প্রতি সন্ধ্যায় সভানন্দিনীরা নূপুর ঝংকারে সভা ও আমোদগৃহগুলো পরিপূর্ণ রাখত। ঘরে দাসী রাখার কথা জীমুতবাহন তাঁর 'দায়ভাগ' গ্রন্থে বলেছেন। পণ্যের মতো নারী কেনাবেচা হতো। এর ওপর ছিল দেবদাসী প্রথা। পুণ্ড্রবর্ধণের নর্তকী দেবদাসী কমলার কথা বিশ্ববিশ্রুত। মোট কথা ভোগ বিলাসে তখনকার উচ্চকোটির বাঙালিরা কোনো অনুশাসনের ধার ধারতেন না। দেবমন্দিরেও নৈতিক অবক্ষয়ের কথা জানা যায় ভবদেব ভট্টের কাছ থেকে। তিনি বলেন বিষ্ণু মন্দিরের উৎসর্গীকৃত শত দেবদাসীরা যেন কাম দেবতাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। এরা যেন কামাতুর ঘরের কারাগৃহ, যেন সঙ্গীত, লাস্য ও সঙ্গীতের সভামন্দির। তবে ব্রাহ্মণ্য লেখক ও সমাজপতিরা এসবের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছেন। সামাজিক অনাচার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার চিত্র নানা গ্রন্থে আছে।

গ্রামের চিত্র ভিন্ন। এখানে নাগরাচার পল্লীপতিদের দ্বারা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রিত। প্রাকৃত পৈঙ্গলে আছে–

পুত্ত পবিত্ত বহুত ধণা ভত্তি কুটুম্বিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর ববর সগ্গমণা ॥

পুত্র পবিত্রমনা, প্রচুর ধন, মন্ত্রী ও কুটুম্বিনীরা শুদ্ধচিত্তা, হাঁকে বেত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ– এসব ছেড়ে কোন বর্বর স্বর্গে যেতে চায়!

লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলের বৌদ্ধ রাজা এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রজাদের নগরে নিশ্চয়ই গৌড়ীয় অনৈতিক চিত্র ছিল না। এখানকার বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু মন্দির প্রভৃতি থেকে সংযত জীবন-যাপনের আভাসই আসে। গ্রামীণ জনজীবনে এরই প্রভাব অর্থাৎ ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা। বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনগুলো সামাজিক মূল্যবোধকে ইতিবাচক এবং নৈতিক দিক থেকে শুদ্ধ চিত্ততার নির্মাণমুখী করার পক্ষেই রায় দেয়। ব্যতিক্রমটা থাকবে না এমন মনে করারও কারণ নেই। তবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশটা ছিল নৈতিক দিকেরই অনুকূলে।

কুমিল্লার ভাষা

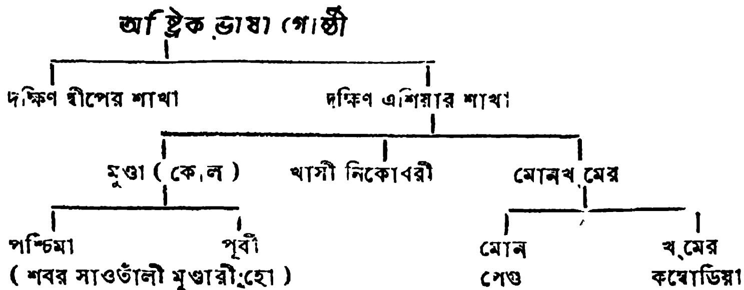
কুমিল্লা জেলার একজন বাসিন্দার মনে এরকম একটি প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক তিনি যে ভাষায় কথা বলছেন এই ভাষার উৎপত্তি কোথায় এবং তার পূর্ব পুরুষেরা কোন ভাষায় কথা বলতেন। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটি বড় দিক হচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়। নৃতত্ত্ব অধ্যায়ে আমরা বলেছি কুমিল্লা তথা বাংলার আদিবাসিন্দারা ছিলেন আদি অস্ট্রেলীয় জাতির মানুষ যাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। অস্ট্রো-এশীয় সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত অঞ্চলের বিশাল ভাষা পরিবারের নাম এটি। বাংলায় এবং কুমিল্লার বাংলায় আজও বহু অস্ট্রিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কুমিল্লার সাধারণ মানুষ এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি এবং ৮০ টায় এক পোন আজও হিসাব করে। কুড়ি শব্দটি এবং গণনার এই যে রীতি এটি অস্ট্রিক। ৪ টায় এক গণ্ডা একথাও পেয়েছে এরা অস্ট্রিক ভাষাভাষি মানুষের কাছ থেকে, খা খা, বাদুড়, কানী, ঠ্যাং, ঠোঁট, পাগল, সাঁঝ, প্যাট, ঝোপ-ঝাড়, চোং, চোংগা, ম্যাড়া, বোয়াল, করাল, করাত, দা, বরজ, লাউ, লেবু, বাইগন, কলা, কামরাঙা, ডুমুর এগুলো অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষা। অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর লৌকিক আচার-আচরণও কুমিল্লার সাধারণ অধিবাসীদের আচরণে লক্ষ করা যায়। অঙ্গ-বঙ্গ, কাচ্চা-বাচ্চা, জমজ নামকরণের বিধিটাও অস্ট্রিক।

আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থে কামরাঙা ফলের উৎপত্তিস্থান কর্মরঙ্গাখ্য দ্বীপে উল্লেখ করা হয়েছে। হিউয়েন সাঙ 'কামলঙ্কাকে' 'কমলাঙ্কের' সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। উল্লিখিত গ্রন্থাকারের মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা অসুর ভাষাভাষি। গোলমুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান ভাষাগুলোর নাম এখনও 'অসুরবুলী'। এরা আদি অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক এবিষয়ে পণ্ডিতেরা নিঃসন্দেহ। ড. নীহাররঞ্জন রায় জৈনদের 'আচারাঙ্গসূত্র' গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর ধর্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। ঐ লোকেরা মহাবীরের প্রতি কয়েকটি কুকুরকেও লেলিয়ে দিয়েছিল। এই কুকুর ডাকার সময় এরা ছুছু শব্দ ব্যবহার করে। আজও কুমিল্লা তথা সারা বাংলাদেশের মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করে।

আদি অস্ট্রিক ভাষার বংশানুক্রমিক লতিকা ভাষাতত্ত্ববিদরা নিম্নরূপভাবে দেখিয়েছেন :

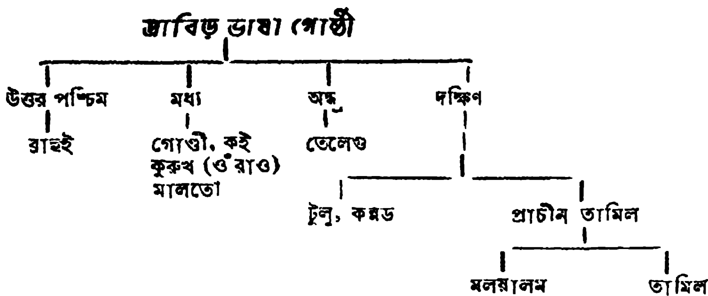
ছক-১

এখানে বাংলা ভাষার উত্তরাধিকার চিহ্নিত নেই। সে কথায় আমরা পরে



আসছি। দ্রাবিড় ভাষাভাষিদের ভাষা থেকেও কুমিল্লা তথা বাংলাদেশের মানুষ প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হতে উদ্ভূত বাংলা ভাষার দ্রাবিড় শব্দগুলোর স্পর্শ কোনদিকে কতখানি লেগেছে তার একটি বিবরণ তাঁর লেখায় দিয়েছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বিভিন্ন নামসহ বাংলা ভাষার অনেক শব্দ দ্রাবিড়দের ভাষা বা দ্রাবিড় ভাষা। যেমন– পাকুড়া, থাওয়া, বড়ুরা (কুমিল্লা), নয়নজুনী শিলিগুড়ি, ভিটাকুণ্ড প্রভৃতি। দ্রাবিড় ভাষাভাষিদের বর্ষা, ঝুড়ি, খর্গ, কুঠাড়, তীর, ধনু, বাটুল, তরবারী, রুটি, কামার, জপ, গম, পুষ্প, পূজা, গরুব গাড়ি, পুতুল, মর্কট প্রভৃতি শব্দ আমাদের সকলেরই চেনা। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারও আমাদের নেই। এ ভাষা গোষ্ঠীর পরিচয় নিম্নরূপ :

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সরাসরি উত্তরাধিকার আমাদের না থাকলেও

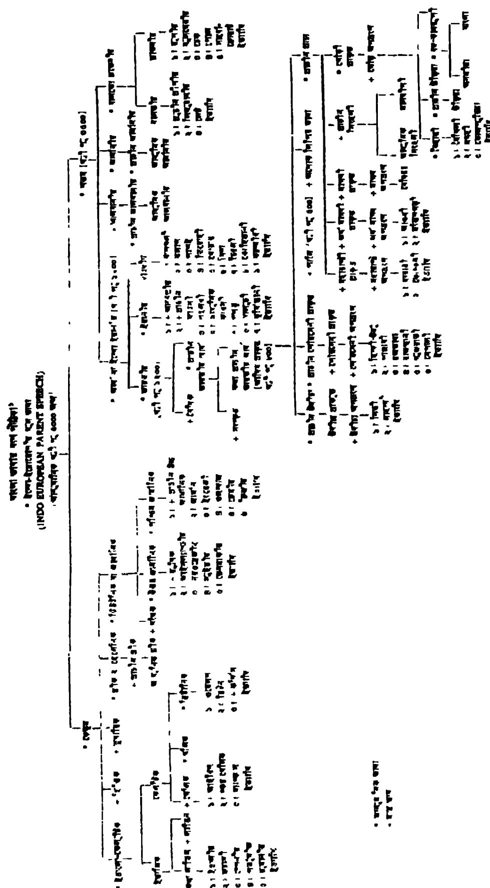


বর্ণিত গোষ্ঠীর লোকেরা আমাদের বর্তমান প্রতিবেশী এবং সুদূর অতীতের আত্মপরিজন (কোম)।

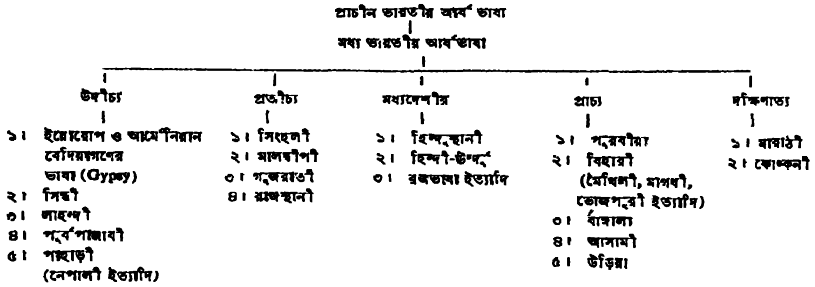
দ্রাবিড়দের পরে বাংলাদেশে এলদো দীনারীও নরগোষ্ঠীর লোকদের আগমণ

ঘটে। এরা আর্য ভাষাভাষি হলেও বৈদিক আর্যরা ঘৃণার চোখে দেখত এবং 'ব্রাত্য' বলে অবহিত করত। বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব তাদের মধ্য থেকে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তাদের ভাষা বাঙালিকে খুব কমই স্পর্শ করেছে বলে মনে হয়।

আধুনিক পণ্ডিতেরা মনে করেন বর্তমান বাংলা ভাষার জন্ম ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠী থেকে। অধ্যাপক হেনরি সুইট মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার অব্দে মূল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা প্রচলিত ছিল। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এ ভাষা প্রচলিত ছিল খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার পাঁচশত অব্দে। তাঁর দেয়া ইন্দো ইউরোপিয় ভাষা গোষ্ঠীর বংশলতিকা নিম্নে দেয়া হলো :

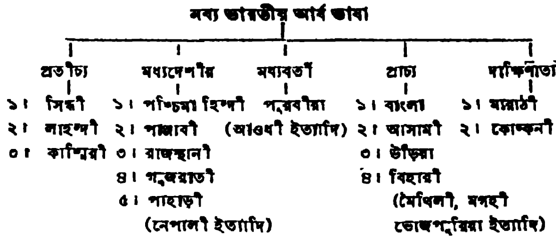


সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিম্নরূপে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন[1]



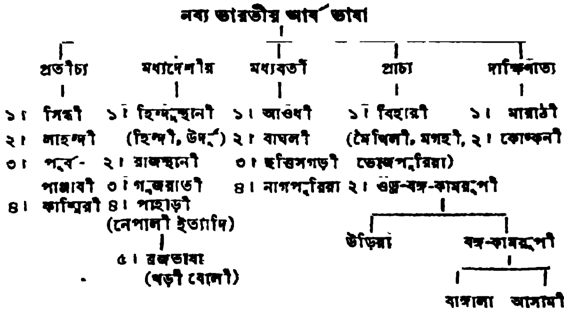
১। Chatterjee, S. K., *Origin and Development of the Bengali Language*, Calcutta, 1926. Vol. I, P. 6

জর্জ গ্রীয়ারসন নিম্নরূপে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন[1]



১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩ [উদ্ধৃত]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোকে নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন[1]



মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ. ৩৪।

ছকে দেখা যায় বাংলা এসেছে বঙ্গ-কামরূপী ভাষা থেকে। বঙ্গ-কামরূপী গৌড় অপভ্রংশ থেকে, গৌড় অপভ্রংশ গৌড়ী প্রাকৃত থেকে, গৌড়ী প্রকৃত প্রাচীন প্রাচ্য থেকে, প্রাচীন প্রাচ্য আদিম প্রাকৃত থেকে (আদিম প্রাকৃত নব্য বা কথ্য ভারতীয় আর্য ভাষা), আদিম প্রাকৃত এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা এসেছে আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা থেকে, আর্যভাষা এসেছে শতম থেকে আর শতম এসেছে ইন্দোইয়োরোপীয় মূল ভাষা থেকে। অনেকেই মনে করেন বাংলা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ছক সে কথা বলে না। সংস্কৃত প্রকৃত পক্ষে মুখের ভাষা নয়, পুস্তকের ভাষা। কিছুদিন আগেও আরেকটি ভুল ধারণা ছিল মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা এসেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলা মাগধী প্রাকৃত থেকে নয়, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে এসেছে। তবে একেবারে সরাসরি আসেনি, এসেছে গৌড় অপভ্রংশ এবং বঙ্গকামরূপী ভাষার পথ পেরিয়ে। পণ্ডিতেরা বাংলাভাষারও তিনটি স্তর বিন্যাস করেছেন : প্রাচীন বাংলা স্তর (৬৫০-১৩৫০ খ্রি.), মধ্য বাংলা স্তর (১৩৫০-১৮০০ খ্রি.) এবং আধুনিক বাংলা স্তর (১৮০০-বর্তমান)। আধুনিক বাংলাভাষার আবার নানা আঞ্চলিক রূপ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষা একটি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রাগমেন্টের ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ থেকে একটি নমুনা সংগ্রহ করে তার রূপান্তর দেখিয়েছেন। নমুনাটি হলো :

তুমি ঘোড়া দেখ – একটি বাক্য

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০-২৫০০)	য়ুস এক্বোম স্পেকিয়েথে
শতম (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-২০০০)	য়ুস এশ্বোম স্পেশিএথে
আর্য (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-১২০০)	য়ুস অশ্বম স্পশ্যথ
প্রাচীন ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৮০০)	য়ুসমশ্বং স্পশ্যথ
বৈদিক	য়ুয়মশ্বং পশ্যথ
সংস্কৃত	য়ুয়ং ঘোটকং (অশ্বং) পশ্যথ
গৌড়ী প্রাকৃত (২০০-৪৫০ খ্রিস্টাব্দ)	তুম হে ঘোড়অং দেক্খহ
গৌড় অপভ্রংশ (৪৫০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ)	তুম হে ঘোড়অ দেক্খহ
প্রাচীন বাংলা (৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ)	তুম হে ঘোড়া দেখহ
মধ্য বাংলা (১৩৫০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)	তুমহি ঘোড়া দেখহ
নব্যযুগ (১৮০০-বর্তমান)	তুমি ঘোড়া দেখ

কুমিল্লার সাধারণ মানুষ বর্তমানে বাক্যটিকে নিম্নরূপে ব্যবহার করে :

তুমি ঘোরা দেহ

ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে শব্দ। বাংলাভাষার শব্দগুলো নানা উৎস থেকে পাওয়া। যেমন, দেশজ শব্দ পাওয়া গেছে অনার্যদের কাছ থেকে। তৎসমশব্দ পাওয়া গেছে সংস্কৃত থেকে। অধিতৎসম পাওয়া গেছে সংস্কৃতের কিছু পরিবর্তিতরূপ থেকে। তদ্ভব শব্দ পাওয়া গেছে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ থেকে। বিদেশী ভাষার শব্দ পাওয়া গেছে ফারসি, তুর্কি, আরবি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি, ফরাসি, গ্রিক, চীনা, জাপানী, হিন্দি উর্দু প্রভৃতি ভাষা থেকে। পণ্ডিতেরা বলেছেন, আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুরীতির ভাষার প্রতি একশ শব্দের মধ্যে দু'টি দেশজ, চুয়াল্লিশটি তৎসম, পঞ্চাশটি অর্ধতৎসম ও তদ্ভব এবং চারটি অন্যান্য ভাষার শব্দ। এছাড়া আদর্শ চলিত রীতির ভাষার মধ্যে শতকরা পাঁচটি খাঁটি দেশজ, দশটি তৎসম, পাঁচটি অর্ধতৎসম, সত্তরটি তদ্ভব, আটটি অন্যান্য ভাষার এবং দু'টি অজ্ঞাত মূলভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, অথচ সকল শব্দই প্রায় সংস্কৃত থেকে পাওয়া এটি কী করে হয়? উত্তর হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা যে উৎস থেকে এসেছে– বাংলাও এসেছে সে উৎস থেকেই। উভয় ভাষাই এক উত্তরাধিকারের অধিকারী। সংস্কৃত লিখিত ভাষা হওয়ায় তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো স্থায়ীরূপ পেয়ে গেছে। অন্যভাষাগুলো মুখের ভাষা হওয়ায় পরিবর্তিত হতে হতে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই শব্দগুলোকে সংস্কৃতের একক সম্পত্তি মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। ভারতীয় আর্যভাষার লেখ্যরূপ থাকলে দেখা যেত শব্দের সম্পত্তিটা সংস্কৃতের নয়, আর্যভাষারই।

অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষা স্থানীয় আদিভাষা ছিল এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য বা বৈদিক ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের প্রভাব এত বেশি ছিল যে দেশীয় ভাষাগুলোর অবস্থান এবং বিস্তার সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক শক্তি ও সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের ধর্মীয় বৈষম্যবোধসহ নানা কারণে নিম্নকোটির মানুষের ভাষা বর্তমানে যেমন হারিয়ে যায় তেমনি অতীতেও হারিয়ে যেতে যেতে সামান্যই অবশিষ্ট আছে। আগে মনে করা হতো বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা। সে বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন নব্য ভারতয় আর্য ভাষার সন্তান প্রাচ্য (গৌড়ী প্রাকৃত) ভাষা, তার সন্তান বঙ্গকামরূপী ভাষা, বঙ্গকামরূপীর সন্তান বাংলা। এক সময় উচ্চবিত্তের ব্রাহ্মণরা প্রকৃত বা দেশীয় ভাষায় অষ্টাদশ পুরানাদি চর্চা নিষিদ্ধ করে এবং প্রচার করে যে, দেশীয় ভাষার কেউ অষ্টাদশ পুরানাদি চর্চা করলে রৌরক নামক নরকে পতিত হবে। দেশীয় ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল দীর্ঘকাল। এজন্যই অতি প্রাচীন কালে অন্যান্য প্রাকৃত বা দেশীয় ভাষার নিদর্শন তেমন একটা পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন (চর্যাপদ) পাওয়া যায় নেপালের রাজদরবার থেকে, বাংলাদেশে নয়।

প্রাচীন যুগের নিদর্শন :

কবি দণ্ডী গৌড় প্রাকৃতে তাঁর কাব্য রচনা করেছেন আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে। তাঁর কাব্যের দুটি শ্লোক নিম্নরূপ :

শৌর সেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যাচ অদৃশী। যাভি প্রাকৃত মিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম।

আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থের দুটি শ্লোক নিম্নরূপ :

কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপেষু নাড়িকের সমুদ্ভবে।
দ্বীপে বারুসকে চৈব নগ্ন বলি সমদ্ভবে ॥"

এটা যদিও সংস্কৃত, এখানে অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলের দুটি শ্লোক নিম্নরূপ :

কাঅ হউ দুব্বল তেজ্জি গরাম। খনে খণে জানি অ অচ্ছ নিশ্বাস।

(কায়া হলো দুর্বল, আহার ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে নিশ্বাস জানাচ্ছে)

চর্যাপদ সন্ধ্যাভাষায় রচিত :

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলি গুহারা তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিএ ধাউ খাট পারিলা সবরো মহাসুখে সেজি খাইলী ॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বসতি করে শবরি বালিকা। শবরির পরিধানে ময়ূরের পাখা। গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না। দোহাই তোমার – আমি তোমরাই গৃহিনী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হলো, গগন স্পর্শ করল ডাল, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী একেলা শবর এ-বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন ধাতুর খাট পাতিল শবর, মহাসুখে বিছানো শয্যা, শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী – উভয়ে একত্রে প্রেমরাত্রি পোহালো।

কবি জয়দেব বাঙালি হয়েও সে সময় সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। নমুনা :

জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।
কোক-কাব্য নবরস-সরস-শৃঙ্গার-কো আগার ॥
অষ্টপদী অভ্রাস করৈ, তিহি বৃদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধারমণ প্রসন্ন হাঁ নিশ্চৈ আবৈ ॥

সন্ত- সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জয়দেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড মণ্ডলেশ্বর আনি কবি ॥

কবি জয়দেব হচ্ছেন চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র। তিন লোকে গীতগোবিন্দ প্রচুরভাবে উজাগর বা উজ্জ্বল হয়েছে। তা একাধারে কোকশাস্ত্র, কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার স্বরূপ। যে এই গ্রন্থের অষ্টপদী অভ্যাস করে তাঁর বুদ্ধি বেড়ে যায়, রাধারমণ প্রসন্ন হয়ে শোনেন এবং নিশ্চয়ই সেখানে এসে বিরাজিত হন। সন্তরূপ কমলদলের পক্ষে তিনি পদ্মাবতী সুখ-জনক্ রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড মণ্ডলেশ্বর মাত্র।

পণ্ডিতেরা মনে মনে করেন ২৩ জন চর্যাকারের মধ্যে বিরূবা ও তাঁর বংশধর বীণাপাদ ছিলেন ত্রিপুরার লোক। বিরূবা ৩নং চর্যার রয়িতা। তাঁর ভণিতা –

এক যে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল ॥
[সেই যে একটি ঘটি, তার সরু নাল।
বিরুআ বলেছেন : চিত্তকে স্থিরভাবে চালিত করো ॥]

বিরূবা লেখেন বজ্রযান ও কালচক্রযানের পুস্তক। তাঁর বংশধর বীণাপাদ লেখেন বজ্রডাকিনী দেবীর গুহ্যপূজার পুস্তক। বীণাপাদ ১৭-সংখ্যক চর্যার রচয়িতা। তাঁর ভণিতা–

বাজই অ লো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন অন্তিধনি বিলসই রূণা ॥
শূণ্যতা-রূপ তন্ত্রীধ্বনি রুণুরুণু শব্দে বিলসিত হচ্ছে ॥

ভুসুকু পাদানাম বাঙালি কবি ছিলেন একথা তাঁর পদেই বলা আছে। তাঁর বাঙলা নিম্নরূপ :

বাজপার পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদতা বঙ্গালে ক্লাশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চডালী লেলী ॥

অঠজ, পদ্মাখালে বজ্রনৌকা পাড়ি বইছে। অদ্বয়-বঙ্গালে ক্লেশ লুটে নিল। ভুসু, তুই আজ (যথার্থ) বঙ্গালী বলে। চণ্ডালীকে তুই নিজ ঘরণী করে নিয়েছিস।

সিদ্ধাচার্য ভুসুকু একাদম শতকের মধ্যভাগের লোক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ভুসুকু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য।

ত্রিপুরা রাজ্যের দলিলাদি বাংলায় লিখিত হত। ব্রিটিশ আমল হতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজকর্ম বাংলায় হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষাকে প্রথম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা

দিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসও বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস 'রাজমালা' বাংলা ভাষায় লেখা হয়।

আরো একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, 'রাজমালা' গ্রন্থের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ লিখেছেন 'রাজাবলি' নামে ত্রিপুরাও প্রাচীন এক প্রাচীন ইতিহাস ছিল, তা আটশত বৎসর পূর্বে বাংলা গদ্য ভাষায় রচিত হয়। এখন এই গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। এটিই নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। তবে তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

সমতট, পট্টিকেরা, হরিকেল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন যুগের জনগণের কি ভাষা ছিল তা আমরা জানি না অনুমানের ওপরে অন্যান্য অঞ্চলের প্রাচীন ভাষার আলোকে তার একটি ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এসে 'রাজমালা' কাব্যেই আমরা কুমিল্লার বাংলা ভাষার প্রথম পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে লাভ করি। 'রাজমালা'র প্রথম লহর–

> বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
> আগমাদি তন্ত্রতত্ত্ব জানের বিস্তর ॥
> চন্তাই কহিল তত্ত্ব শুন নরপতি।
> ত্রিপুর বংশ যেমতে হইছে উৎপত্তি ॥

বুড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। তবে ড. সুকুমার সেন মনে করেন এটি আরও অনেক পরে রচিত।

এই গ্রন্থের ভাষার চাইতে 'রাজমালা'র ভাষা আরও সহজ এবং আধুনিক। এর থেকে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা চর্চার প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। মধ্য যুগে কুমিল্লার ভাষা সমৃদ্ধভাবে ধরা পড়েছে তখনকার পুথিকারদের (কবি) কলমী পুথিতে।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' গ্রন্থে শমসের গাজী পুথি সংকলিত হয়েছে। তাতে ত্রিপুরা রাজ্যে হামলা ও সংঘর্ষের বিবরণ আছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কুমিল্লার কবি দোনাগাজী চৌধুরীর কাব্যে ভাষার পরিচয় এরকম–

> দোনা গাজী চৌধুরী দোল্লাই নামে দেশ।
> রচিত বিরহে পুথি চিত্তেঁ আবেশ ॥
> ...
> কহে দোনা গাজী শুন দুঃখের কাহিনী।
> হৃদএ জলএ অতি বিরহে আগুনি ॥

সপ্তদশ শতকের কবি মোহাম্মদ আকবরের পুথি 'জেবল মুলক শামারোখ'

'মহাম্মদ আকবরে কহে শুনহ রাজন।
প্রভু যাহা লিখিয়াছে না যায় খণ্ডন ॥'

একই শতাব্দীর মুহাম্মদ রফিউদ্দিন মতান্তরে (ড. আহমদ শরীফ) আঠার শতকের কবি। তাঁর ভাষা নিম্নরূপ :

শিরিলব, শামারোখ আর সুনবর
এক পতি কোলে মিলি বঞ্চে পরস্পর।

বিবাদ কলহ নহে সুখের বিরাজ
সুখের নগন ধন্য চামরী সুরাজ।
উজিরেহ নিজ সুত আর বধূমুখ
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কৌতুক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি শেখ চান্দ। তাঁর 'রসুল বিজয়' কাব্যের ভাষার নমুনা –

ফতে মোহাম্মদের সুত শেখ চান্দ নাম।
মুর্শিদ আজ্ঞায় পাঁচালী রচিল অনুপাম ॥

অষ্ঠদশ শতকের শেখ সাদীর (১৭১২ বা ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) পুথি থেকে প্রাপ্ত ভাষার রূপ :

বিষম সংকট মাঝে কেমনে হইমু পার।
স এক সাদিএ কহে মনে করি যার ॥

ঊনিশ শতকের কবি শ্রীমতি ফয়জুন্নেসা চৌধুরী তাঁর 'রূপজালালে' (১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ) গদ্য ও পদ্য দু' ভাষাই ব্যবহার করেন। পদ্যে রূপ :

এই খেদে মন সদা উচাটন
ভাবি কিসে হব শান্ত ॥
রচিনু পয়ার করিতে নিবার
এ বলিনু আদি অন্ত ॥

কুমিল্লার প্রাচীন ও মধ্য যুগের পুথি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এ জন্যই কুমিল্লার পুথি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কুমিল্লার পুথির ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এটি সাধারণ মানুষের ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গদ্য ও পদ্যময় 'রূপজালালে' কাব্যে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাই। এই কাব্যের অনুক্রমণিকা থেকে তাঁর বাংলা গদ্যের নমুনা তুলে ধরা হলো :

> বাংলা পদ্যে লঘু গুরু বিচার না থাকিলেও বৈদিক ছন্দ-সদৃশ অক্ষরসাম্য সর্বঙ্গ কর্তব্য এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার বিকৃত ভাষাই বাঙ্গলা ভাষা। বিবিধ বিকৃতোকারণ দ্বারাই বিবিধ ভাষার উৎপত্তি উত্তম অনুভূত হয়। যদ্রুত পৌরাণিক পদ্যে গুরু লঘু সাম্য ও কীর্ত বর্ণান্ত বিরতি আবশ্যক, তদ্রুপ বাঙ্গালা পদ্যেও পদান্ত প্রভৃতি বর্ণ সাম্য ও কতি বর্ণান্ত বিরতি প্রয়োজনীয়। এতদনুসারেই এই সংশোধন কার্য কর্তব্যবোধ হইল।

ধর্মমাণিক্য প্রদত্ত ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি তাম্রলিপিতে বাংলা গদ্য লিপির

নমুনা পাওয়া যায়। নমুনা নিম্নরূপ :

প্রথম পঙ্ক্তি – শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাণিক্য দেব বিষম সমরবিজয়ী রাজনামা দেশো

দ্বিতীয় পঙ্ক্তি – শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতে হন্যাত রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগনে মেহারকুল

তৃতীয় পঙ্ক্তি – মৌজে গোবিন্দপুর ও কান্দির পাড় কাজি মুমিন ও কাজি মনসুর ও কাজি হুসেন ও কাজি য়লি এহারারে

চতুর্থ পঙ্ক্তি – .৫ll। পাঁচ দ্রোণ বার কানি ভূমি আএমা দিলাম হাসিলা বার কানি জঙ্গল

প্রথম পঙক্তি স্বীস্ত শ্রীশ্রীযুক্ত গোবিন্দমাণিক্য দেব বিষম সমরবিজয়ী মহোদয়ী রাজনামা দেশো

দ্বিতীয় পঙক্তি মেহারকুল মৌজে ষোলনল আজ হাসিলা জমা ১৯ আঠার কান ভূমি শ্রীনরসিংহ সর্মারে

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে নূরনগর পরগণার মালিক মুরাদ বেগ যে সনদটি দিয়েছিলেন তার নমুনা নিম্নরূপ :

"৭ স্বস্তি :- শ্রীলশ্রীযুক্ত মুরাদ বেগ... আনাং শ্রীকারকোনবর্গে সমাজ্ঞেয়ং... পরং মুদাকাত ণূরনগর (হাল) মুরাদনগর ডিহি কুকি হা[ল] মৌজে সুলতানপুর ও নওয়ামুড়া অমুঙ্গল আবন্দ করাইবার পাট্টা শ্রীমধুসুদনকে পুত্র পৌত্র তাঁর পুরুষানু দ্রোণ প্রতি শিক্কা ৪ চারি রূপাইয়া দিবা এই জমিন আবাদকর ও খানেবাড়ির ভোগ স্বত্ব অজ্জাঙ্গুলী মুরাদনগরের দস্তুর পাইবা আমিও তোজি মাহাফিক পাইব। ইতি ১১২৩ তারিখ ১ কার্তিক' (নভেম্বর ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) রাজমালা ৫৬০ পৃ.।

১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ) শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'রাজমালা' বা ত্রিপুরার ইতিহাস রচনা করেন গদ্যে। এই গদ্যের নমুনা –

'কামরূপ ও রাক্ষিাং[১] দেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রাচীন আর্য্যগণ সুহ্ম আখ্যা দান করেন। ইহার অন্য নাম কিরাত দেশ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভারতের "পূর্বদিকে কিরাতের বাস।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, লৌহিত্যবংশীয় মানবদিগকে আর্য্য ঋষিগণ কিরাত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।'

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁর Linguisties Survey of India গ্রন্থে (পৃ. ২৪৪) ত্রিপুরা উপভাষার নমুনা দেখিয়েছেন নিম্নরূপে :

[No 53]

INDO-Aryan Family (Eastern Group) Bengali or Bangla Bhasha Eastern Dialect (Tippera District).

দরমবতার। আমার ইউরিবে আস্সলে মারি না, মিত্যা নালিস করে। তান ফুতে আমারে মাচ্ছে; আমি গেছে মঙ্গলবার দিন ছুব্রে পাঁয়রে চোঁয়া চোর্তো বুলি গেচিলাম। মাদানে বাড়িৎ তাইয়ার দেখি আমার জননা বাড়িৎ নাই;

এই নমুনাটি উনিশ শতকের।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ Civilianরা এদেশের আঞ্চলিক বা

উপভাষার প্রতি নজর দেন। J.E. Browne, O.S. H.C. Sutherland B.C.S., J.D. Anderson প্রমুখ সিভিলিয়নগণের লেখায় নৃতত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতির পাশাপাশি ভাষার প্রসঙ্গটি আসে। ১৮৬১ সালে ব্রাউন ত্রিপুরা জেলা সম্পর্কিত রিপোর্টে এতদঞ্চলের প্রচলিত উচ্চারণের উদাহরণ তুলে ধরেন। গ্রিয়ার্সন H.C. Sutherland-এর ক্যালকাটা রিভিউতে মুদ্রিত লেখা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে বলেন, ত্রিপুরার ভাষা উচ্চারণের দিক থেকে অদ্ভুত ধরনের :

> On the page 329 of Vol. XXXV of the Calcutta Review. There is a short account of the Peculiarities of the pronouncjation of the dialect in the Tippera District by Mr. H.C. Sutherland B.C.S

গ্রিয়ার্সন Lingaistics Survey of India গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ১ম পর্বে প্রথম বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষার সঙ্গে ত্রিপুরা অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে ২৩৯-২৪৬ পৃ. পর্যন্ত একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি নব্যভারতীয় আর্য ভাষার পূর্বশাখার সকল ভাষার বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করে ত্রিপুরার ভাষাকে সে দলভুক্ত করেন। গ্রীয়ার্সনের প্রায় সমসাময়িক কালে Webster (ওয়েবস্টার) ১৯১০ সালে ইস্টার্ন বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ত্রিপুরায় কুমিল্লার উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। ডিপি পত্রনায়ক, নীলমাধবসেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঢাকা, সিলেট, নোয়াখালী চট্টগ্রাম প্রভৃতি উপভাষার সঙ্গে ত্রিপুরার ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন।

তবে ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষা নিয়ে ভাষা ভাষার প্রথম আলোচনা করে শ্রী গৌরচন্দ্র গোপ। ড. মনিরুজ্জামানের মতে এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক রচনা। ১৯২৭ সালে (১৩৩৪) এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার উদাহরণসহ এই অঞ্চলের পারস্পরিক উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা আছে এই রচনাটিতে।

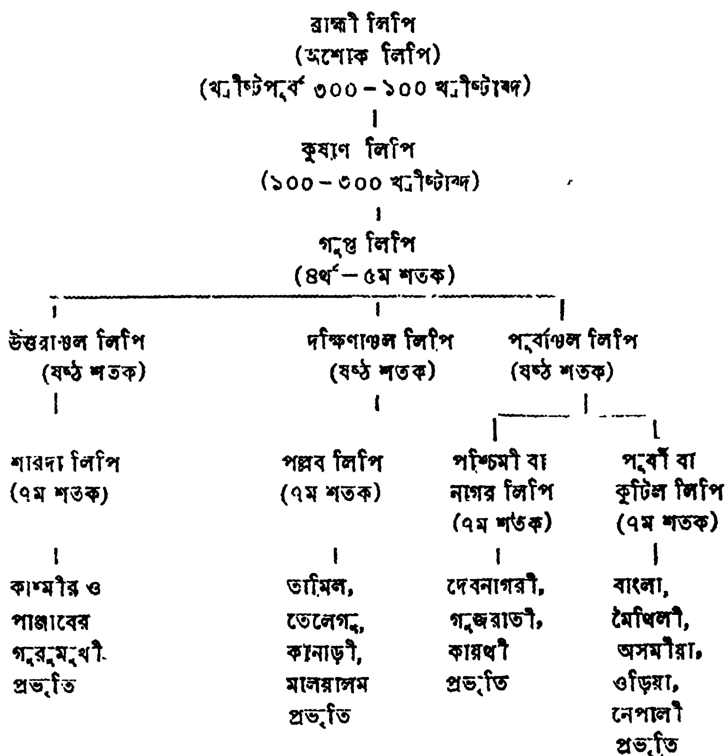
ড. মনিরুজ্জামান মনে করেন বাংলা লিপি ব্যবহার ও প্রথাগত বানান পদ্ধতিতে উদাহরণ উল্লেখ করায় ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয়ে কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা অবলম্বন না করায় গ্রন্থটি ভাষা গবেষকদের দৃষ্টি পথে কখনও সমাদৃত হয়নি।

কুমিল্লা পল্লীউন্নয়ন একাডেমীর উদ্যোগে কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার সন্ধান জানার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুনীর চৌধুরী এই সমীক্ষা পদ্ধতির ছকটি অনুমোদন করেন বলে জানা যায়। তবে কুমিল্লার উপভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন ড. মনিরুজ্জামান। কুমিল্লা জেলার ইতিহাসে এই আলোচনাটি স্থান পায়। এই আলোচনায় সহায়তা ছাড়াও মূল Infurmant হিসেবে কাজ করেন বর্তমান লেখক। এই প্রবন্ধে কুমিল্লার উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য অঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, উত্তর মধ্যাঞ্চল এবং চরাঞ্চলের ভাষার নমুনা Text হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এছাড়া

ভাষার ধ্বনি ও রূপমূল নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক আলোচনা আছে। আমাদের বিবেচনায় কুমিল্লার উপভাষা আলোচনায় এটিই এযাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ আলোচনা। বাংলা একাডেমী ড. হুমায়ুন আজাদের সম্পাদনায় বাঙলা ভাষা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন বের করে। এই সংকলনে সপ্তম ভাগে উপভাষাতত্ত্ব নিয়ে জর্জ গ্রিয়ার্সন, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রাজকুমার কাব্যভূষণ, পরমেশ প্রসন্ন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মনিরুজ্জামান এবং রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই প্রবন্ধগুলোর সঙ্গে ড. মনিরুজ্জামানের ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলের উপভাষা আলোচনার পাশাপাশি কুমিল্লার উপভাষার ওপর ড. মনিরুজ্জামানের আলোচনাটি উজ্জ্বল বলে মনে হয়। ভবিষ্যতের পাঠকদের সুবিধার্থে কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার রূপ (যা ড. মনিরুজ্জামানের লেখায় ব্যবহার করা হয়েছে) পরিশিষ্ট 'ক'-তে তুলে ধরা হলো। সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্বের বাইরে ভাষার ইতিহাসের যে একটা গুরুত্ব রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয়বিধ আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত একটি কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক যে বাংলা লিপি এল কোথা থেকে। পৃথিবীর প্রাচীনতম লিপি হচ্ছে সুমেরীয় ও মিশরীয় লিপি। পণ্ডিতদের মতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এর উদ্ভব। প্রায় চার হাজার বছর আগে সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা ও ময়েঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে সিন্ধু লিপি। প্রাচীন ভারতের বর্ণমালা দু'টি খরোস্টি এবং ব্রাহ্মী। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। তবে সরাসরি নয়। ব্রাহ্মীলিপি থেকে কুশাণলিপি, কুশাণলিপি থেকে গুপ্তলিপি, গুপ্তলিপি থেকে পূর্বাঞ্চল লিপি, পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বীলিপি এবং তার থেকে বাংলা লিপি। প্রাচীনকালে বাংলা লিপির দু'টি পরিচয় পাওয়া যায়– পাললিপি এবং সেনলিপি। কেউ কেউ মনে করেন দেবনাগরী লিপি থেকে বাংলা লিপি এসেছে। তা পণ্ডিতেরা ভুল প্রমাণ করেছেন (ছক দ্রষ্টব্য)। শিলালিপি এবং পুথির লিপির মধ্যে উপকরণের ভিন্নতার জন্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ময়নামতির মূর্তিলেখের হরফ কিংবা তাম্রশাসনের হরফের সঙ্গে তালপাতার পুথির হরফের পার্থক্য অনেক। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন ব্রাহ্মণরা পশ্চিমাধাচে শিলালিপি এবং বৌদ্ধরা পূর্বী ধাচের হরফে পুথি রচনা করেছেন। কুমিল্লায় উভয় ধরনের হরফ ব্যবহৃত হয়েছে। কুমিল্লার কলমী পুথি খুবই বিখ্যাত। কবি বলতেন অথবা খসড়া দিতেন লিপিকররা লিখতেন। একই পুথি তাই ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে দেখা গেছে। লিপিকর নিজের লেখার স্টাইল বজায় রাখার চেষ্টা

ছক : ১


ব্রাহ্মী লিপি
(অশোক লিপি)
(খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ – ১০০ খ্রীষ্টাব্দ)
কুষাণ লিপি
(১০০ – ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ)
গুপ্ত লিপি
(৪র্থ – ৫ম শতক)
উত্তরাঞ্চল লিপি
(ষষ্ঠ শতক)
দক্ষিণাঞ্চল লিপি
(ষষ্ঠ শতক)
পূর্বাঞ্চল লিপি
(ষষ্ঠ শতক)
শারদা লিপি
(৭ম শতক)
পল্লব লিপি
(৭ম শতক)
পশ্চিমী বা
নাগর লিপি
(৭ম শতক)
পূর্বী বা
কুটিল লিপি
(৭ম শতক)
কাশ্মীর ও
পাঞ্জাবের
গুরুমুখী
প্রভৃতি
তামিল,
তেলেগু,
কানাড়ী,
মালয়ালম
প্রভৃতি
দেবনাগরী,
গুজরাতী,
কায়থী
প্রভৃতি
বাংলা,
মৈথিলী,
অসমীয়া,
ওড়িয়া,
নেপালী
প্রভৃতি

ছক : ২

অশোক-লিপি থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি পর্যন্ত

লিপি	বর্ণরূপ
অশোক-লিপি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী	[illegible]
কুষাণ লিপি খ্রীষ্টীয় ১ম ২য় শতাব্দী	[illegible]
গুপ্ত-লিপি খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী	[illegible]
পাল-লিপি খ্রীষ্টীয় ১০-১১শ শতাব্দী	[illegible]
সেন-লিপি খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রথম পাদ	[illegible]
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৯৯ সংখ্যক পুঁথি ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত	[illegible]
বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন	[illegible]
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি [illegible] শতাব্দীর লিপি ১৫	[illegible]

পরিশিষ্ট-ক

কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার একটি রূপ নিম্নে তুলে ধরা হলো। চলিত ভাষায় তা নিম্নরূপ :

একটি শৃগাল গর্তে পড়ে কোনো রকমেই উঠতে পারছিল না। সন্ধ্যায় তার বন্ধুরা এসে তাকে বলল, বন্ধু কোনোরকমে তুমি রাতটা কাটিয়ে দাও। কাল সকালে তোমাকে উদ্ধার করব। কিন্তু তোমার গায়ে যে অনেক মশা আছে সেগুলো তাড়িয়ে দেই।

শৃগালটি বলল, না বন্ধুগণ, এ কাজ করো না। আমার রক্ত খেয়ে তাদের পেট ভরে গেছে। এখন তারা আর বেশি রক্ত খেতে পারবে না। তাদেরকে তাড়িয়ে দিলে নতুন আর এক দল ক্ষুধার্ত মশা এসে তাদের স্থানে বসবে এবং আমার বাকি রক্ত সব চুষে খেয়ে ফেলবে।

উ. : উগ্‌লা হিয়াল গাতাত পইরা কোন রহমেই উঠ্‌থ পার্‌তা আছিল না। হাইঞ্জালা থের দোস্তেরা আইয়া কইল, দোস্‌, কোনো রহমে তুমি রাইতডা কাডাইয়া দেও। কাইল বিন্নালা তোমারে আমরা তুইলা আনুম। কিন্তু তোমার গতরে যে লাজ্যান মশা আছে হেগুলি দৌড়াইয়া দিয়া যাই। হিয়াল্যা কইল, না দোস্তরা, একাম কইর না। আমার লক্ত/ লউ হাইয়া হেরার পেড ভইরা গ্যাছে। অহন আর বিশি লউ হাইতে পাইরত না। তারারে দৌড়াইয়া দিলে নোয়া আরেকদল উপাইস্যা মশা আইয়া তারার জাগাত বইব আর আমার বাহি হগল লউ হাইয়া লাইব।

উ.প. : একটা হিয়াল্যায় গাতাত পইরা কোনু রহমেই উট্‌ত পারছিল না। হাঞ্জ্যালা হের দোস্তেরা আইয়া কইল, দোস্‌, তুমি কোন রহমে রাইত্‌ডা কাডাইয়া দেও। আইয়ে কাইল বেইন্নালা তোমারে আমরা উদ্ধার কইরাম। কিশুক তোমার গাব্‌ত যে দুইল্যার মোশা আছে হেইগুলাইনরে খেদাইয়া দিয়া যাই। হিয়াল্যায় কইল, না দোস্তরা, তোমরা এই কাম কইর না। আমার লউ খাইয়া হেরার পেড বইরা গ্যাছে। অথবা হেরা আর বেশি লউ খাইত পারত না। হেরারে খেদাইয়া দিলে নয়া আরেকদল উপাইস্যা মোশা আইয়া হেরার জাগাত্‌ বইব আর আমার বাকি লউ সব হুইয়া খাইয়া লাইব।

ম. : একটা হিয়াল গাঁতাত পইর‍্যা কোন রহমেই ওট্‌তে পারতে আছিল না। হাইঞ্জ্যা আলা তার দোস্তেরা তারে আইয়া কইলো, দোস্ত, তুঁই কোন রহমে

রাইতরা কাডাইয়া দেও। আইরে কাইল্ বেইন্নালা তোঁয়ারে উদ্দার কইর‍্যাম। কিন্তু তোঁয়ার গাঁও যে আগমা মোশা আছে হিগ্গি দৌড়াইয়া দিয়া যাই।

হিয়ালডা কইলো, না দোস্তেরা এই কাম কইরো না। আঁর খুম খাইয়া তারার হেড্ ভইর‍্যা গেছে। তহন তারা আর বেশি খুম খাইতে পারত না। ইগ্গিরে দাওয়াইয়া দিলে নোয়া আর এক পাল উপাইশ্যা মোশা আইয়া তারার জাগাত বইবা আর আঁর বাঁহী খুম সব শুইস্যা খাইয়া হালাইব।

চ. : একটা হিয়াল গাতাত পইরা কোন রহমেই উঠ্তে পারতে আছিল না। হাইঞ্জালা হেতার বন্ধুরা আইয়া কইল, তুমি কোন রহমে রাইত্টা কাডাইয়া দেও। কালকা বিন্যায়লা তোমারে তুইল্যা নিমু। কিন্তু তোমার শৈল্যে যে রাজ্যের মশা আছে হেগুলি খেদাইয়া দিয়া যাই।

হিয়ালডা কইল, না বন্ধুরা, একাম কইর না। আমার লউ খাইয়া অগো পেড বইরা গ্যাছে। অহন আর বেশি লউ খাইতে পারত না। হেগোরে কেধাইয়া দিলে নতুন আর এক দল উপাইস্যা মশা আইয়া অগো জায়গায় বইব আর আমার বাকি লউ শুষ্যা খাইয়া লাইব।

দ.ম. : এক হেতিয়াল খাদ হড়ি কোন রকমেই আর উট্তে হাইত্তে আছিল না। হাঞ্জে তার বন্ধুরা আসি তারে কইল, তুঁই কোন রমে রাইতটা কাডাইয়া দেও। আইয়ে কাইল হোয়ালে তোয়ারে উডাইয়াম। কিন্তু তোয়ার গা-তে যে এত মশা আছে এডিনার এখন দাওয়াই দিই।

হেতিয়াল কইল, না বন্দুরা, এ কাম করিও না। আঁর রক্ত খাই এডিনের হেট হুড়ি গেছে। এখন আর বেশি রক্ত খাইতে হাইও নো। এডিনরে দৌড়াই দিলে নতুন আর এক দল উহাইশ্রা মশা আই তাগো জাগাত বইব আর আঁর বাঁই রক্ত সব শইষ্যা খাই লাইব।

দ. : উগ্যা হিয়াল এক কাদে হরি কোন রমে উঠতো হাইরতে আছিল না। হাইঞ্জে তার বন্দু অগল আই হেতেরে কইল, তুঁই কোন রমে রাইতখান কাডাই দে। কাউল্যা বেনে তোওরে উদ্দার করুম। কিন্তু তোওর গা-ত্ সে মোশা আছে হেগুন দুড়াইদি যাইয়ের।

হিয়ালগা কইল, না বন্দুরা, এই কাম করিও না। আঁর ঘুম খাই হেতের গো হেট হুরি গেছে। অন আর বেশি ঘুম খাইত হাইত্যন। হেগুনরে দুড়াই দিলে নোয়া করি আর এক গুন মোশা আই আগের গুনের জাগাত বইব আর আঁর বাঁইয়া রক্ত গেইন ছুই খাই হালাইব।

উত্তর-মধ্যাঞ্চল (উ.ম.) : মুরাদনগর (মধ্য ও দক্ষিণ), দেবীদ্বার, চান্দিনা (উত্তর),

বুড়িচং (পশ্চিম)।

একটা হিয়াল গাতাত পইরা কোন মতে উঠ্ত পারতেছে না। হাইন্জালা তার বন্দুরা আইয়া তারে কইল, তুই কোন মতে রাইত্টা কাড়াইয়া দে। কাইল্কা বেইন্নালা তরে তুইল্লাম। কিন্তু তর গত্র যে রাইজ্জার মোশা আছে এইডিরে হরাইয়া দিয়া যাই।

হিয়ালডা কইল, না বন্দুরা, এই কাম কইর না। আমার রক্ত খাইয়া তারার পেড বইরা গ্যাছে। অহন আর বেশি রক্ত খাইত পারত না। তারারে হরাইয়া দিলে নয়া আরেকদল পেড বুখ অলা মোশা আইয়া তারার জাগাত বইব আর আমার বাহী রক্ত সব চুইয়া খাইয়া লাইব।

প্রাচীন ধর্ম

মানুষের ধর্ম-কর্মের চর্চা মানুষের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন। সমতট অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের ধর্ম কী ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে জানা যায় না। অন্যান্য দেশের আদিবাসীদের মতো ভারতীয় সকল আদিবাসী বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল-ফুল, পশু-পাখি, বিশেষ বিশেষ স্থান প্রভৃতির ওপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করতো। এখনও খাসিয়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী ইত্যাদি কোমের লোকেরা তাই করে থাকে। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজেও তুলশী, শেওড়া, বটগাছ ইত্যাদির পূজা হয়। আমাদের দেশের শুভ কাজে আমপাতার ঘট বসানো হয়। ধান, দুর্বা, হলুদ ইত্যাদির কুলায় পসরা নিয়ে নতুন বউ আসলে স্বাগত জানানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত তা প্রাক্ দ্রাবিড় অস্ট্রিক ভাষাভাষি লোকদের অবদান। মুসলমান সমাজেও এগুলো লক্ষ করা যায়। তবে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজে তার পরিধি বড়। কলা, হলুদ, সুপারি, পান, নারকেল, সিন্দুর, কলাগাছ, ঘট, ঘটের ওপর আঁকা প্রতীক চিহ্ন, গোবর, কড়ি তাদের কুলায় ও বিশ্বাসে স্থান পায়। বিয়ের পান-খিলি, গায়ে হলুদ, গুঁটি খেলা, খৈ ছড়ানো নানারকম আচার-আচরণের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের ভিত লুকায়িত। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঘট লক্ষ্মীর পূজা, ষষ্ঠী পূজা, মনসা পূজা, শিব পূজা, ভৈরবী পূজা, কালী পূজা প্রভৃতি আদিবাসীদের ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠান থেকেই পাওয়া বলে ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন।

মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, ইন্দ্রজালিকতা, তন্ত্র-মন্ত্র, টোটেম-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য ও ভূমির মধ্যে নিহিত শক্তির পূজা, রোগ-ব্যাধি, দুর্ঘটনা প্রভৃতি দুষ্ট শক্তি, ভূত-প্রেতের আছর, মঙ্গল-অমঙ্গল ভাবনা ইত্যাদি বিশ্বাস ও বিধি-নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক অনুশাসন নিয়েই প্রাক্ দ্রাবিড় ধর্ম বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কার এসব আলাদা করে দেখা সত্যিই তখন খুব কঠিন ছিল। শিক্ষা বলতে প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ওপর অর্জিত জ্ঞানকে বোঝানো হতো।

পৌষ-পার্বণ, নবান্ন, রথযাত্রা, স্নান যাত্রা প্রভৃতি উৎসবকে ধর্মীয় উৎসব বলে মনে করা হতো। আদি বাঙলায় সুনির্দিষ্ট কোনও ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না। সমতট এলাকার যে প্রাচীনত্বের কথা আমরা বলেছি তা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক কাল কিংবা প্রস্তর যুগের আদি মানুষেরা প্রকৃতি নির্ভর ধর্মবিশ্বাস লালন করেছেন। ইতিহাস যুগের প্রথম দিকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আরও নানা মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বাঙলার অন্যান্য প্রাচীন বা আদি অধিবাসীদের মতোই এরা অনার্য ধর্মের দীক্ষা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

প্রাচীন বঙালার ধর্ম সাধনার ওপর লেখা বই-পত্র থেকে জানা যায় প্রাক্ আর্য

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্ম। গুপ্ত যুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে সবলভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। বহিরাগত ধর্মের মধ্যে জৈন ধর্ম প্রথম বাংলাদেশে শিকড় গেঁড়েছিল। এ ধর্মের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে বেশি পড়ে থাকলেও পূর্ববঙ্গে কম-বেশি ছড়িয়ে পড়ে। জৈন গ্রন্থ আচারঙ্গসূত্রে বলা হয়েছে এ ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মহাবীরকে প্রচুর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেয়ার কথা জানা যায়। তারপরও জৈনদের ষোড়শ জনপদের তালিকায় অঙ্গ-বঙ্গের নাম রয়েছে। সমতটের নাম পাওয়া যায় না বটে কিন্তু হিউয়েন সাঙ বৈশালী, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট ও কলিঙ্গ দেশে অসংখ্য জৈন সন্ন্যাসী দেখেছেন। এটি সপ্তম শতকের কথা। সমতটে তিনি জৈন দ্বিগম্বর সম্প্রদায়ের লোকজনকে দেখেছেন। দ্বিগম্বর জৈনরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করতো। দোহাকোষে জৈন সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে সরহপার একাধিক পদ রয়েছে।

১. দীহণকখ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
নগগল হোই উপাড়ি অ কেসেঁ ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ ॥

দীর্ঘন যোগী মলিন বেশে নগ্ন হয়ে কেশ উপড়ায়। ক্ষপণকেরা (জৈন-সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজেদের বয়ে নিয়ে চলে।

২. জই নগ্গা বিঅ হোই মুক্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণো অত্থি সিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥
পিচ্ছী গণহে দিঠ্ঠ মোক্খ [তা মোরহ চমরহ]
উঞ্ছেঁ ভো অঁণো হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গাহ ॥

নগ্ন হলেই যদি মুক্তি হতো, তাহলে কুকুর শেয়ালেরও হতো, লোম উপড়ালেই যদি সিদ্ধি আসত তাহলে যুবতীর নিতম্বের সিদ্ধিলাভ ঘটত। পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যেত, তাহলে ময়ূর-চামরেরও মোক্ষ দেখা হতো। উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হতো, তাহলে হাতি-ঘোড়ারও হতো।

মহাবীরের এক বন্ধু মখলিপুত্র গোসাল আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। এ ধর্ম প্রাচীন বাংলাদেশের সর্বত্রই কম-বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন পানিনি কর্তৃক উল্লিখিত মস্করিন ও আজীবিক ধর্ম অভিন্ন এবং খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আজীবিকরা তাদের ধর্ম প্রচার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের দেখেছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি এদেরকে জৈন বলে ভুল করতেন। সমতটের আজীবিকরা সম্ভবত নাথপন্থীদের

সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। 'সংযুক্তনিকায়' বলা হয়েছে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনে ধর্ম প্রচারে এসে বুদ্ধ ৬ মাস অবস্থান করেছিলেন বলে 'বোধিসত্ত্বকল্পলতা' গ্রন্থে বলা হয়েছে। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি নিবন্ধে হিউয়েনসাঙ বাংলাদেশে বুদ্ধের বসবাস সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন। তাঁর মতে বুদ্ধ ৩ মাস পুণ্ড্রবর্ধনে এবং ৭ দিন সমতট ও কর্ণসুবর্ণে বাস করেছিলেন। এর তথ্য সূত্র অবশ্য তিনি উল্লেখ করেননি। তবে বিবরণে আরও জানা যায় তিনি সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ সমতট, তাম্রলিপি ও কর্ণসুবর্ণে দেখেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, সমতটে তিনি ৩০টি বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। গুনাইঘর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ কঙ্গজলে, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য লক্ষ করেছিলেন। আর এক চৈনিক পরিব্রাজক সেঙ চি সমতটে এক বৌদ্ধ রাজবংশকে সিংহাসনে আসীন থাকতে দেখেছেন। সমতটের দু একজনের কথা বাদ দিলে সকল রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মহাযান, বজ্রযান, কালযান, সহজযান প্রভৃতি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্রমশীলা মহাবিহারে বজ্রযান নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। জানা যায় সহযানের প্রবর্তক ছিলেন একজন বাঙালি। নাম লুই পাদ। তাঁকে সিদ্ধাচার্য বলা হতো। আরেকজন বাঙালি যাঁকে তিব্বতিরা মানসীবুদ্ধ বলে পূজা করে, তিনি হচ্ছেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বাংলাদেশের আর এক জনপ্রিয় ধর্ম নাথধর্ম। এর আবির্ভাব ঘটে দশম শতকের শেষ কিংবা একাদশ শতকের শুরুতে। এটি শৈব ধর্মেরই শাখা বিশেষ বলে মনে করা হয়। নাথ ধর্মাবলম্বীদের আদিপুরুষ মীননাথ। কায়া সাধনা এই ধর্মের প্রধান কথা। নাথ ধর্ম মূলত বাংলাদেশের নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে তা রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করে। নাথ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নাথসাহিত্য। তা থেকে জানা যায় মীননাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ, গোরক্ষনাথের শিষ্য রাণী ময়নামতি, রাণী ময়নামতির পুত্র গোঁপীচন্দ্র। নাথ ধর্ম সমতট অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে রয়েছে রাণী ময়নামতির বড় অবদান। নাথ সাহিত্যে রাণী এবং তাঁর পুত্রের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানা যায়। বর্তমানে নাথ ধর্মাবলম্বীরা যোগী হিসাবে চিহ্নিত। পালযুগে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রবল বিস্তৃত ছিল। তিনি মূলত গ্রাম দেবতা। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাই ছিল তাঁর ভক্ত।

পরে রাজ-রাজারাও তাঁর পূজা করেছে। ধর্মঠাকুর কে এ নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে বৌদ্ধ, কেউ কছপ, কেউ যম, কেউ সূর্য, কেউ বিষ্ণু, কেউ বরুণ ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর পূজায় পৌরহিত্য করার অধিকার ছিল একমাত্র ডোম জাতির।

প্রাচীন বাঙালির ধর্মের ইতিহাসে শিব ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। শিবের উপাসকরা ছিলেন শাক্ত। শিবের প্রচুর ভক্ত এখনও বাংলাদেশে রয়েছে। এই শিব আর্য দেবতা হিসাবেও স্বীকৃত, বাংলাদেশের বহু জায়গায় বিশেষ করে সমতট অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

শিবকে ব্যাপকভাবে স্বীকার করে নেবার আগে আর্য সমাজে ভাগবত ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিষ্ণু হচ্ছেন এ ধর্মের দেবতা। যাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করেন এঁরা 'বৈষ্ণব'। মহাভারতে তাঁদের কথা আছে। ধর্মের মূল তত্ত্ব পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যেও। বৈষ্ণব ধর্ম একটি তাত্ত্বিক ধর্ম। এ ধর্মে বলা আছে ভগবান প্রেমস্বরূপ। তাঁকে পেলে আনন্দলাভ ঘটে। বৌদ্ধের অনেক আগেই এই ধর্ম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এ ধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল চন্দ্রগুপ্তদের আমলে আসা গ্রিক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে। মেগাস্থিনিস হেরাক্লিস দেবতার আরাধনার কথা বলেছেন। হেরাক্লিস আসলে 'হরেকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ অনার্য ছিলেন। তক্ষশীলার অধিবাসী হেলিয়দোরাস নামক এক গ্রিক আনুমানিক ১১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য প্রদেশের বেস নগরে বিরাট এক গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন এবং নিজেকে ভাগবত সম্প্রদায়ের লোক বলে পরিচয় দেন। বাংলাদেশে বহু মহারাজা বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। সেন বংশের রাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। এসময়েই সম্ভবত সমতট অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লাভ ঘটে। লক্ষ্মণ সেন 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার মধ্য যুগেও দেখা গেছে। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

আর্যরা নিয়ে এসেছিলেন বৈদিক বা সনাতন ধর্ম। বাংলাদেশে আর্য এবং ব্রাহ্মণদের আগমণ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের অনেক পরে। সমতটে তাদের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে আরও পরে। তবে এই ধর্মের প্রসার ও প্রভাব মুসলমানদের আগমণের আগ পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃত ছিল। গুপ্তদের সময়ে এবং পরবর্তীকালে লালমাই-ময়নামতির কোনও কোনও রাজা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁদের সময়ে এবং তাদের আগেও সনাতন ধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটে থাকবে। গুপ্ত যুগের গুনাইঘর তাম্রশাসন (৫০৭-৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে জানা যায় গুপ্ত সম্রাট বৈন্যগুপ্ত শৈব ধর্মাবলম্বী হিন্দু নরপতি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান করেছিলেন। ভাস্কর বর্মার নিধনপুর তাম্রশাসনে দেখা যায় ভূতি বর্মার রাজত্বকালে

সিলেট জেলার পঞ্চখণ্ড গ্রামে দুশ'রও বেশি ব্রাহ্মণ পরিবারকে আহ্বান করে এনে বসানো হয়েছে। এটি ছিল ষষ্ঠ শতক। ঐ সময়েই বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ পূর্বতম প্রান্তে এসে পৌছে যায়। সপ্তম শতকের লোকনাথ পট্টলিতে দেখা যায় সমতটের বর্তমান ত্রিপুরা জেলার জঙ্গল কেটে নতুন বসতির পত্তন করে সেখানে বসানো হয়েছে চতুর্বেদবিদ ব্রাহ্মণদেরকে। জানা যায় সমতটের ভদ্র বংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ রাজ-বংশ। মহাস্থবির শীলভদ্র এ বংশের সন্তান বলে মনে করা হয়। সমতটের খড়গ বংশের আমলে কুমিল্লার দেউলবাড়ি নামক স্থানে একটি প্রাচীন ধাতুময়ী সর্বাণী (দুর্গা) মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিলেখ থেকে জানা য়ায় রাজা দেবখড়গের স্ত্রী এই মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। খড়গ রাজারা কিন্তু বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। সর্বাণী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা থেকে জানা যায় রাণী হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। লোকনাথের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় লোকনাথের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদোষশর্মা সুবর্ণ বিষয়ের অরণ্যময় ভূমিতে অনন্ত নারায়ণের এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তারই সন্নিকটে চতুর্বেদবিশারদ দু শতাধিক ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করেছিলেন। সমতটের রাত রাজবংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। তবে শ্রীধারণ রাত নিজে ছিলেন বৈষ্ণব এবং পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক। সমতটের বর্মণ রাজবংশের রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ভোজবর্মা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর উপাধিতে 'বৈষ্ণব' কথাটির উল্লেখ আছে। সেন বংশের রাজাদের সময়ে সমতটে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপক বিস্তার লাভ ঘটে এবং সমাজের নানা শ্রেণী বিন্যাসের সৃষ্টি হয়।

হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার সম্পর্কে যে কথা বলে গেছেন তা তথ্যবহুল এবং সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। বৌদ্ধ ধর্ম সাধনার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলো দেখবার জন্য অন্যান্য স্থানের মতো তিনি সমতটে আসেন। এখানে তিনি ৩০টি বিহার দেখেছিলেন এবং শ্রমণ পেয়েছিলেন দু হাজার। হিউয়েন সাঙ ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন। ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়েলেতসিন ভারতবর্ষে এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন সেঙচি। তিনি সমতটে এসে কিছুকাল বসবাস করেন এবং তাঁর বিবরণও রেখে যান। সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাংকের সময়ে সমতটে একক ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। সে রাজবংশে নালন্দার প্রধান আচার্য মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম। আমরা বলেছি এ শীলভদ্রই হিউয়েন সাঙ- এর গুরু। শীলভদ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বোধীভদ্র নালন্দার অন্যতম আচার্য ছিলেন। শশাংকের সময়ে যে সমতটে ব্রাহ্মণ রাজবংশ ছিলেন সেই সমতটেই আরেক চীনা পরিব্রাজক সেঙচি দেখলেন এক বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করছে। সিঙচির কথামতে সিংহাসনাসীন রাজার নামছিল রাজভট্ট। ঐতিহাসিকদের মতে দেব খড়গপুত্র রাজভট্টই এ রাজভট্ট। এ রাজবংশের লোকেরা

হিন্দু থেকে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন কিনা এব্যাপারে ড. রায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। সেঙচি বলেন রাজভট্ট ছিলেন ধর্মের একজন পরম উপাসক। ত্রিরত্নের প্রতি ছিলেন ভক্তিমান। তিনি প্রত্যেক দিন বুদ্ধের এক লক্ষ মাটির মূর্তি গড়াতেন, 'মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের' একলক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন এবং এক লক্ষ সদ্যচয়িত ফুলে পূজা করতেন। এর মধ্যে অতিরঞ্জিত বিবরণ থাকতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজার পরম আসক্তি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেঙচির বিবরণে আরো জানা যায় রাজার দান-ধ্যানও ছিল প্রচুর – মাঝে মধ্যে তিনি বুদ্ধের সম্মানে ৪১ বার শোভাযাত্রা বের করতেন। শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকতো অবলোকিতেশ্বরের এক প্রতিমা। পেছনে সারি সারি বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং সকলের পেঁছনে থাকতেন রাজা। এসময় সমতটের রাজধানীতে চার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় রাজা রাজ রাজভট্টের সময় সমতটে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছিল হিউয়েন সাঙ এর সমতট অপেক্ষা সেঙচির সমতট বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির দিক থেকে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। তখন মহাযানের প্রভাব ছিল বেশি। ড. রায় বলেন, তার কারণও আছে। খড়গ রাজবংশের রাজারা তখন সমতট ও বঙ্গে রাজত্ব করছিলেন, লিপি সাক্ষ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ বংশের সকল রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম এবং সংঘের পরম পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ শতকেই রাত রাজবংশীয় রাজা শ্রীধারনের তাম্রশাসনে দেখা যায় সমতটের পরম সৌগত রাজা শ্রীধারনের মহাসন্ধিবিগ্রহাধিকারী বৌদ্ধ রামজয় তথাগত, ত্রিরত্ন এবং ব্রাহ্মণাটগণের পঞ্চম মহাযজ্ঞ প্রবর্তনের জন্য কিছু ভূমিদান করেছেন। সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তির তাও একটি প্রমাণ। বস্তুত তখন সমতটে বৌদ্ধ ধর্মের জয় জয়কার। বাংলাদেশের অন্যত্র যেখানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে আসছিলো তখন সমতটে বিকাশের ধারা অব্যাহত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সময় সমতটে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার হতে শুরু করে। হিউয়েন সাঙ যেখানে ত্রিশটি বিহার এবং দু'হাজার শ্রমিক দেখেছিলেন সেঙচি সেখানে গিয়ে পেলেন চার হাজার শ্রমণ অর্থাৎ দ্বিগুণ। সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংঘ ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাবার প্রধান কারণ মহাযানী বৌদ্ধ খড়গবংশীয় রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতকে বাংলাদেশে খড়গ বংশের রাজারা ছাড়া অন্যকোনও রাজবংশের রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু সমতটে তার ব্যতিক্রম ঘটে। সমতটে বৈন্যগুপ্তের সময় হতেই মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অপ্রতিরোদ্ধ প্রতিপত্তি ত্রয়োদশ শতকের রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদের পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। প্রায় ছয়-সাতশ বৎসর একাধিক্রমে সমতটে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। এসময় হিন্দু বৌদ্ধ রাজারা এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হিউয়েন সাঙ

সমতটের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্থবিরবাদী বলেছেন। মহাযানী বৌদ্ধধর্মে স্থবিরবাদের কোনও জায়গা আছে বলে জানা যায় না। স্থবির বাদ বলতে তিনি যদি ধীরস্থির ও প্রজ্ঞার বিষয়াধি বুঝিয়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা। বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবির উপাধি রয়েছে। ড. রায় মনে করেন হিউয়েন সাঙ স্থবিরবাদ বলতে স্থবির বিনয়-আশ্রয়ী মহাযানীদের বুঝাতে চেয়েছেন।

বৌদ্ধ জয়রাম রাজা শ্রীধারনের অন্যতম প্রধান রাজ কর্মচারী ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ সংঘে যেমন ভূমিদান করেছেন তেমনি ব্রাহ্মণদেরও ভূমি দিয়েছেন। বৈন্যগুপ্তের আমলে বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমি দান করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরাজ করছে বলে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে আছে। এসব থেকে মনে হয় সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল। রাজারা নিজে যে ধর্মই পালন করুন না কেন অন্যের ধর্মের প্রতি ছিলেন উদার এবং সহানুভূতিশীল। শুধু তাই নয় নিজের এবং পিতামাতার পুণ্যের জন্য এঁরা অন্যের ধর্মের কাজে এগিয়ে এসে ভূমি দান, মূর্তি নির্মাণ কিংবা মন্দির বা বিহার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। রাজকীয় ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকলে সাধারণ্যেও জনসাধারণের মধ্যে সদ্ভাব বিরাজ করে। সমতটে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বুদ্ধ রাজাদের হিন্দু মন্দির কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন চন্দ্র বংশের রাজা শ্রীচন্দ্র, তাঁর পশ্চিমভাগ পট্টলিতে লেখা যায় হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ৬০০০ ব্রহ্মাকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভূক্ত শ্রীহট্ট মণ্ডলের গরলা, পোগার এবং শ্রীচন্দ্রপুর বিষয়ে দুপ্রস্থে ১২০ পাটক ও ২৮০ পাটক ভূমি দান করা হয়েছে। এ পট্টলিতে দেখা যায় যে বাঙালি ব্রাহ্মণপূজারী, অবাঙালি ব্রাহ্মণ পুজারী ৮টি পৃথক পৃথক মঠ, মঠের ৪৬০ জন ছাত্র, মঠের প্রতি কর্মচারী, বেদ পড়াবার জন্য প্রত্যেক অধ্যাপক এমনকি ফুলমালীর ভরণ পোষণের জন্য সুনি-দ্দিষ্টভাবে ভূমি প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা উপকরণ যেমন লেখগুটিকা বা সিলেট ও খড়িমাটির পেন্সিল, বই-পুস্তক ক্রয়ের জন্য ভূমিবরাদ্দ দেয়া হয়। মন্দিরের শুধু পুরোহিত নয়, ঢাকবাদক, শঙ্খবাদক, দ্রাগড়বাদক, মঠনট, দেবদাসী (চেটিকার) এদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমি প্রদান করা হয়। ড. রায় মনে করেন সবচেয়ে যা অর্থবহ তা হচ্ছে ব্রহ্মাপুর শ্রীচন্দ্রপুরের মতো একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান। ৬০০০ ব্রাহ্মণকে সমপরিমাণে ভূমি দান করা হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় রাজা শশাংক নিদারুণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে ছিলেন। শশাংকের অপকর্মের একটি তালিকা তার বিবরণীতে আছে। শশাংকের পরিণতি ভালো হয়নি তা সে বিবরণী থেকেই জানা যায়। দুরারোগ্য রোগে রাজা শশাংক অসময়ে মৃত্যুবরণ করেন। একথার সমর্থন 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে আছে। আরো আছে

মধ্যযুগের 'ব্রাহ্মণকুলপঞ্জী' গ্রন্থে। এব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে ড. রায় বলেন খুবই আশ্চর্যের বিষয় বহুযুগ পরের ব্রাহ্মণকুলপঞ্জীতে শশাংককে বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলে তার কর্মের জন্য খারাপ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। শশাংক বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন কিনা এবং তার পরিণতির জন্য তিনি দায়ী কিনা এ তর্কে না গিয়েও বলা যায় সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র যাই থাকুক না কেন সমতটে রাজকীয় বিদ্বেষ কখনই কোনও ধর্মকে স্পর্শ করেনি। করলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত। সমতটের বাইরে যা ঘটেছে তখন তার দায় নিশ্চয়ই সেখানকার শাসক বা রাজা মহারাজাদের ওপর বর্তাবে। সমতটের রাজারা এদিক থেকে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

সমতটে বৌদ্ধ রাজাদের প্রাধান্য দেখা গেলেও ব্রাহ্মণ হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানও প্রবলভাবে প্রতিপালিত হয়েছে বলে হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে রয়েছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে বৌদ্ধদের যখন বিহার সংখ্যা ছিল সত্তরটি তখন ব্রাহ্মণ দেব-মন্দির ছিল তিনশতাধিক। এর মধ্যে সমতটে ছিল একশটি। বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সংগে সংগে স্থাপিত হয়েছে অসংখ্য বিহার বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। পট্টিকের ও সন্নঘর মহাবিহার দুটির অবস্থান পূর্ববঙ্গ তথা ত্রিপুরা জেলায় (সমতট) ছিল। ময়নামতি পাহাড়ের ওপর পট্টিকেরা বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজা হরিকেল দেবের তাম্রশাসনে দূর্গ উত্তরার নামে যে বিহার উৎসর্গ করা হয়েছে তাও পট্টিকের নগরীতে অবস্থিত। বনরত্ন নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য সমনগর বিহারে বাস করতেন। সেখানে বসে তিনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ করেছেন। পট্টিকের নগরীতে আরেকটি বিহারের নাম ছিল কনকস্তূপ বিহার। এই বিহারে আচার্য বিনয়শ্রীমিত্র এবং আরো কয়েকজন কাশ্মিরী ভিক্ষু বাস করতেন। এদের অনুরোধে সিদ্ধাচার্য নায়োপাদ 'বজ্রপাদ সারসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নায়োপাদের গুরু ছিলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য তৈলপাদ। তিনি বাস করতেন চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারে। লালমাই ময়নামতি পাহাড়ে খনন কাজের ফলে আনন্দ বিহার, শ্রীভবদেব মহাবিহার, ত্রিরত্ন বিহার (কোটিলা মুড়ায়) ইটাখোলা বিহার, ভোজ বিহার, লতিকোট-বিহার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া লালমাই-ময়নামতির আশেপাশে বহুধরণের বৌদ্ধ বিহার পাওয়া গেছে। প্রাচীন বাংলার বিহারের ইতিহাসে পাঁচথুবীও উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করে আছে।

কুমিল্লার বৌদ্ধ বিহার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়। তিনি বলেন, পাল সম্রাট ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহারের (পাহাড়-পুর মহা বিহার) আয়তনের তুলনায়, প্রতিষ্ঠার মহিমায় এবং সৌষ্ঠবের কারুকাজে সমমানের না হলেও কুমিল্লা জেলার লালমাই ময়নামতি পাহাড়ের উৎখননের ফলে আরেকটি মহাবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভূমি নকশায় সমচতুষ্কোণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির। স্থাপত্যের দিক থেকে বিহারটি পাহাড়পুর বিহারেরই অনুরূপ। বিহারটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেব বংশীয় রাজা আনন্দদেবের পুত্র

পট্টিকেরা রাজ্যের অধিপতি পরমসৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ভবদেব এবং তাঁরই নামানুসারে বিহারটির নামকরণ করা হয়েছিল ভবদেব মহাবিহার। তথ্য দুটি জানা যাচ্ছে এ বিহারেরই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত যথাক্রমে একটি তাম্রলিপি এবং রক্তাভ পাথরের একটি সিলমোহর থেকে।

আমরা প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় দেখেছি যে শ্রীভবদেব মহাবিহার বা শালবন বিহার সোমপুর (পাহাড়পুর) বৌদ্ধ বিহারের অনেক আগে নির্মিত হয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা এটি সপ্তম শতকের নিদর্শন। সোমপুর বিহার সম্রাট ধর্মপাল নির্মাণ করেছেন অষ্টম শতকে। কাজেই মহাবিহার নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবদেব মহাবিহার বা শালবন বিহার ছিল সোমপুর মহাবিহারের আদর্শ অর্থাৎ নির্মাণশৈলীর দিক থেকে সোমপুর মহাবিহার ভবদেব মহাবিহারের অনুকরণে নির্মিত। শালবন বিহার বা ভবদেব বিহারের নির্মাণ নকশা, গঠনশৈলী এবং কালগত গুরুত্ব বিবেচনা না করলে আয়তনে, প্রতিষ্ঠায়, মহিমা ও সৌষ্ঠবে এই সোমপুর মহাবিহারের মতো না হলেও তুলনীয়' ইত্যাদি কথায় এই মহাবিহারটির অবমূল্যায়নই করা হয়। শুধু বাংলাদেশে নয় সমসাময়িক বৌদ্ধ বিশ্বেরও বহু স্থানে বিহার নির্মিত হয়েছে শালবন মহাবিহারের আদলে।

ড. রায় ভবদেবের নামকরণে বিহারটির নাম ভবদেব মহাবিহার হয়েছে বলে দুটি সূত্রের আলোকে তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু উৎখননের ফলে এ সত্য বেরিয়ে এসেছে, ভবদেবের নামাঙ্কিত নিদর্শনটি তৃতীয় নির্মাণ যুগের। তার আগেও এ মহাবিহারের দুটি নির্মাণ যুগ কেটে গেছে অর্থাৎ এ মহাবিহার নির্মাণের কৃতিত্ব ভবদেবের নয়, ভবদেবের কৃতিত্ব হচ্ছে বিহারটি পুননির্মাণের। মূল নকশা অনুসরণ করলে লেখা যায় বিহারটির কেন্দ্রীয় মন্দির প্রথম নির্মাণের যুগে ছিল ক্রুশাকারের। কিন্তু তৃতীয় নির্মাণ যুগে ক্রুশ আকার থাকলেও মন্দিরের পরিধি বিরাট আকারের করা হয়। গভীর খননের ফলে প্রায় ৮ মিটার মাটির নিচে প্রথম নির্মাণ যুগে আদিম অব্যবহৃত ভূমির ওপর মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। দ্বিতীয়বারও সেখান থেকেই এটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় নির্মাণ যুগে অবস্থানের পরিবর্তন হয়। বাহুর দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় অনেক দূর। তৃতীয় নির্মাণ যুগে নির্মিত মন্দিরটি একাধিক তলা বিশিষ্ঠ ও বেশ উঁচু ছিল। মন্দিরটি বিরাট ও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল বলে পণ্ডিতদের ধারণা। চতুর্থ নির্মাণ যুগে মন্দিরটির ভূমি পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়। ক্রুশাকার মন্দিরের স্থলে আয়তাকার মন্দির নির্মাণ করা হয়। মন্দিরের পরিধিও আগের তুলনায় সামান্য ছোট হয়ে আসে। এ মন্দিরের ৬টি নির্মাণ যুগের নিদর্শন রয়েছে। কাজেই ড. রায়ের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না যে, মহাবিহারটি ভবদেবই নির্মাণ করেছিলেন।

এ মহাবিহারের সন্নিকটেই রয়েছে ক্ষুদ্র আর একটি সমচতুষ্কোণ বৌদ্ধ মন্দির।

এরই প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে কোটিলা মুড়া পাহাড়ে ৩টি স্তূপের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। কোটিলা মুড়ার প্রায় সাড়ে ৩কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে চারপত্র মুড়া। সেখানে চারটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। চারপত্র মুড়ায় পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত একটি স্মৃতিসম্পুট (Ralic Casket)। ড. রায় মনে করেন লালমাই ময়নামতির ভবদেব মহাবিহার, কোটিলা মুড়া ও চারপত্র মুড়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সুবিস্তীর্ণ নাতিউচ্চ পাহাড় অঞ্চল জুড়ে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তদানীন্তন বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘকে আশ্রয় করে একটি বিরাট নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যার রাষ্ট্রকেন্দ্র ছিল পট্টিকের নগর। ড. রায়ের মন্তব্য যথার্থ এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাঁর উল্লিখিত সময় ও কাল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ রয়েছে। শালবন বিহারে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে বিশেষ করে তাম্রশাসনের লিপি এবং গুপ্তদের অনুকরণে তৈরি মুদ্রা থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে শালবন বিহারের প্রথম নির্মাণকাল কোন অবস্থাতেই সপ্তম শতাব্দীর পরে নয়।

লালমাই ময়নামতির ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রচুর পরিমাণে পোড়া মাটির সিলমোহর পাওয়া গেছে। এগুলো লেখযুক্ত, স্তূপ মুদ্রিত এবং ধর্মচক্র অঙ্কিত। সেখানে পাওয়া গেছে ছোট ছোট ব্রোঞ্জ ধাতুনির্মিত বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং বৌদ্ধদেবী প্রতিমা। পাওয়া গেছে বৃহৎ আকারের বৌদ্ধ প্রতিমা। তাতে রয়েছে মূর্তিলেখ। প্রচুর মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির চিত্রফলক এবং স্থাপত্য অলংকরণ। ড. রায় মনে করেন, এসব শিল্প সাক্ষ্য এবং তার ঐতিহাসিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা বাঙালির ইতিহাসের আদিপর্বের একটি অর্থগর্ভ সংযোজন। তিনি আরও বলেন, সীমান্তের ওপারে ব্রহ্মদেশের আরাকানের সঙ্গে সমসাময়িককালে, বোধ হয় তারও বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকে কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চলের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সঙ্গে আরাকানের ম্রাহাউঙ অঞ্চলের এবং কাহাড় অঞ্চলের মাধ্যমে মধ্য বার্মার পগান অঞ্চলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতকে সে সম্বন্ধ রাজকীয় বৈবাহিক সম্পর্কেই পরিণতি লাভ করেছিল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতক থেকে বঙ্গীয় শিল্পের সঙ্গে আরাকানী শিল্পের একটা আত্মীয়তা লক্ষ করা যায় এবং অষ্টম-নবম শতকে এ আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ঘনিষ্ট হয়। ময়নামতি ও আরাকানী শিল্পের যে সব নিদর্শনের ফটোচিত্র আমার অধিকারে আছে তা থেকে এ তথ্য প্রমাণ করা কঠিন নয়। এ দু স্থানীয় শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা অতি প্রত্যক্ষ।

ড. রায়ের এ বক্তব্যের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনও কারণ নেই। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে বাংলা-বার্মা সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শুধু বাংলা-বার্মাই বা বলি কেন তখনকার গোটা বৌদ্ধ বিশ্বের নিরীখে লালমাই-ময়নামতির বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সভ্যতা বিরাট এক মূল্যের দাবী রাখে।

ভাষা সাহিত্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা

সমতটের মানুষের ভাষার বিষয়ে প্রাচীন ভাষা অধ্যায়ে আমরা বলেছি বাংলার সর্বপ্রাচীন ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। সে ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মনখমের ভাষা পরিবারের। কোলমুণ্ডা ভাষার সঙ্গেও এ ভাষার যোগাযোগ ছিল। দ্রাবিড়দের আসার পর পূর্ব ও উত্তর বাংলার প্রাচীনতর মুণ্ডা, মন্, খমের মূল ভাষার সঙ্গে আরেকটি মাত্রা যুক্ত হয়। এই মিশ্র ভাষাটিই মূলত ছিল প্রাচীন কিরাতজনদের ভাষা। এটি খ্রিস্ট জন্মের বহু শতাব্দী আগের কথা। আর্যরা এদেশে আসার পর সংস্কৃতির দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পট-পরিবর্তন হয়। ভাষার নিদর্শন প্রাচীন সমতট বা কুমিল্লা অঞ্চলে যা প্রথম পাওয়া যায় তা হল ষষ্ঠ (৫০৭ খ্রিস্টাব্দ) শতকের প্রথম দশকে বৈন্যগুপ্তের তাম্রলিপি।

এরপর সপ্তম শতকে দেবখড়গের আশ্রাফপুর তাম্রপট্ট কিংবা লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টলিতে যে লিপির পরিচয় পাই তাও সংস্কৃত ভাষার। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ বাংলার সমতটে এসে ৩০টি বিহারে ২০০০ শ্রমণকে শিক্ষা গ্রহণ করা অবস্থায় পেয়েছেন। তিনি এই জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা এবং জ্ঞান চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সমতটের ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের কৃতী সন্তান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য শীলভদ্র। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরীমায় তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁকে 'সদধর্মের' ভাণ্ডার বলা হতো। তাঁর বই আর্যবুদ্ধভূমিবাখ্যান সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এটি তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ সমতটে ১০০ হিন্দুমন্দির দেখেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর লো-টো-মো-চী বিহার লালমাই শালবন বিহারও হতে পারে। এখানেও জ্ঞান ও ভাষা চর্চার কথা জানা যায়। চীনা পরিব্রাজক সেঙ চি বলেছেন সমতটের তদানীন্তন রাজা (রাজরাজভট্ট?) প্রতিদিন মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করতেন। বিহারগুলোতে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সঙ্গীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, অষ্টাদশনিকায়বাদ,যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিও বৌদ্ধ শ্রমণদেরকে শিক্ষা দেয়া হতো বলে হিউয়েন সাঙ জানিয়েছেন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের মধ্যে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় সংস্কৃত ভাষাই লেখা ও পড়ার ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা দেশীয় ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুশাসন জারি করেছিল যে যারা দেশীয় ভাষায় অষ্টাদশ পুরাণাদির চর্চা করবে তারা রৌরক নামক নরকে পতিত হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে অথবা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে এতটা বিধিনিষেধ ছিল না বলেই মনে হয়। দেশীয় ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে মূলত কিছুটা

স্বাধীনতা ভোগ করেছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। প্রাচীন কালের সাহিত্যে গৌড়ী রীতির প্রভাব খুব অর্থবহ। 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে গৌড়তন্ত্রের কথা আছে। বাঙালি হয়েও শীলভদ্র যেমন সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান আহরণ ও প্রদান করেছেন তেমনি আর এক বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'গীতগোবিন্দ' কাব্য লিখেছেন। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও বাংলা ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাই সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময় বিভিন্ন প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রচলন পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সমতট এলাকায় এ ভাষার প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। বরং 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' ভাষা চর্চার কথা মনে করা যেতে পারে। লালমাই-ময়নামতি এলাকায় বৌদ্ধরাজাদের যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তার ভাষাও কিন্তু সংস্কৃত।

সমতট অঞ্চল তথা বাংলাদেশের প্রাচীন সাহিত্যে গোরক্ষনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। জ্ঞানকারিকা নামে একটি গ্রন্থ গোরাক্ষনাথের নামের সঙ্গে জড়িত। গোরক্ষনাথের কাহিনী উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবের যোগী, বাংলাদেশের নাথযোগী অর্থাৎ নাথপন্থী সবাই গোরক্ষনাথকে 'গুরু' বলে স্বীকার করেন। বাংলাদেশ তথা কুমিল্লায় প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী গোরক্ষনাথ রাজা গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক।

গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন জালন্ধরীপাদ বা জালন্ধরপাদ। অনেকে মনে করেন ময়নামতি গোপীচাঁদের গল্পের হাড়িপা এবং জালন্ধরীপাদ এক ও অভিন্ন। তারানাথ মনে করেন জালন্ধরীর শিষ্য কৃষ্ণাচার্য এবং তাঁর সঙ্গে হাড়িপার একটা সম্বন্ধ ছিল। তার আসল নাম সিদ্ধবালপাদ। কাশ্মীরের জালন্ধরে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন বলে তাঁকে জালন্ধরী বলা হয়। তিনি উদ্যান, নেপাল, অবন্তী ও চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। গোপীচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র তখন চট্টগ্রামের রাজা। এই গোপীচন্দ্র যদি চন্দ্রবংশের গোবিন্দচন্দ্র হয়ে থাকেন তাহলে এটি হবে সমতটের ইতিহাসের আরেক অধ্যায়। ত্যাঙ্গুর তালিকায় উল্লিখিত মহাপণ্ডিত জালন্ধরীপাদ এবং গোপীচাঁদ গুরু জালন্ধরীপাদকে এক ও অভিন্ন মনে করা হয়। তিনি ৪টি বজ্রযান গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। জালন্ধরীপাদ গোবিন্দচন্দ্রের গুরু প্রাচীনকালের বিখ্যাত ব্যক্তি। রাজা বিমলচন্দ্রের আমলে চট্টগ্রামে গিয়ে থাকলে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দ্রচন্দ্রের রাজধানী ময়নামতিতে তাঁর দীর্ঘ অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়া যায়।

জালন্ধরীপাদের অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিরুপা বা বিরূপপাদ। লামা তারানাথ বলেছেন এই বিরূপা ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের অন্যতম। সুম পা বলেন এই বিরূপার

জন্ম ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে এবং তা দেবপালের আমলে। ত্যাঙ্গুরতালিকায় আচার্য-মহাচার্য-বিরূপা এবং মহাযোগী-যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় ১০টি গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থগুলো বজ্রযানী পুথি। বিরুপাদ চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুটি পদ এবং দোহা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতিতে বিরূপার একটি পদ রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন বিরূপগীতিকা ও বিরূপ বজ্রগীতিকা নামক দুটি গীতিগ্রন্থেরও লেখক ছিলেন এই বিরূপা। এই বিরূপা মহাসিদ্ধাচার্য ডোম্বি-হেরুকের অন্যতম গুরু ছিলেন। ডোম্বি-হেরুক মগধের ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।

প্রাচীন ত্রিপুরা জেলার পট্টিকেরক নামক স্থানে কণকস্তূপ বিহার নামে একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। কাশ্মীরী ভিক্ষু বিনয়শ্রী মিত্র এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর স্মৃতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত বলে ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন সম্প্রতি ময়নামতি পাহাড়ের ওপর যে সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা বোধহয় এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে রণবঙ্কমল্ল হরিকেলদেবের তাম্রশাসনে পট্টিকের নগরীতে দুর্গান্তার নামে একটি বিহারের উল্লেখ আছে। কণকস্তূপ বিহার ও পট্টিকেরার দুর্গান্তার বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক ১২২০ খ্রিস্টাব্দে নয়, তারও প্রায় ৬/৭ শত বছর আগে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার প্রভৃতির কথা জানা যায়। বিহারকেন্দ্রিক ধর্মীয় ও জ্ঞানচর্চার পাদপিঠ হিসেবে সে সময় ময়নামতির বিহারগুলো শুধু বাংলাদেশে নয় সমস্ত বৌদ্ধ বিশ্বে নাম করেছিল। তবে দুর্ভাগ্য, এখানকার বিহারে নানারকম অতি মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেলেও কোনও বই-পুস্তক বা কাব্য-সাহিত্য ইত্যাদি পাওয়া যায়নি।

সমতটের চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের পঞ্চম রাজ্যাংকে ভূমিদানকে কেন্দ্র করে যে তাম্রশাসন জারি করেন তা পাওয়া যায় সিলেটের পশ্চিমভাগ গ্রামে। এই পশ্চিমভাগ পট্টলির ভূমিদান করা হয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, ১০ জন শিক্ষার্থীর ভরণ-পোষণ এবং লেখগুটিকা (খড়িমাটি) ব্যয় নির্বাহের জন্য। এই তাম্রশাসনের ভাষাও প্রাচীন ভাষার নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত এবং তা ধর্ম শিক্ষা-দীক্ষার ওপর দারুণ রকম প্রভাব বিস্তারকারী।

প্রাচীন সাহিত্য : চর্যাপদ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। আচার্য হরপ্রসাদশাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এই পুথি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের মূল নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। তেইশ জন বৌদ্ধ পদকর্তার পঞ্চাশটি গান এই সংকলনে রয়েছে। মনে করা হয় বর্মণ ও সেন বংশের রাজাদের দৌরাত্মে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এদেশে অবস্থান করতে না পেরে নেপাল এবং তিব্বতে পালিয়ে যান। যাবার সময় চর্যাপদের পুথি সঙ্গে

নিয়ে যান। চর্যাপদ সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সিদ্ধাচার্যরা এই পদ বা গান রচনা করেন। এই গান বৌদ্ধ ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব প্রচারের জন্য রচিত হলেও এতে সমকালীন জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। চর্যাপদের সামাজিক চিত্রের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

তেইশ জন চর্যাকারের মধ্যে কতজন চর্যাকার সমতট, ত্রিপুর বা কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন তা নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। কারণ ভণিতা মধ্যে স্থানের নাম উল্লেখ না থাকায় এবং পদকারদের সম্পর্কে সমকালে লেখা কোনও বই-পুস্তক তেমন না পাওয়ায় পদকর্তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও তথ্য জানা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন একজন পদকর্তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, তিনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম বিরূপাপাদ। এই পদকর্তার আবির্ভাবের সময় ত্রিপুরা (কুমিল্লা) সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিরূপাপাদের বিভিন্ন রকম নামের বানান রয়েছে প্রাচীন সাহিত্য ও অন্যান্য পুস্তকে। বিরূপাপা, বিরুআপা, বিরূপা। সুম পা-র মতে এই বিরূপার জন্ম হয়েছিল ত্রিপুরের (ত্রিপুরা) পূর্বদিকে দেবপালের রাজত্বকালে। এক বিরূপা নালন্দায় জয়দেব পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তাঁর সময় ছিল সপ্তম শতক। আর একজন বিরূপা জালন্ধরী পার শিষ্য। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন তিনি বাঙালি। তাঁর জন্মস্থান দেবপালের রাজ্য ত্রিপুরায়। তাঁর শিষ্য ডোম্বীপা। বিরূপা অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। বজ্রযোগিনী সূত্রে জানা যায় বিরূপার গুরু লক্ষ্মিংকরা (ইন্দ্রভূতির ভগ্নী, ইন্দ্রভূতি জালন্ধরী পার অন্যতম গুরু)। লক্ষ্মিংকরার গুরু ইন্দ্রভূতি, তাঁর গুরু কক্কুরিপা, তাঁর গুরু লুইপা।[১]

বিরূপা ভিক্ষুরূপে সোমপুর বিহারে বাস করতেন। লামা তারানাথের অনুসরণে ড. সুকুমার সেন মনে করেন কাহ্ন (কৃষ্ণপাদ) নামধারী একজন সিদ্ধাচার্যের নামান্তর ছিল বিরূপা। ১৮ ও ৩৬ সংখ্যক চর্যাপদের বরাত দিয়ে তিনি 'কাহ্নপা' ও 'কামাচণ্ডালিকাগীতি' প্রণেতা বিরূপাকে অভিন্ন মনে করেন। লামা তারানাথ বিরূপা, কাল বিরূপ, ধর্মপাল, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ করেছেন। সক্ষ্য বিহারের সূচিতে বিরূপা ত্রিপুর নিবাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ত্রিপুরকে মগধের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। কিন্তু ড. ধর্মবীর ভারতী ত্রিপুরকে ত্রিপুরা বলে চিহ্নিত করেছেন। 'তারা রহস্য' নামক একটি গ্রন্থে তাঁকে নাথপন্থি মানবগুরু হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। ত্যাঙ্গুরে বিরূপার ১৩টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে বলে সৈয়দ আলী আহসান মনে করেন।[২] বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস লেখক তারানাথ বলেন, বিরূপা ছিলেন সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে অন্যতম। আমরা পূর্বেও বলেছি ত্যাঙ্গুর তালিকায় (Tangur) আচার্য-মহাচার্য বিরূপা এবং মহাযোগী যোগীশ্বর বিরূপ প্রায় দশটি বজ্রযানী পুথি লিখেছিলেন। বিরূপাদ চতুরশীতি এবং দোহাকোষ নামে দুটি পদ এবং দোহা গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে জানা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিরূপ গীতিকা

ও বিরূপ বজ্রগীতিকা নামে আরো দুটি গ্রন্থের লেখক বলে বিরূপাকে মূল্যায়ন করতে চান। তাহলে তাঁর গ্রন্থ দাঁড়ায় মোট চৌদ্দটি।

চর্যাগীতিকায় বিরূপাপাদ ৩ নং চর্যাটির রচয়িতা। পদটি নিম্নরূপ :

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅন বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ।
* * *
দশমী দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিয়া ॥
চউশটি ঘড়িয়ে দেল পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা ॥
এক সে ঘড়লী সরুই নাল।
ভণন্ত বিরুআ থির করি চাল ॥

এক শুঁড়িনী দুই ঘরে সান্ধে (ঢোকে), সে চিকণ বাকল দ্বারা বারুণী (মদ) বাঁধে। শুঁড়ির ঘরের চিহ্ন (আছে) দুয়ারেই। সে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজেই চলে আসে। চৌষট্টি ঘড়ায় মদ ঢালা হয়েছে, গ্রাহক যে ঘরে ঢুকল তার আর সাড়াশব্দ কিছু নেই (মদের নেশায় এত বিভোর)। সরু নালে একটি ঘড়ায় মদ ঢালা হচ্ছে বিরূপা সাবধান করছেন, সরু নাল দিয়ে চাল স্থির করে বারুণী ঢাল।[৩]

বীণাপাদ

পণ্ডিতেরা মনে করেন বিরূপাপাদের বংশধর বীণাপাদ এবং চর্যাগীতিকার ১৭ নং চর্যাটি বীণাপাদের। এই নিয়ে অবশ্য বিতর্ক রয়েছে। ড. সুকুমার সেন বলেন যে, ১৭ নং চর্যাটিতে 'বীণা' শব্দ যেভাবে আছে তাকে ভণিতা বলে মনে হয় না। তিনি চর্যাকারদের তালিকা থেকে বীণাপাদের নাম বাদ দেয়ার পক্ষপাতি।[৪] ড. সেন অবশ্য ১৭ নম্বর চর্যার পদকর্তার নামও বলেননি। ১৭ নম্বর চর্যায় কবির ভণিতা এরকম :

বাজই অ লো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন অন্তিধনি বিলসই রুণা ॥
[ওগো সখি, হেরুক বীণা বাজছে]
শূন্যতা-রূপ তন্ত্রীধ্বনী রুণু রুণু শব্দে বিলসিত হচ্ছে]

বীণাপদের একটি গান আছে :

আলি কালি বেণি সারি মুনিআ।
গঅরব সমরস সান্ধি গুণি আ ॥

এই গান বা পদ থেকে জানা যায় হাতি ধরবার আগে সারি গান গেয়ে হাতির মন জয় করতে হয়। এর থেকে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকা অথবা ময়নামতির পাহাড়ি অঞ্চলে এককালে বন্য হাতি ছিল এবং নানা কায়দায় সে হাতি ধরা হতো। এই বিষয়টি থেকে মনে করা যায় যে, বীণাপাদের বাড়ি ত্রিপুরা অঞ্চলে ছিল এবং তিনি বিরূবাপাদের বংশধর ছিলেন। বীণাপাদ বজ্রডাকিনী দেবীর গৃহ্য পূজার পুস্তক প্রণয়ন করেন।

লামা তারানাথের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় বীণাপাদ ছিলেন ডোম্বী, হেরুকের সমকালীন। তিনি আরো বলেন বীণাপাদ আচার্য অশ্বপাদের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে বিরূপার শিষ্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বীণা যন্ত্রসহকারে গীতগান করতেন।[৫] ড. সুকুমার সেন বীণাপাদের জন্মস্থান বলেছেন গহুর। তাঁদের মতে তিনি ৯ম শতকের লোক। এঁরা আরও মনে করেন ভণিতা হিসেবে নির্দেশ করা যায় এমন কোন বীণা নাম চর্যাতে নেই। একটি সমাসবদ্ধ শব্দ আছে 'হেরু-অ-বীণা'। অবশ্য তিব্বতীয় ঐতিহ্যে বীণাপাদ বিরুআর বংশধর।[৬]

ডোম্বীপা

ড. আহমদ শরীফ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত উদ্ধৃত করে বলেন ডোম্বীপা ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন বিরূপা বা বিরূআ। বিরূপা ত্রিপুরার অধিবাসী একথা আমরা পূর্বে বলেছি। তিনি মনে করেন গুরু পরম্পরা সূত্রে ডোম্বীপার সময় নিরুপণ করা সম্ভব। যেমন সবর-লুই-ডোম্বী-তেল্লা-নার-খোট ডোম্বী-কুশলীভদ্র। সবর কমলশীলের সমসাময়িক। তিনি কমলশীলের জন্য 'বজ্রগীতি' ও 'ধর্ম উপদেশ' নামে দু'খানি বই লেখেন। কমলশীলের গুরু শান্ত রক্ষিত (৭০৫-৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। কমলশীল তিব্বত রাজ থ্রি-স্রোঙ-লদেউ-এর আহ্বানে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত রাজদরবারে গিয়েছিলেন এবং ৭৮৪-৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে চীনা পণ্ডিত হো সাং-এর সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেন। অতএব ডোম্বীপার জীবৎকাল ৭৯০-৮৯০ খ্রিস্টাব্দ।[৩] তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'অক্ষর বিদেশগীতি' এবং 'নাড়ীবিন্দুদাড়ে যুবচর্চা'। লামা তারানাথ মনে করেন তাঁর সময় অষ্টম শতকের মধ্য ও শেষভাগ। তিব্বতীয় ঐতিহ্যে ডোম্বী ২ জন। একজন ডোম্বী হেরুক, আর একজন লাড়ী ডোম্বী। ড. সুকুমার সেন আরও মনে করেন হেরুক ত্রিপুরার রাজা। কান্ত বিরূবার শিষ্য। টীকায় মুনিদত্তের মতে লাড়ী ডোম্বী চর্যাপদকার। তিনি রাঢ় দেশে অনেককাল বসবাস করেছেন। তিনি যোগী ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আলী

আহসান মনে করেন দারিকপার শিষ্য ছিলেন সহজযোগিনী চিন্তা। চিন্তার শিষ্য হলেন ডোম্বীপা। তিনি তাঁকে মগধের রাজা বলার পক্ষপাতি। তাঁর মতে বিরূপার কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে তিনি মহামুদ্রার সাধনা করেন। এ কাজে মনোনিবেশ করায় মন্ত্রীরা তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে। রাজ্যে আকাল দেখা দিলে তিনি আবার ফিরে আসেন। প্রজারা তাকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁর শিষ্যত্ব মেনে নেন। ইতি বীণাপার সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর অনূদিত একটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় 'সহজসিদ্ধি'।[৭]

ডোম্বীপা বিরূপার শিষ্য ছিলেন এবং বীণাপার সমসাময়িক। বিরূপা এবং বীণাপা ত্রিপুরার অধিবাসী আমরা আগেই বলেছি। তাই ডোম্বীপার বাড়িও ত্রিপুরার হবার সম্ভাবনা বেশি। চর্যার ১৪ নম্বর পদটি তাঁর।

সরহপা

চর্যাপদের ৩৯ সংখ্যক পদে সরহপা নিজের ব্যক্তিগত জীবনের একটি পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এক শবর কন্যাকে তিনি সঙ্গিনী করেন। তিনি নিজেকে 'পূর্বদিশা' বা পূর্বদেশের লোক বলে দাবী করেন। তাঁর সঙ্গিনীও সে অঞ্চলেরই একেবারে পূর্বান্তের। এ তথ্য থেকে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে পূর্বদেশ সমতট, ত্রিপুরা কিংবা কুমিল্লাও হতে পারে। ড. আহমদ শরীফ মনে করেন চর্যাকার সরহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তাঁর জন্মস্থান ছিল রাজ্ঞী দেশ। কামরূপের রাজা রত্নপাল তাঁর শিষ্য। রাজ্ঞী সম্ভবত উত্তরবঙ্গ কামরূপ। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁর পদাবলীর ভাষা বঙ্গকামরূপী বলে তিনি মনে করেন। দোহাকোষের রচনাকারও তিনি। গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহ বর্তমান ছিলেন। তাঁর লেখা বহু গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন : কায়কোষ, অমৃত, বজ্রগীতি, চিত্তকোষ, অজবজ্রগীতি, ডাকিনীগুহ্য বজ্রগীতি, দোহাকোষ উপদেশগীতি, তত্ত্বউপদেশ শিখর দোহাকোষ, ভাবনা ফলদৃষ্টি চর্যা দোহাকোষ, বসন্ততিলক দোহাকোষ, চর্যাগীতি দোহাকোষ, মহামুদ্রাপদেশ দোহাকোষ এবং সরহপা গীতিকা। হরপ্রসাদশাস্ত্রী মনে করেন সরহপার আদি নাম ছিল রাহুল ভদ্র। তাঁর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন, সররুহবজ্র, সরজবজ্র, পদবজ্র প্রভৃতি। তাঁর ২১টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।[৮] সরহপার দোহাকোষ গীতিতে একটি পদে দেখা যায়, "মই ভমিও সোমিট্‌ঠউ', এই 'সমিট্‌ঠউ' শব্দটি সমতটের ভিন্ন পাঠ কিনা তা বিবেচনার বিষয়। এছাড়া প্রাচীন সমতটের গঙ্গাসাগর (গঙ্গাসাঅর) এখনো স্বনামে পরিচিত। এই পদের চারটি পংক্তি পাঠকদের সুবিধার জন্য উদ্ধৃত করা হলো :

এক সে সরসই সোবণাহ এথু সে গঙ্গাসাঅরূ
বারাণসি পআগ এথু সে চান্দ দিবাঅরূ
খেত্ত পিট্‌ঠ উঅপিট্‌ঠ এথু মই ভমিঅ সমিট্‌ঠউ।
দেহামরিস তিহু মই সুণউণ দিট্‌ঠউ ॥

সরহপাদের দোহাকোষে অনেক শব্দ আছে যা বাংলা।

সরহপার কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো হলো : বুদ্ধকপালতন্ত্রপঞ্জিকা জ্ঞানবর্তী, বুদ্ধকপালসাধন, 'বুদ্ধকপাল মণ্ডলবিধি, ত্রৈলোক্যবশমণ্ডলবিধি, ত্রৈলোক্যশঙ্করলোকেশ্বর সাধন। তিনি দোহাকোষ ছাড়াও নানাপদ রচনা করেছেন। চর্যাপদে এ রকম তাঁর ৪টি পদ রয়েছে (২২, ৩২, ৩৭, ৩৯)।

আমরা সরহপাকে পূর্বদেশের বাসিন্দা বলেই সমতটে তাঁর অধিষ্ঠানের বা ভ্রমণের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রাখি। আরো অনেক সিদ্ধাচার্য রয়েছেন যাঁদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সস্ক্য বিহার থেকে রাহুল সংস্কৃত্যায়ন প্রদত্ত তালিকায় ভঙ্গাল বা ভঙ্গালা বা ভঙ্গল দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া চর্যাগীতিকার ৫০টি গানের মধ্যে ৩০টি গানে সুস্পষ্ট ভণিতা আছে। বাকি পদগুলোর পদকার কে তা জানা যায়নি। যাঁদের ভণিতা আছে তাঁদের অনেকেরই জন্মস্থান এবং অবস্থানের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। এরকম প্রেক্ষাপটে আরো কিছু পদকার সে সমতট, ত্রিপুরা বা লালমাই-ময়নামতির নয় একথা কে নিশ্চিত করে বলবে?

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন চর্যাপদের রচনাকাল নবম থেকে দ্বাদশ শতক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, ভাষা এবং অন্যান্য দিক বিবেচনা করে চর্যাপদের আনুমানিক রচনাকাল সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বৌদ্ধ ধর্ম, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতট তথা লালমাই-ময়নামতিসহ পুরো পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ আধিপত্যের কথা ইতিহাস থেকে জানা যায়। লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে বৌদ্ধ রাজাদের পাঁচ-ছয়শ বছরের শাসন এবং বৌদ্ধ বিহারের কীর্তিময় নানা নিদর্শন থেকে সমজহৈ অনুমান করা যায় যে, এখানে ধর্মচর্চার পাশাপাশি ধর্মজ্ঞান এবং ধর্মকেন্দ্রীক সাহিত্যের চর্চাও হয়েছে সুদীর্ঘকাল। পচনশীল নয় এমন সব নিদর্শন পাওয়া গেলেও এখানে ধর্মীয় কিংবা সাহিত্যের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তার অর্থ এই নয় যে, এখানে সাহিত্য-শিল্পের চর্চা হয়নি। ভবিষ্যতে নানা খননকার্য এবং গবেষণার মাধ্যমে হয়তো নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসবে যা দেখে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

প্রাচীন সাহিত্য : নাথ সাহিত্য

নাথ ধর্মকে অবলম্বন করে বাংলায় এক সাহিত্য গড়ে ওঠে। একে বলা হয় নাথ সাহিত্য। এই সাহিত্যের মূলে আছে দুটি কাহিনী। এর একটি মীননাথ এবং তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথকে নিয়ে। অপরটি রাজা মানিকচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী ময়নামতি পুত্র গোপীচাঁদকে নিয়ে। মহাদেব শিব হচ্ছেন নাথ সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। নাথ ধর্ম সাধনার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শুধু বাংলা ভাষা-ভাষী এলাকায় নয় হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি এমনকি সিংহলি ভাষাতেও নাথ ধর্মকে কেন্দ্র করে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এই সাহিত্যের গুঢ় সাধনতত্ত্ব অনেকটা হেঁয়ালী ভাষায় রচিত। গোপীচন্দ্র সন্ধিগ্ধ হয়ে মাতা ময়নামতিকে জিজ্ঞেস করছেন :

কোন বিরিখির বোঁটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।
মা বলছেন : মন বিরিখের বোঁটা তুই তন বিরিখের ফল ॥

গাছের নাম মনুহর ফলের নাম রসিয়া।
গাছের ফল গাছে থাকে বোঁটা পড়ে খসিয়া ॥
কাটিলে বাঁচে গাছ না কাটিলে মরে।
দুই বিরিখের একটি ফল জাননি সে ধরে ॥

ময়নামতির গান ছাড়াও রয়েছে মানিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্র রাজার গান এবং গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস।

ময়নামতির কাহিনী নিয়ে লেখা একটি প্রাচীন পুথি থেকে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী একটি বই প্রকাশ করেন। নাম দেন মীনচেতন। গোরক্ষবিজয় নামে মুন্সী আবদুল করিম আর একটি পুথি প্রকাশ করেন। বিভিন্ন পুথির সাহায্য নিয়ে পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশ করেন গোর্খবিজয়। পুথিগুলোতে দেখা যায় এগুলোর রচয়িতা ভীমদাস বা ভীমসেন, সেমদাস সেন, ভবানী দাস, ফয়জুল্লাহ এবং সুকুর মোহাম্মদ। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বা তার কাছাকাছি সময় নাথ ধর্মের উদ্ভব হয় এবং কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে সাহিত্য রচিত হয়। পরবর্তীকালে লোকমুখ থেকে এগুলো কাহিনীকাব্যের রূপলাভ করে।

লামা তারানাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদেরও তালিকা উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থে চন্দ্রবংশের আট জন রাজার মধ্যে রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁর ভাই ললিতচন্দ্রের কথা উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ করেছি। গোবিন্দচন্দ্র একাদশ শতকের প্রথমার্ধে ২৩ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। রাজেন্দ্র চোল দেব তাঁর ত্রয়োদশ রাজ্যাংকে তিরুমটল শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন; এই শিলালিপিতে

উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরাপথ অভিযানের কালে বিরামহীন ঝড়-বৃষ্টির বাংলাদেশে গজপৃষ্ঠ হতে নেমে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করেছিলেন। এটি গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বের প্রথম দিকে তা আমরা আগেই বলেছি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন রাজা গোবিচন্দ্র (গোপীচাঁদ)এবং তাঁর মাতা ময়নামতি সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু প্রবাদ কাহিনী ও গীতিকাব্য প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন তারানাথ কথিত গোবিন্দ চন্দ্র এবং এই গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন।[৯] তিনি আরও বলেন সম্ভবত ললিত চন্দ্রই যশোবর্মার হস্তে পরাজিত হয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী শ্রীপট্টিকেরক বা পট্টিকরা ছিল কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীতে আছে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল 'ঊনশত রাজার বাটির ওপর' বা তার চতুঃসীমায় ছিল পাটিকারা নগর। একাদশ শতাব্দীতে নাথ মহন্তদের যোগমহাত্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ময়নামতির গাঁথা রচনা করা হয়। এতে বলা হয়েছে মেহারকুল, মেহ্রাকুল বা মৃকুল ছিল রাজা মানিকচন্দ্রের রাজধানী। তাঁর মহিষী ময়নামতি এবং পুত্র গোবিচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র। ভবানী দাসের ময়নামতির পুথিতে আছে–

এই মত কৈল যদি মৈনামতি মাএ।
জোড় হস্ত নিবেদিল গুপীচন্দ্র রাজাএ ॥...
আমি বাড়ী বান্ধিয়াছি মেহারকুল শহর।
চল্লিশ রাজা কর দেঅ আমার গোচর ॥

সুকুর মোহাম্মদের গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে আছে–

অতি রম্যস্থান ছিল ম্রিকুল শহর।
পৃথিবীতে স্থান নাই তাহার দোসর ॥
ব্রাহ্মণ যোগিন আদি প্রজার বসতি।
মানিকচন্দ্র নামে রাজা যার নরপতি ॥...
তাহার মহাদেবী হএ ময়নামতি রাই।...
একপুত্র হৈল তার যদি গোর্খের বরে ॥...
রাজা প্রজা জিনি সবে হইল আনন্দ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল গোপীচন্দ ॥

গোরক্ষ-বিজয় শেখ ফয়জুল্লাহ বলেন–

মেহারকুলেতে আছে জ্ঞানী যে গোগিনী।
ময়নামতি নাম তার রাজার ঘরণী ॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহাজ্ঞান।

জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান ॥
বিধবা যে নারী হএ পুত্র রাজ্যেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িপা বঞ্চএ তার ঘর ॥

ময়নামতির পুথি কুমিল্লা জেলা থেকে সংগৃহীত হয় এবং মনে করা হয় এই পুথি ভবানী দাসের রচিত বিধায় তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায় হতে পারে। শেখ ফয়জুল্লাহও কুমিল্লা জেলার অধিবাসী বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। গোরক্ষ-বিজয় কাব্যের ভাষা এবং এতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ থেকে এটি মনে করা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক কবি সুকুর মোহাম্মদকে ত্রিপুরার কবি বলেছেন।[১০] গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রন্থের ভূমিকায় আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন কবি সুকুর মোহাম্মদের বাড়ি কুমিল্লা জেলায় নয় রাজশাহী জেলার সিন্দুকুসুমী গ্রামে।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ গোরক্ষ-বিজয়ের তিনখানি পুথি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার কোণগ্রাম থেকে উদ্ধার করেন। আলী আহম্মদ (প্রখ্যাত পুথি সংগ্রাহক) কুমিল্লা থেকে গোরক্ষ-বিজয়ের সাতটি কলমী পুথি উদ্ধার করেন। গোরক্ষ-বিজয়ের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহর আর এক উপাধি ছিল মীর। আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যে নাথ সাহিত্য বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে নাথ সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নাথ সাহিত্যের উদ্ভবকালকে নির্দেশ ও সনাক্ত করবার জন্যে।

সংযোজন

চর্যাপদের প্রথা বিরোধী কবি সরহপা

সরহপাকে আমরা জানি চর্যাপদের পদ রচয়িতা হিসেবে। এই সংকলনে তাঁর ৪টি পদ রয়েছে। চর্যার ২২,৩২,৩৭ এবং ৩৯ সংখ্যক পদগুলো তাঁর। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন তিব্বতের স্স্কা বিহার থেকে বজ্রযান সিদ্ধাচার্যদের একটি সূচি (তালিকা) পেয়েছেন। এতে সিদ্ধাচার্যদের জাতি এবং দেশের নাম উল্লেখ আছে। এই সূচিতে ৬ নং নামটি সরহপার। জাতি লেখা হয়েছে ব্রাহ্মণ এবং দেশের নাম নালন্দা। ৩৯ সংখ্যক চর্যাপদে সরহপার ব্যক্তিগত জীবনের কিছুটা পরিচয় আছে। তিনি নালন্দা বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা করেছেন। এক শবর কন্যাকে সঙ্গিনী করার পর অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে হয়। এটি বোধ হয় নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করার ফল। তিনি 'পূর্বদিশা' বা পূর্বদেশের লোক, তাঁর সঙ্গিনী এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। একেবারে পূর্বান্তের। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন সরহপার জন্ম রাজ্ঞীদেশে। রাজ্ঞীদেশ সম্ভবত উত্তর-বঙ্গ-কামরূপ। তিনি এগারশতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন মনে করেন গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকালে সরহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর নিম্নতম জীবৎকাল ৭৬০

খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ তিনি অষ্টম শতকের লোক। জন্মস্থান মগধের নালন্দা। সুখময় মুখোপাধ্যায় সরহপার সময় নির্ধারণ করেছেন অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে। তিনি বলেন ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরহ বর্তমান ছিলেন।

সরহ আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে মনে করা হয়। বলা হয় তাঁর আদি নাম রাহুলভদ্র। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁকে আদিতে ব্রাহ্মণ মানলেও রাহুল ভদ্রই সরহ তা মানেন না। তাঁর মতে, রাহুল ভদ্র এবং সরহ ভিন্ন ব্যক্তি। সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন সরহপা ও রাহুলচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। লামাতারানাথের মতে এক সরহ ছিলেন শবরী পার সঙ্গে অভিন্ন। সরহ পণ্ডিত এবং রাজপুরোহিত। 'দোহাকোষ' রচয়িতা তিলপা ও সরহ অভিন্ন হতে পারেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরহপার অনেকগুলো নামের উল্লেখ করেছেন- সরোরুহবজ্র, সরোহবজ্র, পদ্মব্রজ ইত্যাদি। আদিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবিষয়ে সবাই একমত। কিন্তু জন্ম স্থান এবং আবির্ভাব কাল নিয়ে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সমস্যাটিতে আমরা আরেকটি নতুন মাত্রা যুক্ত করতে চাই। সরহ যেখানে নিজেই বলেছেন তিনি পূর্বদেশের লোক, পণ্ডিতেরা তাঁর কথা কেন অবিশ্বাস করলেন তা বোধগম্য নয়। উত্তরবঙ্গ, মগধ নিশ্চয়ই 'পূর্বদেশ' নয়। পূর্বদেশেরও প্রান্ত সীমায় তাঁর সঙ্গিনীর বাড়ি। এটি আরও পূর্ব প্রান্তে হওয়ারই কথা। নালন্দায় তিনি অধ্যাপনা করেছেন তা ঠিক আছে। প্রাচীন কালের পূর্বদেশ তো সমতট, ত্রিপুরা বা 'কমলাক' (কমলাঙ্ক)। সরহপার একটি দোহায় গঙ্গাসাগর, সমতট ভ্রমণের কথা আছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সঙ্গে-

এথু সি সরসই সোবণাহ এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
বারাণসি পআগ এথু সে চান্দ দিবাঅরু ॥
থেও পিটঠ উঅপিটঠ এথু মই ভমিঅ সমিটঠউ।
দেহাসরিস তিত্থ মই সুণউ ণ দিটঠউ ॥

'সমিটঠউ' শব্দটি সমতট হতে পারে। প্রাচীন সমতটে অবস্থিত 'গঙ্গাসাগর' এখনো সে নামেই পরিচিত। সমতটের লালমাই-ময়নামতিতে খনন কাজের কালে বৌদ্ধরাজাদের যে ঐশ্বর্যময় ৫/৬ শ বছরের ইতিহাস জানা যায় ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন এরপর বাঙালির প্রাচীন ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে। বৌদ্ধ কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বলে কথিত পট্টিকের কিংবা লোহিতগিরি অনেক সম্ভাবনার কথাই ইঙ্গিত করে। অবশ্য আমরা এ সমস্যাটিকে চাপিয়ে দিতে চাই না, মনে উদয় করিয়ে দিতে চাই।

সুখময় মুখোপাধ্যায় কয়েকটি তিব্বতি গ্রন্থ অবলম্বনে মহাযান সিদ্ধাচার্যদের গুরুশিষ্য পরমপরায় একটি পাঠ প্রণয়ন করেছেন। এদের মধ্যে চর্যাকারদেরও

কেউ কেউ রয়েছেন। তাঁদের আবির্ভাব কালের ইঙ্গিতও রয়েছে এতে। এই পীঠিকায় একনম্বর স্থানে রয়েছেন সরহপা। তাঁর সময় বলা হয়েছে অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে, ৭০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। তাঁর কোনো গুরুর উল্লেখ নেই। শিষ্য হচ্ছেন শবরপা। শররপার শিষ্য লুই পা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ শবরপাকে বাঙালি বলেছেন। তাঁর সময় বলেছেন ৬৮০-৭৬২ খ্রিস্টাব্দ। এসময় সমতটে বৌদ্ধ দেব বংশের আনন্দদেব-ভবদেবরা রাজত্ব করতেন। লালমাই ময়নামতির আনন্দবিহার এবং ভবদেববিহার (শালবন বিহার) প্রত্নতাত্তিক নিদর্শনের জন্য এখন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তখনও ধমীয় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদির নিরিখে লামাতারানাথ সরহপাকে আদি সিদ্ধা বলেছেন। তবে আদি সিদ্ধা হিসেবে লুই পাদের নাম বলেন কেউ কেউ। সৈয়দ আলী আহসান মনে করেন, লুইপাকে আদি সিদ্ধা রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সম্ভবত পরে কামরূপের শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘটেছিল। কিন্তু ড. ধর্মভারতী এবং রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের নানা অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরহপাকেই আদি পদকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

লামাতারানাথের কথায় দেখা যায় সরহপা শৈশবেই বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে গিয়ে ত্রিপিটক পড়েছেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের পদ অধিকার করেন। গল্প আছে প্রাচ্যদেশের রাজা তাঁর অসংখ্য প্রজা সঙ্গে নিয়ে সরহকে দেখতে গিয়েছিলেন। সরহ রাজাকে বলেছিলেন আমি যদিও ব্রাহ্মণ তবু আমি নিম্নবর্ণের কন্যার সঙ্গে বাস করি। জাতি বা অজাতি পুণ্য বা পাপ আমার জন্য সবই সমান। তাঁর উক্তি শুনে রাজা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠে দোহাগীত শুনে সকল প্রজা নিয়ে বজ্রযান মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তঙ্গুরে রক্ষিত পুঁথি সংগ্রহে সরহের একুশটি গ্রন্থের কথা জানা যায়।

সরহপাদের দোহাকোষের প্রাচীনতম পুঁথি সংগ্রহ করেন রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বতের ঐতিহাসিক সস্ক্য মঠে পান তিনি এটি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তালপাতার পুঁথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমার ভারত থেকে দ্বিতীয় বারের যাত্রায় এক পর্যায়ে সস্ক্য মঠে উপস্থিত হই। ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম মন্দিরের পূজারীর কাছে তালপত্রের একটি বান্ডিল রয়েছে। আমার মিত্র সংঘধর্মবর্ধন আমাকে পুঁথি সংগ্রহে সাহায্য করেন। তিব্বতে তালপত্রের পুঁথিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির মুখে তালপত্রের গুড়ো দেয়া হয়। ভারতে হিন্দুরা যেমন গঙ্গাজল দেয় তিব্বতে তেমনি তালপত্র। এর ফলে পুঁথিগুলো ক্রমে খণ্ডিত হয়ে পড়ে। উক্ত বান্ডিলে সরহপার যে দোষাকোষ আমি পাই তার মধ্যে যদ্যপি সন-সংবৎ ছিল না, তবু তা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পুঁথিগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম মনে হয়েছে এবং দোহার সংখ্যাও এখানে সর্বাধিক। প্রবোধ বাগচীর দোহাকোষে দোহার সংখ্যা ছিল ১১২, আমার সংগৃহীত দোহার সংখ্যা ১৬৪'।

রাহুলভদ্র প্রথমে ছাত্র এবং পরে অধ্যাপক বা আচার্যরূপে নালন্দায় অবস্থান করেন। জানা যায় তখন নালন্দা বিক্রমশীল প্রভৃতি বিদ্যাপীঠে কাব্যচর্চার সুযোগ বা সমর্থন ছিল না। তখন ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি ভাষা শিক্ষা, ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্যে সীমিত ছিল পাঠ্যক্রম। সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য চর্চা এ সবের বাইরে ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে। তবে এ কাজে সমর্থন ছিল না প্রাতিষ্ঠানিকভাবে। সৈয়দ আলী আহসান রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে আন্দাজ করেন রাহুল ভদ্র অধ্যয়নকালীনই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সৌন্দর্য নান্দ' কাব্য, 'সারিপুত্র প্রকরণ' এবং 'রাষ্ট্রপাল' নাটক নিশ্চয়ই পাঠ করেছিলেন। কালি দাসের সমগ্রকৃতি, দণ্ডী ও ভবভূতির সুভাসিতাবলী পাঠ করবারই কথা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মনে করেন সরহপার জন্য এ সমস্ত সাহিত্যগ্রন্থ সুলভ এবং আবশ্যক ছিল।

সরহ কয়েকটি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা, পালি এবং অপভ্রংশ। মূলত এ তিনটি ভাষাই তাঁর কালের প্রচলিত ভাষা ছিল। সরহের রচিত সংস্কৃত শ্লোকে কবিত্বের প্রমাণ অনেকেই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য কীর্তিত হয়েছে অপভ্রংশে। নিজের ভাষায়ই সাহিত্য কিংবা ধর্ম চর্চায় তিনি স্বাচ্ছন্ধবোধ করেছেন। জয়দেবের মত 'গীতগোবিন্দ' রচনায় তিনি এগিয়ে যাননি। সাধারণ মানুষের ভাষায় সাধারণ মানুষের জীবন এবং জীবিকাকে অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দোহাকোষ কিংবা চর্যাপদে তুলে এনেছেন।

তাঁর প্রথা বিরোধিতার চিত্রটা এখানে সামান্যই। কারণ বহু সিদ্ধাচার্যই অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষায় গীত বা পদ রচনা করেছেন। তবে অন্যরা অক্সফোর্ডের মতো নালন্দাপাশ কিংবা নালন্দার অধ্যাপক ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। অভিজাত ব্রাহ্মণের ছেলে অভিজাত বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা করে উচ্চকোটির অভিজাত জীবন কাটাবেন এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি তার ব্যতিক্রম ঘটালেন।

পণ্ডিতেরা ব্যক্তিজীবনে সরহপার মধ্যে তিনটি বিদ্রোহের আলামত দেখেছেন। এক. ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হয়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যভাব পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ মতাদর্শ গ্রহণ করেন। দুই. নালন্দার কঠোর অনুশাসনের মধ্যেও কবিতার রস আস্বাদন এবং কাব্যচর্চা করেছেন। তিন. মহাযানী শিক্ষাকেন্দ্র হয়েও নালন্দা অশোকের সময় থেকে প্রচলিত 'বিনয়-পরম্পরা' মান্য করে ভিক্ষুগণ স্ত্রী বিরত থাকতেন এবং মদ্যপান করতেন না। কিন্তু সরহপা নালন্দা ত্যাগ করে 'বিনয়-পরম্পরা' ভঙ্গ করে (এটি এক বিরাট শৃঙ্খলা বা রীতি ভঙ্গ করা) এক অন্ত্যজ রমনীকে সঙ্গিনী করেন এবং নিজেও তীর ধনুক নির্মাণ করে অনাচারণীয় নিম্ন শ্রেণীর জনতার সহায়ক বন্ধু হন।

সরহ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন- এর মধ্যে তর্ক শাস্ত্রের টীকাও আছে। 'বুদ্ধ কপালতন্ত্র পঞ্জিকা' 'জ্ঞানবতী', 'বুদ্ধপাল সাধনা', 'বুদ্ধকপাল মণ্ডল', 'ত্রৈলোক্যবশম লবিধি' এবং ত্রৈলোক্যশঙ্কর লোকেশ্বরসাধন তাঁর সংস্কৃত বই। অপভ্রংশে লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে এ যাবৎ পাওয়া গেছে- দোহাকোষগীতি, দোহাকোষনাম চর্যাগীতি, দোহাকোষোপদেশগীতি, কখ দোহানাম, কখ দোহাটিপ্পণ, কায়কোষামৃত বজ্রগীতি, বাক্কোশরুচির স্বর-বজ্রগীতি, চিত্তকোশাজবজ্রগীতি, কায়বাক চিন্তামনসিকার, দোহাকোষ মহামুদ্রোপদেশ, দ্বাদশোপদেশগাথা, স্বাধিষ্ঠানক্রম, তত্ত্বোপদেশশিখর দোহাগীতিকা, ভাবনাদৃষ্টিচর্যাফল, বসন্ততিলকদোহাকোষগীতিকা, মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি প্রভৃতি। জানা য়ায় একমাত্র দোহাকোষগীতি ছাড়া বাকী সবগুলো শুধু তিব্বতি অনুবাদে পাওয়া গেছে। চারটি চর্যার কথা আমরা আগেই বলেছি। চর্যাগুলো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

সরহপা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। সামাজিক বিবেচনায় তিনি বিদ্রোহী ছিলেন এবং আরও একটু অগ্রসর হয়ে বললে বলতে হয়, যে সমাজ ধর্মীয় রীতিনির্ভর এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার বিরুদ্ধে সরহপার অবস্থান। এটি বেশ কঠিন এক শক্ত অবস্থান। কারণ রাজারা তখন ধর্মের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রাজার ধর্মগ্রহণ কিংবা বর্জনের ওপর গোটারাজ্য ধর্মগ্রহণ কিংবা বিসর্জন দিয়েছে। সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছেন প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ কিংবা বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যরা। মোট কথা ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে সমাজের কথা ভাবাই যেত না। সামাজিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক পেশনের একটা চিত্র বা ধারণা পাওয়া যায় চর্যাগুলোর রূপকধর্মিতায়। সেখানে সকল সিদ্ধাচার্যই প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন এবং ত্যাগের, বিশেষ করে শূন্যতার কথা বলেছেন, সরহ সেখানে বলেছেন ভিন্ন কথা।

তিনি নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই সমালোচনাটা শুরু করেছেন তাঁদের দিয়েই-

বক্ষণো মিঙম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চচউ বেউ ॥
মট্টী (পাণি) কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহি (বইসী) অগগি হুনন্ত ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমে।
অকখি উহাবিঅ কুড় এ ধুমে ॥

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণেরা তো যথার্থ ভেদাভেদ জানে না, চতুর্বেদ এভাবেই পড়া হয়। এঁরা মাটি জল কুশ লয়ে (মন্ত্র) পড়ে, ঘরে বসে আগুনে আহুতি দেয়, কার্যবিরহিত অগ্নি হোমের কটু ধোঁয়ায় চোখ শুধু পীড়িত হয়।

দণ্ডী সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে তাঁর আক্রমণ আরো তীক্ষ্ণ-

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅঁববেসেঁ।
বিনুআ হোই হংবুউ এসেঁ ॥
মিচ্ছেহি জগে বাহিঅভুল্লে।
ধম্মাধম্মুণ জানিঅ তুল্লে ॥

অর্থাৎ, একদণ্ডী তিন দণ্ডী প্রভৃতি ভগবানের বেশে ঘুরে বেড়ায়, হংসের উপদেশে জ্ঞানী হয়। মিথ্যাই জগৎ ভুলে বয়ে চলে। এরা ধর্মাধর্ম তুল্যরূপেই জানে না।

জৈন-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে সরহপা যেন খুবই অসহিষ্ণু। তাঁর দোহাকোষে আছে-

দীহণকখ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ন্গগল হোই উপাড়ি অ কেসেঁ।।
খবণেহি জান বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ।।

অর্থাৎ, দীর্ঘ নখ যোগী মলিন বেশে নগ্ন হয়ে উপড়ায়। ক্ষপণকেরা (জৈন সন্ন্যাসীরা) বিড়ম্বিত বেশে মোক্ষের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাইরে নিয়ে চলে। অন্যত্র বলেন,

জই নগ্‌সা বিঅ হোই মুক্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণো অথ্‌থিসিদ্ধি তা জুবই নিতম্বহ ॥
পিচ্ছী গণহে দিঠঠ মোক্‌থ [তা মোরহ চমরহ]।
উঞ্ছে ভো অণোঁ হোই জান তা করিহ তুরঙ্গাহ ॥

অর্থাৎ, নগ্ন হলেই যদি মুক্তি হতো, তা হলে কুকুর শেয়ালেরও হতো। লোম উপড়ালেই যদি সিদ্ধি আসত তা হলে যুবতী নিতম্বেরও সিদ্ধিলাভ ঘটত। পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ দেখা যেত তা হলে ময়ূর-চামড়েরও মোক্ষ দেখা যেত। উচ্ছিষ্ট ভোজনে যদি জ্ঞান হতো, তা হলে হাতি ঘোড়ারও হতো। যোগ সাধনার ক্ষেত্রে তান্ত্রিকযোগীরাও সরহপার আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। তাঁর একটি গানে আছে–

অক্ষে-ন জাণহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণভব কইসন হোই।।
জাইসো জাম মরণবি তোইসো।
জীকন্তে মইলে নাহি বিশেসো।।
জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।

সো করউ রস রসানেরে কঙ্খা।।

অর্থাৎ, অচিন্ত্যযোগী আমরা, জানি না জন্ম মরণ সংসার কিরূপে হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনই, জীবিতে ও মৃতে বিশেষ (কোনো) পার্থক্য নেই। এখানে (সংসারে) যারা জন্ম মরণে বিশঙ্কিত, এরাই রস রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি তিনি এভাবেই আঘাত করেছেন।

সরহ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের প্রথম সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলে পণ্ডিতদের ধারণা। কিন্তু বজ্রযানী সিদ্ধাচার্যদের পথ থেকে এক সময় সরে এলেন তিনি। শূন্যের মধ্যে জীবন তাঁর কাছে অর্থময় মনে হয়নি। মন্ত্র আর ধ্যান তাঁর কাছে বিভ্রম মনে হয়েছে। একটি পদে আছে–

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅণ ধারণ।
সর্ব্বরিরে বঢ় বিবভমকারণ।।

শাস্ত্রকে সরহপা মরুস্থল বলেছেন–

গুরু বঅন অমিঅ রস ধবড়ি ণ পিবিঅউ জেহি।
বহু সাত্তাৎথ মরুস্থলেহি তিসিঅ মরিঅ বো তেহি।।

এটি কেন হবে? সরহ নিজে যোগী ছিলেন। রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন মনে করেন তিনি যোগীশ্বর। তিনি ধ্যান সমাধির সর্ববিধ অভ্যাস এবং চর্চা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ধ্যানজ্ঞান ও সিদ্ধি সাফল্যের চূড়ায় উঠে তিনি কেন মত এবং পথ বদলাবেন? জ্ঞান তপস্যায় যে পাণ্ডিত্য এর প্রতিও বিশ্বাসে চির ধরেছিল। পণ্ডিতদের সম্বন্ধে বলতে দেখি–

পণ্ডিঅ সঅল সত্ত বক্খাণঅ।
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণঅ।।

তিনি যেন একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন–

জ্ঞানহীন পববজ্জে রহিঅউ।
গহী বসন্তে ভাজ্জে সহিঅউ।।

পুরো ব্যাপারটি গোলমেলে মনে হলেও সংকটের কোনো বিহ্বলতা নেই। বরং আমরা একটা প্রত্যাবর্তনকে প্রত্যক্ষ করি। এ প্রত্যাবর্তনটা বিবর্তমানতার মধ্যে।

সরহ বলছেন, নিরন্তর বোধি সর্বত্রই আছে– মানুষ গৃহে থাকা আর বনে থাকা সমান কথা। ভবসংসার এবং নির্বাণ অনুসন্ধানের বিষয় বটে। ভবসংসারই বা কোথায় নির্বাণই বা কোথায়? পরমজ্ঞান ঘরেও নেই বনেও নেই। এভেদকে ভালোভাবে জানতে হবে।

চিত্তকে নির্মল রাখা জরুরি এবং ইন্দ্রিয় সংযম প্রয়োজন। কিন্তু তা সবকিছু ছেড়েছুড়ে কেন? সরহপার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে সহজ বা নৈসর্গিক জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। তিনি সহজবাদের প্রথম আচার্য বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন এবং তাঁর প্রবর্তিত পথ হচ্ছে সহজযান। জীবনের জটিলতাটা এই মতবাদে কমে এসেছে। আর এতে আমরা একটা অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করি– যাকে বলা যায় জীবনবাদ। এখানে সরহ জীবনকে এবং জীবনে ভোগকে ত্যাজ্য বলে মনে করেন না, তাঁর কাছে ত্যাজ্য আসক্তি, ভোগ নয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি ফিরে এসেছেন জীবনের এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে। সহজ ও সাধারণ জীবনের কাছেও প্রত্যাবর্তন করেছেন একই উপলব্ধি থেকে। যেন কল্পিত এক স্বর্গথেকে বিদায় নিয়ে আসা মর্তে। সেখান থেকে নেমে আসা, সে অষ্টম শতকের মহাযানী তান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে, খুবই কঠিন ব্যাপার, ভাবাই যায় না। সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবন যাপন করে সেভাবেই জীবন যাপনে অগ্রসর হয়েছেন তিনি। সাধারণ জীবনে অভ্যস্থ হবার জন্য, নিজেকে সর্বপ্রকার মোহ এবং সংশয়মুক্ত করবার জন্য যেন গলায় পরা মহাযানের উত্তরীওটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে সাধারণ মানুষের সারিতে এসে দাঁড়ালেন। এখন ভিক্ষুদের চীবর পরিধান করেন না। শবরী এক কন্যাকে সঙ্গী করে নিয়েছেন প্রচলিত সব প্রথা ভেঙ্গে চূরে। তিনি বলেন, বিষয়ের মধ্যে রমণ করবো কিন্তু বিষয়ের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকবো, পানির মধ্যে থেকে পানি স্পর্শ করবো না এটাতো হয় না। জগৎ সহজ, আনন্দে ভরপুর, নৃত্য করো, গান করো, এবং পরিপূর্ণভাবে বিলাস করো।

আমরা প্রচলিত অর্থে একে হয়ত অধঃপতন বলবো। মুখ ফিরিয়ে নেব। মূল্যবোধের অবক্ষয় ভেবে একে রুখতে আটসাট বেঁধে মাঠে নামব। তাঁর কালও হয়ত এমনি নেমেছিল। কিন্তু তাঁকে বুঝতে পেরে, উপলব্ধি করে, আবার তাঁকে সেরা সিদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

নিঃসন্দেহে একালেও একে অভাবনীয় ঘটনা হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। কিন্তু তাঁর দোহা কিংবা চর্যাকে বিশ্লেষণ করা হলে প্রথা বিরোধী এক কবি এবং সিদ্ধাচার্যকে পাওয়া যাবে, যাঁর চিন্তা বা ধ্যানের মধ্যে বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট। এটি একাধারে মানসিক বিকাশ এবং পাশাপাশি পরিপক্ক চিন্তারও প্রকাশ।

যোগ সাধনার সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় রয়েছে। এক সময় তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন–

পবন ধরিঅ অপ্পান ম ভিন্ধহ।
কঠ জোই নাসগগো ম বন্ধহ।

কার্যযোগীরা নাসাগ্রে চিত্তের উপস্থিতির কথা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত

করে। একে তিনি আত্ম প্রবঞ্চনা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরবঞ্চনাও মনে করেন। কিন্তু চিত্তের অপারশক্তিতে বিশ্বাসী মানুষ, চিত্তের স্বরূপ উপলব্ধি করা মানুষ, কখনোই সংসার বিরাগী হতে পারে না। চিত্ত, মন এবং বিজ্ঞান বৌদ্ধ পরিভাষায় এ তিনেরই উপস্থিতি রয়েছে। চঞ্চল চিত্তে 'কাল' প্রবেশ করলেও বৈজ্ঞানিক বোধ তাকে অতিক্রম করে। কর্মের বন্ধন-মুক্তি থেকে মনের মুক্তি। এই মুক্ত মন পরম নির্বাণ লাভ করে। চিত্তকে বশে আনতে জোর খাটালে চলে না, চঞ্চল তরঙ্গগতি চিত্তকে তার স্বভাবের মধ্যে ছেড়ে দিলে তা নির্মল হবে এবং স্থিরতা পাবে। সরহ বলেন, সমুদ্রের ক্ষার-জল মেঘ হয়ে মধুর রূপে বর্ষিত হয়। স্থিরচিত্ত হয়ে যদি কেউ পরমার্থ করে বিষয়-বিষও অমৃত হয়ে যায়।

সরহ যোগ এবং আচার প্রতিপালনের চাইতে করুণা এবং শূন্যতার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় চিন্তায় করুণা এবং শূন্যতা হচ্ছে নৈরাত্মা বা নৈরামণি। একে লাভ করবার জন্যই সকল সাধনা। সরহ নির্বাণ এবং শূন্য নৈরামণিকে সংসার বাদ দিয়ে অর্জন করতে চাননি। সংসারই শুধু নয় শরীরকেও অর্থপূর্ণ এবং শুদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ন বলেছেন। সে সময় দেহকে উপলব্ধি করা ও বড় জ্ঞান করা এবং চিত্তশুদ্ধিকে গৌণ করে দেখা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল সিদ্ধাচার্যদের জন্য। অথচ সরহ বলেন, দেহ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থ। এই দেহের মধ্যেই স্বরস্বতী, সোমনাথ, গঙ্গাসাগর, বানারস, প্রয়াগ, ক্ষেত্র, সমতট, পীঠ এবং উপপীঠ রয়েছে। এই উপলব্ধি অনেক বড় বোধ থেকে পাওয়া– যা প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণাকে অতিক্রম করে যায়।

১. ড. আহমদ শরীফ, বাংলা সাহিত্যের সূচনা : চর্যাগীতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান, পৃ. ৪০৬।
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পতরু প্রকাশনী, পৃ. ৫০।
৩. ড. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, ভূমিকা, পৃ. ৫।
৪. ড. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, ভূমিকা, পৃ. ৫।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি পর্ব), সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পতরু প্রকাশনী, পৃ. ৫০।
৬. ড. আহমদ শরীফ, বাংলা সাহিত্যের সূচনা : চর্যাগীতি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, সম্পাদনা : আনিসুজ্জামান, পৃ. ৪১২।
৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি পর্ব), সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পতরু প্রকাশনী, পৃ. ৫০।
৮. সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
৯. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃ. ৩৯।
১০. ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৫৬।

প্রাচীন শিল্পকলা

শিল্পকলার মধ্যে আদিম লোকায়ত বাঙালির চারুকলা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পের কথা আসে। চারুকলার নির্দশন পাওয়া যায়নি। সঙ্গীতের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। চর্যাপদের গানগুলোর কথা আমরা জানি তার রাগ-রাগিনী ও তাল-লয়ের উল্লেখ রয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন আজকের দিনের বাঙালি বাউল, ভাটিয়ালী এবং ঝুমুর গানে যে সংস্কৃতির প্রকাশ এবং যা আজও বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীতের পর্যায়ে স্থানলাভ করেনি সে সব গানে কৌম বাঙালির লোকায়ত সঙ্গীতের ধারাই বহমান। অতুল প্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল তাঁদের অসংখ্য গানে লোকায়ত এই সঙ্গীতকেই উচ্চস্তরে সাঙ্গীতিক মর্যাদা দিয়েছেন।

লোকায়ত সঙ্গীত ও নৃত্য

সুপ্রাচীন কৌম বাঙালির নৃত্য-গীতের যে ধারা বহমান তা প্রকৃতিঘনিষ্ঠ মানুষদেরই মনের আনন্দ কিংবা দেবতার আরাধনাজাত। প্রকৃতির কাছ থেকে সুর এবং হৃদয়ের কাছ থেকে নৃত্যের উৎসাহ প্রতিটি মানুষেরই সহজাত প্রবৃত্তি। সমতটের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে একইভাবে লোকায়ত সঙ্গীত এবং নৃত্যের তালের কথা উল্লেখ আছে। এখানে ৫০টি পদে ১৫টি রাগের কথা উল্লেখ আছে। এই রাগগুলো হলো : পটমঞ্জরী, পবরা বা গৌরা, অরু, গুর্জরী, দেবক্রী, দেশাক, কামুদ, ধনসী বা ধানশ্রী, রামক্রী, বলাড্ডী, সবরী, মল্লারী, মালসী, বঙ্গাল, বৈরবী প্রভৃতি। বিরূবা পাদ-এর ৩নং চর্যার রাগ বাহু গবরা। বীণাপাদের ১৭নং পদের গানের রাগ পটমঞ্জরী। ডোম্বীপাদের ১৪নং গানের রাগ ধনসী বা ধানশ্রী। সরহপার ২২নং পদের রাগ গুর্জরী, ৩৭নং পদের গানের রাগ কামুদ রাগ এবং ৩৯নং মালসী রাগ। তাঁদেরকে আমরা ত্রিপুরা বা সমতটের লোক বলেছি। তাঁদের রাগ-রাগিনীর প্রসার নিশ্চয়ই এতদাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

নৃত্য

চর্যাপদে নৃত্যগীতের কথা জানা যায়। বিশেষ করে সবর নৃত্য। এছাড়া মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্ম চর্চার ক্ষেত্রে নৃত্য-গীতের প্রাসঙ্গিকতা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে পাথর কিংবা পোড়ামাটির চিত্রফলকে নানারকম নৃত্যের ভঙ্গি পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুত নৃত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ময়নামতিতে প্রাপ্ত মাটির ফলকগুলোকে। আর উচ্চকোটি লোক সমাজের মধ্যে প্রচলিত নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায় লালমাই-ময়নামতিতে পাওয়া বিভিন্ন প্রস্তরে নির্মিত নৃত্যপর দেবদেবী, অপ্সরা, মন্দির নর্তকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গীত ও ভঙ্গিমায়। চর্যাপদে বহু জায়গায়।

গীতের সঙ্গে নৃত্যের কথা বলা আছে। সেখানে দেখা যায় বীণা বাজছে, মদ্যপানে সবর-সবরী এবং অন্যান্যরা নৃত্য করছে। লাউয়ের খোলের সাহায্যে তারের বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন এবং নৃত্য সহকারে বাউল গান পরিবেশন সেকাল থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। চর্যাপদে বৌদ্ধ নাটকের নৃত্য গীতের কথা উল্লেখ আছে। এতে মনে হয় নৃত্য-নাট্যের প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই (নাচন্তি বাজিল গায়ন্তি দেবী, বৌদ্ধ নাটক বিসমাহোই)।

মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্পের ব্যবহার মূলত প্রাক্‌দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকজনই শুরু করেছে। কুমোর মাটিতে নানা মূর্তি গড়ে। মাটির পুতুল, মাটির খেলনা তৈরি করে। মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে। এটি করতে গিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ফেলে। আর তখনই তা শিল্পের শাশ্বত রূপ লাভ করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটিই চলে আসছে। লালমাই-ময়নামতি বিহারে অজস্র মৃৎশিল্পের আলামত পাওয়া গেছে। মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, বাসন, কোসন এবং অন্যান্য পাত্র ভগ্ন অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে।

পোড়ামাটির ফলক

মাটির তৈরি ইট বা মাটির ফলক ছাঁচের সাহায্যে অথবা হাতের আঙ্গুলের টিপে টিপে তৈরি করে রোদে শুকিয়ে আগুনে পোড়ানো হয়। এই পোড়ামাটির ফলক গৃহ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে লালমাই-ময়নামতিতে। শিল্পীরা এখানেও তার চারপাশের মানুষ, দেব-দেবীর মূর্তি, পশু-পাখি, গাছ, লতা-পাতা প্রভৃতির চিত্র বানাতে গিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়েছেন লোকায়ত সহজ জীবনের চিত্র এগুলো। ড. রায় যথার্থই বলেছেন প্রাচীন বাঙালির লোকায়ত কিশোর প্রধান অভিজ্ঞান এই মাটির ফলকগুলো। ময়নামতির মৃৎফলক কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবেই লৌকিক এবং সাধারণ লোকায়ত কৃষি নির্ভর জীবনের প্রতিফলন। স্থিতি এবং গতির বিভিন্ন অবস্থায় বস্তু-প্রাণী জগতের সকল উপাদানকে আবেগের দৃষ্টিতে দেখে লোকশিল্পীরা বিচিত্র ভাব এবং ভঙ্গিতে কখনো অপূর্ব গতিময়তায় শিল্পরূপ দিয়েছেন। ফলকগুলোকে একটির পর অন্যটি সাজালে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। ড. রায় বলেন ধর্মগত উচ্চকোটি স্তরের ঐতিহ্যগত শিল্পের কোন স্তর এমন সুবিস্তৃত সামাজিক পরিবেশ, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির বৈচিত্র্যে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার এমন সংযোগ এমন স্বতোচ্ছসিত ভঙ্গিমা ও চালচলন প্রকাশের এমন সজীব ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় সুদুর্লভ।[১]

ময়নামতির মৃৎ ফলকগুলোতে সে এলাকার শিল্পীগণ পরিবেশ সচেতনতা ও

মানসিক সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। ফলকগুলোতে দেখা যাচ্ছে বাস্তব এবং কাল্পনিক বস্তুর নিদর্শন। নর-নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে ক্রিয়াশীল অবস্থায়। ঢাল-তলোয়ারসহ যোদ্ধা, তীর-ধনুক হাতে ধানুকী, প্রেমালাপ-মগ্ন নর-নারী, উড়ন্ত নারী, কুস্তিগীর প্রভৃতির যেন একটি মানবিক জগতকে জীবন্ত রূপ দিয়েছে। প্রাণী জগতের জীব-জন্তুর মধ্যে আছে সিংহ, হস্তি, অশ্ব, বানর, কুর্ম, মহিষ, ষাঁড়, বন্য শূকর, কুমির প্রভৃতি। ধাবমান অশ্ব, দৃপ্ত চেহারার সিংহ, ফণা তোলা সাপের সঙ্গে বেজির লড়াই প্রভৃতি প্রাণী জগতের গতিশীলতা ও বাস্তবতাকে ধরে রেখেছে। উৎকীর্ণ পাখিগুলোর মধ্যেও এই গতিশীলতা লক্ষ্যযোগ্য। জলচর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে মুক্তার ছড়া ধারণকারী রাজহংস এবং পদ্মনাল আহারও রাজহংস। কতগুলো ফলকে গাছপালা এবং মতিফ উৎকীর্ণ। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধ, স্তূপ, ত্রিরত্ন ধর্মচক্র ত্রিশূল ও কীর্তিমুখ। অর্ধ দৈব ও অপার্থিব জীবের মধ্যে আছে কিণ্নরী, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরী, যক্ষ, প্রভৃতি কাল্পনিক জগতের প্রাণী। ময়নামতির এই প্রত্নিনিদর্শনগুলেঅতে সেখানের সাধারণ লোকের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।[২]

প্রস্তর মূর্তি ও ধাতব মূর্তি

সপ্তম শতকে কুমিল্লা জেলার দৌউলবাড়ি গ্রামে অষ্টধাতুর তৈরি একটি সর্বাণী দেবীর মূর্তি এবং অশ্বচালিত রথে উপবিষ্ট সূর্য দেবতার একটি মূর্তি পাওয়া যায়। দুটি মূর্তির ঋজু ও আড়ষ্ট দেহ ভঙ্গি এবং কাঠামো বিন্যাস শিল্প বোদ্ধাদের কাছে বিস্ময়সহ নতুন যুগের নতুন শিল্পের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দেয়। এই সম্ভাবনা হচ্ছে গুপ্ত ভাস্কর্য যুগকে অতিক্রম করে পাল যুগের শিল্পী ভাবনাকে স্পর্শ করে। সর্বাণীর সহচরীদের হিল্লোলিত দেহ-ভঙ্গিমায় এবং সূর্য মূর্তিতে অশ্বগুলো ঊষা ও প্রত্যুষার দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয় ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিমাগুলোর ঋজু এবং কঠিন ভঙ্গির বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। সর্বাণী দণ্ডায়মান ঋজু সমপদস্থানক ভঙ্গিতে এবং সূর্য উপবিষ্ট স্পষ্ট পর্যঙ্কবন্ধে।[৩]

বেলে পাথরের মূর্তি

লালমাই-ময়নামতিতে যে সব ভাস্কর্য বা দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে এগুলোর মধ্যে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের মূর্তিগুলো ধূসর, সাদা বা দাগযুক্ত বেলে পাথরে তৈরি। রূপবান মুড়া মন্দিরে পাওয়া বেলে পাথরের তৈরি দণ্ডায়মান লোকোত্তর বুদ্ধ মূর্তিটি এই পর্যায়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বেলে পাথরের তারামূর্তি কুমিল্লার কচুয়া থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়া আরো কতগুলো ভগ্ন মূর্তির কথা আমরা প্রত্নতত্ত্ব অধ্যায়ে বলেছি। বাংলাদেশে বেলে পাথরের তৈরি এসব মূর্তিতে কোনও সন তারিখের উল্লেখ নেই। এমনকি কোনও লেখাও নেই যে তার কাল নির্দেশ করা

যাবে। গঠন-বিন্যাস অনুসারে একে গুপ্ত পরবর্তী যুগ অর্থাৎ সপ্তম শতকের নিদর্শন বলে মনে করা হয়। মূর্তিতে কোনও শিল্পীর নাম উল্লেখ না থাকার কারণে মূর্তিশিল্পীর নামও জানা যায় না। বেলে পাথরে তৈরি মূর্তিগুলো স্থানীয় অর্থাৎ ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের বেলে পাথর দ্বারা স্থানীয় শিল্পীরা নির্মাণ করেছেন। তাঁদের নির্মাণ বৈশিষ্ট্যে বাইরের প্রভাব রয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্পীদের স্বকীয়তার পরিচয় বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মূর্তিগুলো নীলাভ কষ্টি পাথরের। তবে এ ধরনের মূর্তি লালমাই-ময়নামতি এলাকায় দেখা যায় না।

কালো পাথরের মূর্তি

তৃতীয় পর্যায়ের মূর্তিগুলো হচ্ছে কালো কষ্টি পাথরের। লালমাই-ময়নামতি এবং তার আশে-পাশে এ ধরনের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। যেমন : ত্রিবিক্রম বিষ্ণু, তারা মূর্তি, মারীচী, মঞ্জুবর, পার্বতী, হরগৌরী, নন্দী, মহিষমর্দিনী, মনসা, গণেশ, সূর্য, হেরুক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলো দেব-দেবীর মূর্তি। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে এসব দেব-দেবীর কথা রয়েছে। তবে আরাধ্য দেবতার মূর্তি হিসেবে সমকালে তাঁর দেবতুল্য মর্যাদা ছিল, বর্তমানে প্রত্নশিল্প হিসেবে তাঁর মূল্য আকাশছোঁয়া। কিন্তু এগুলো সর্বকালেই মহামূল্যবান ভাস্কর্য শিল্প হিসেবে। এই ভাস্কর্যগুলো যাঁরা নির্মাণ করেছেন মূতিগাত্র বা মূর্তিলেখে সে ভাস্করদের নাম পরিচয় নেই। যাঁরা নির্মাণ করিয়েছেন তাঁদের কারো কারো নাম হয়তো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পীরা আড়ালেই থেকে যাবেন। মূর্তিগুলোয় যেমন ধ্যানমগ্নতা আছে তেমনি আছে নৃত্যপরায়ণতা। শিল্পী এখানেও দেবতা সৃষ্টি করতে গিয়ে মানবিক কল্পনাকে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। দেবীর মূর্তি গড়তে গিয়ে তাঁর মানসনেত্রে দেখা প্রিয় কারো মুখাবয়ব মূর্তিগাত্রে স্থাপন করেছেন। তাই মূর্তিগুলোর রূপ এবং শৈলী প্রতিমা লক্ষণ বা শাস্ত্রত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। শিল্পীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত।

ব্রোঞ্জের মূর্তি

সপ্তম থেকে ধমক শতকের মধ্যে তৈরি ময়নামতির ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতুর মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্প হিসেবে খুবই আকর্ষণীয়। এই মূর্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে মঞ্জুশ্রী, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর এবং চতুর্ভূজা ও অষ্টভূজা তারামূর্তি। ভোজরাজার বাড়িতে ব্রোঞ্জের তৈরি বজ্রস্বত্ব মূর্তি পাওয়া গেছে। শিল্প হিসেবে এটি অনন্যসাধারণ বলে শিল্পযোদ্ধাদের ধারণা। ব্রোঞ্জের তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতির অজস্র মূর্তি পাওয়া গেছে ময়নামতি অঞ্চলে। ব্রোঞ্জের ঘন্টী এবং নানারকম স্তূপের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। প্রতিমাগুলো নিঃসন্দেহে পূর্ব ভারতীয় রীতির ভাস্কর্য নিদর্শন।

এগুলোর গঠনরীতি স্থূল এবং সরল। এদের মুখে ও শরীরে কমনীয়তার অভাব। পৃষ্ঠপটের কীনারা বরাবর গুটিকামতিফ মূর্তিগুলোর প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। এখানে অবশ্য শিল্পীর মনের মাধুরী মেশানোর অবকাশ কম বলে মনে হচ্ছে।

আমরা আগেই বলেছি ভাস্কর্য সৃষ্টিতে কৃতিত্বের পরিচয় থাকলেও শিল্পীর পরিচয় নেই। তবে সমতটের একজন শিল্পীর নাম জানা যায়। তিনি হচ্ছেন শুভদাসের পুত্র সংকদাস। এর বাইরে আর কারো নাম জানা যায় না।

স্থাপত্য

বিহার

আবহাওয়ার আদ্রতাজনিত কারণে প্রাচীনকালের খুব কম স্থাপত্যই টিকে আছে। যেগুলো টিকে আছে সেগুলো মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চলে কতগুলো বিহারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব অংশে আমরা আবিষ্কৃত প্রতিটি বিহারের পরিচয় দিয়েছি। শালবন বিহার (ভবদেব বিহার), আনন্দ বিহার, রূপবান বিহার, চারপত্র মুড়া, কোটিলা মুড়া প্রভৃতিতে বিভিন্ন নির্মাণ যুগের স্থাপত্যিক নিদর্শন ধরা পড়েছে। ইট, চুন, শুরকিতে নির্মিত এই বিহার স্থাপত্য যুগে যুগে পরিবর্তিত কাঠামোয় নতুন নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আনন্দ বিহার, শালবন বিহার, নির্মাণশৈলীর দিক থেকে স্থপতি এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে আদর্শস্থানীয় বলে মনে হয়েছে। এঁরা বলেছেন শালবন বিহারের আদলে সোমপুর (পাহাড়পুর) বিহার নির্মিত হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রাচ্যের বহু দেশেই এই বিহার স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

স্তূপ

বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে স্তূপ। একটি বৃত্তাকার বেদীর ওপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির অণ্ড এবং তার ওপর একটি হারমিকা বা বর্গাকার স্ত স্তশীর্ষ, শীর্ষের ওপরে গোলাকার ছত্রক। এই হচ্ছে স্তূপ। পরে অবশ্য নির্মাণশৈলীতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল স্তূপের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে তার প্রায় সবগুলোই নিবেদন স্তূপ। তবে ময়নামতির কোটিলা মুড়ার স্তূপগুচ্ছ এসেছে ব্যতিক্রম। ময়নামতিতে ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে। এতে করে পূর্ববঙ্গের স্তূপগুলোর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ময়নামতির কোটিলা মুড়ায় ইটের তৈরি কতগুলো স্তূপের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন কোটিলা মুড়া স্তূপ সমষ্টি স্তূপের অন্যান্য নিদর্শন থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনটির মধ্যে কেন্দ্রীয় স্তূপটি বিশিষ্ট। এর ভেতরটা ফাঁপা। গোলাকার স্তূপের ঠিক কেন্দ্রে

অবস্থিত একটি নীরেট স্তম্ভদণ্ড থেকে ৮টি দেয়াল শূন্য স্থানকে বিভক্ত করে এসে যুক্ত হয়েছে বৃত্তাকার দেয়ালের সঙ্গে। কোটিলা মুড়ার স্তূপ তিনটি ত্রিরত্নের প্রতীক। কেন্দ্রীয় স্তূপের ৮টি দেয়াল ধর্মচক্রের ৮ অর। এই স্তূপের কক্ষগুলোতে প্রস্তর মূর্তি ও মাটির ক্ষুদ্রাকার স্তূপ পাওয়া গেছে। কোটিলা মুড়ার নিদর্শনটি দক্ষিণ ভারতের কক্ষযুক্ত স্তূপের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪]

মন্দির

প্রাচীনকালের অধিকাংশ মন্দিরই বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বৈন্য গুপ্তের গুণাইঘর লিপিতে মন্দিরের পরিচয় রয়েছে। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে সমতটে এসে ১০০টি হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নির্মিত বেশ কিছু মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মন্দিরের স্থাপত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে নেপালে চিত্রিত এবং বর্তমানে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত (অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা) গ্রন্থের Add 1643 নম্বর পাণ্ডুলিপিতে মন্দিরের অনেকগুলো চিত্র স্থান পেয়েছে। এর থেকে প্রাচীন কালের মন্দির স্থাপত্যের ধারণা পাওয়া যায়। শালবন এবং আনন্দ বিহার বা ভোজ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির থেকে স্থাপত্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। নির্মাণশৈলীতে স্থাপত্যকলার সামান্য হলেও পরিচয় মেলে উৎখননের ফলে।

প্রাচীন শিল্পের অনেক নিদর্শনই হারিয়ে গেছে অথবা জলবায়ুর কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার পরও কালের করালগ্রাম এবং দুর্বৃত্তদের চৌর্যবৃত্তি ও লুটতরাজের ক্ষয়-ক্ষতি ডিঙ্গিয়ে যা পাওয়া গেছে তা নিয়ে রীতিমতো গর্ব করা চলে। প্রাচীন কালের শিল্পীরা আজকের শিল্পীদের মতো শুধু শিল্প সৃষ্টির জন্য কোনও কাজ করেননি। এঁরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে নানা মাধ্যমে কাজ করেছেন। এগুলো যে ফরমায়েসী কাজ অথবা নির্দেশিত হয়ে করেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পসৌকর্য ফুটে উঠেছে এবং কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। এসব শিল্পীদের আমরা নাম জানি না বটে, তাঁরা নিজেদের ছবিও অঙ্কন কিংবা নির্মাণ করেননি। তা সত্ত্বেও এঁরা বাস্তব ও কল্পনায় আমাদের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। এদের উত্তরাধিকারী আমাদের বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী এবং কলাকুশলীদের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রেরণা হয়ে আছে।

১. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৬৫২।
২. মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার শিল্পকলা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, পৃ. ১৯৬।
৩. Niharranjan Roy, Sculpture HBI, P. 524-525.
৪. N. Ahmed, Monuments, P. 69-70.

মূর্তি বা বিগ্রহতাত্ত্বিক পরিচয়

স্থাপত্য এবং তাম্রপট্ট নিদর্শনের পাশাপাশি প্রাচীন সমতট অঞ্চলে যে সমস্ত ভাস্কর্য-প্রতিমা বা মূর্তি বিগ্রহের নিদর্শন পাওয়া গেছে নানা কারণে তার গুরুত্ব অপরিসীম। মূর্তিগুলোর প্রধান পরিচয় এগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং প্রাচীন বাংলার গৌরব। এ গুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় প্রত্নসম্পদ অধ্যায়ে আমরা দিয়েছি। কিন্তু মূর্তিগুলো নিতান্তই মূর্তি বানাবার জন্য নয় ধর্মীয় অনুভূতি এবং বিশ্বাসকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাচীন কালের হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম-তাত্ত্বিক বিশ্বাসের ওপর একটি অথবা একাধিক মূর্তিতাত্ত্বিক ভাবলোক সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সেকালেও দেখা গেছে নানা মত এবং নানা শাখা প্রশাখার বিস্তার লাভ। এসব মত ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে শাখা প্রশাখাকে অনুসরণ করে মূর্তি বা বিগ্রহ ভাবনায় এসেছে নতুন মাত্রা।

একটি সহনশীল আবহে পরস্পরের ধর্ম ও মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় রয়েছে সমতটের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসী লোকদের মধ্যে। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধ বিহার এবং বৌদ্ধ রাজারা হিন্দুমন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন এবং বিহার বা মন্দিরের জন্য জায়গা দিয়েছেন, বিহার বা মন্দিরের লোকদের খোরপোষের ব্যবস্থা করেছেন। এই সুবাদে সমতট অঞ্চলে, বিশেষ করে লালমাই-ময়নামতিতে সাংস্কৃতিক পরিচর্যার যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তা শুধু ধর্মীয় আলোচনা কিংবা শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সম্ভাব্য সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমৃদ্ধ শাখাগুলোর মধ্যে একটি ভাস্কর্য প্রতিমা বা মূর্তি বিগ্রহ। সে সময় মূর্তি তৈরির আলাদা এক ভাবলোক সৃষ্টি হয়েছিল সমতটে। রাজা বৈন্যগুপ্ত থেকে শুরু করে খড়্গ, রাত দেব, লোকনাথ, চন্দ্র, পাল, বর্মন, সেন এবং হরিকেলদেব (ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতক) পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধর্মচর্চার পাশাপাশি এখানে মূর্তি নির্মাণের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনব নানা তত্ত্ব এবং নির্মাণ কৌশল বা শৈলী অবলম্বন করা হয়েছে। গোটা বঙ্গদেশ তো বটেই সারা ভারতবর্ষে এই মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কমবেশি প্রভাব বিস্তার লক্ষ করা গেছে। এছাড়া উত্তর ভারতীয় বিগ্রহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে কখনো কখনো নতুন মূর্তি সৃষ্টির চমক সমাদৃত হয়েছে। মূর্তি বৈশিষ্ট্যে, মূর্তিতত্ত্বে, অঙ্গবিন্যাস এমনকি মূর্তির নির্মাণ সামগ্রি বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে সমতটে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। এ স্বাতন্ত্র্য মূর্তিতত্ত্বে আলাদা ভাবলোকের জন্ম দিয়েছে– যা থেকে আমরা অনায়াসেই সে সময়কার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মসূত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি।

নিম্নে সমতট অঞ্চলে পাওয়া কিছু মূর্তির তাত্ত্বিক পরিচয় তুলে ধরা হলো, যা থেকে সমতটের মূর্তিতাত্ত্বিক ভাবলোক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে–

গৌরীপট্ট

প্রকৃতি বা নৈসর্গিক নারীর সাহায্য ছাড়া কোনো পুরুষের পক্ষে একাকী কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আর এই যুক্তির সূত্র ধরেই শিবলিঙ্গের তলদেশে স্থাপিত হয়েছিল গৌরীপট্ট (কৌণিক নহরযুক্ত একটি গোল পাদপট্ট) এবং শিবের পাশে আদি রসাত্মক ভঙ্গিতে পার্বতী যুক্ত হয়েছেন। গৌরীপট্টের একটি আদর্শ নিদর্শন (লিপি সম্বলিত) ইতোপূর্বে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার দেউলবাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব আট (অষ্টম) শতক। বর্তমানে চণ্ডিমুড়া মন্দিরে এটি সংরক্ষিত আছে।[১]

নটরাজ

পাল-চন্দ্র-উত্তরকালে বাংলাদেশে বিষ্ণু ও শিবের উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে সমতট অঞ্চলে নটরাজের উপাসক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এযাবৎ বাংলাদেশ থেকে আবিষ্কৃত নটরাজ মূর্তির সংখ্যা ১৭। এগুলোর হাতের সংখ্যা হয় ১০ অথবা ১২। মূর্তিগুলোর ভাস্কর্যশৈলীতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথাসিদ্ধতা বজায় রয়েছে। এই ১৭টি মূর্তির মধ্যে মাত্র ১টি পাওয়া গেছে রাজশাহীতে। বাকি ১৬টি পাওয়া গেছে ঢাকা-কুমিল্লা অঞ্চলে। সুতরাং এক প্রকার নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সেন আমলেও সমতট একটা বিশেষ মূর্তিতাত্ত্বিক স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল।[২]

ময়নামতিতে পাওয়া একটি তামার লিপি ফলকের বিবরণ অনুযায়ী হরিকেলদেবের রাজধানী ও রাজ্যের নাম ছিল পট্টিকের। সে রাজ্যের প্রধান দেবীর নাম ছিল চূণ্ডা।[৩]

কুমিল্লা দক্ষিণ মোহাম্মদপুর থেকে সংগ্রহ করা দ্বিভূজাদূর্গা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। উত্তর লক্ষ্মীপুর থেকে সংগৃহীত একটি বিষ্ণুমূর্তি ময়নামতি জাদুঘরে আছে।[৪]

কাঠের তৈরি নিদর্শন

চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ অনুযায়ী সবচেয়ে প্রাচীন মূর্তি তৈরি হয়েছিল চন্দন কাঠ দিয়ে। সম্ভবত এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সমতট অঞ্চলে চন্দ্র শাসনামল থেকে মূর্তি তৈরির জন্য কাঠ ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এযাবৎ আবিষ্কৃত কাঠের তৈরি নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের জিন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত মুরাদনগর থানার কৃষ্ণপুর থেকে সংগৃহীত স্থানক বিষ্ণু শ্রীধর, কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত এবং ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত স্থানক বিষ্ণু ও লোকেশ্বর।[৫]

চুন-বালি মিশ্রণজাত উপকরণে তৈরি মূর্তি

এযাবৎ কেবল একটি নিদর্শনই পাওয়া গেছে। ময়নামতি কোটবাড়ি টিলার ঢালে অবস্থিত ইটাখোলা মুড়ার একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়। এটি একটি মুণ্ডভাঙ্গা তথাগত অক্ষোভ্য। প্রায় প্রমাণ আকারে তৈরি এই নিদর্শনে যোগাসন ঠামে বিধৃত তথাগতের পায়ের পাতা উল্টানো এবং পদ্মখচিত। চোখের পাতা পরস্পর আবদ্ধ এবং মুখের ভাব মোহাবিষ্ট। দেহ লম্বাটে এবং গড়ন পেশীবিমুক্ত। সারা শরীর পরিপাটি করে ভাঁজ করা সংঘাতি দিয়ে ঢাকা। স্তর বিন্যাস ও শিল্পশৈলী অনুযায়ী এর সময়কাল অষ্টম-নবম শতকে ন্যস্ত করা যায়।[৬]

মিশ্রধাতু

কুমিল্লার মোস্তফাপুর থেকে সংগৃহীত এবং ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত লোকেশ্বরের মুণ্ড। ময়নামতির শালবন বিহারে ক্ষুদ্র আকারের ১৫০টির বেশি ধাতব মূর্তি পাওয়া গেছে।

ভোজবিহার বজ্রসত্ত্ব

খননের ফলে মিশ্রধাতুর এই মূর্তিটি পাওয়া যায়। এর পরিমাণ হলো ১.৪০ মি. × ১.২০ মিটার। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধাতব মূর্তি। সম্পূর্ণ গোলমণ্ডলে তৈরি এ মূর্তিতে বজ্রসত্ত্বের একটি মুখ ও দুটি হাত। যোগাসনে উপবিষ্ট থেকে তিনি তার বুকের মাঝামাঝি অংশের সামনে রাখা ডান হাতে একটি দ্বিমুখ বজ্র এবং বাম কোমরের নিচে রাখা বাম হাতে একটি ঘণ্টা ধরে রেখেছেন। তাঁর মুকুটের চারপাশে চারজন ও ওপরে একজন তথাগতের প্রতিকৃতি বিধৃত। দেহের আদলে মেদবিহীন লম্বাটে পরিলেখ বিদ্যমান। দেহের ওপর অংশের ডান দিক খোলা এবং অপর অংশ সংঘাতি দিয়ে ঢাকা। মাথায় মুকুট, কাঁধের নিচ পর্যন্ত গুচ্ছাকারে ছড়িয়ে পড়া বেণিবদ্ধ চুল, লম্বা কর্ণালঙ্কার, আঙ্গটির অনুরূপ অঙ্গদ। মাদুলিসহ সরু উপগ্রীব, সরু কঙ্কন, সুচালো নাক, কৌণিক বিক্ষেপসহ আধানির্মীলিত পটলচেরা চোখ, কপালের বুটিদার উর্ণা প্রভৃতি গোটা নিদর্শনকে এক অনন্য নান্দনিকতা ও আধ্যাত্মিকতাবাদে পুষ্ট করে তুলেছে। ময়নামতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভাস্কর্যভাবলোকের এটি আদর্শ উদাহরণ। সব কিছু মিলিয়ে এর সময়কাল নবম-দশম শতকে ন্যস্ত করা যায়।[৭]

লোকনাথ-মূর্তি

শালবন বিহারে লোকনাথের যে মূর্তি পাওয়া গেছে তা সুখাসন ভঙ্গি বজায় রেখেছে। এটি শালবন বিহারের খৰ বসতি আমলের স্তরায়ণে পাওয়া গেছে।[৮]

চন্দ্র আধিপত্যাধীন রাজনৈতিক বলয়ের প্রথাসিদ্ধ রীতিবৈশিষ্ট্য সম্বলিত দৃষ্টান্ত মূলক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে প্রাচীন সমতটে প্রচুর মূর্তি পাওয়া গেছে।

এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত বইরচন, উজাইনির তথাগত অমিতাভ, কুমিল্লার বুড়িচং-এর পিয়র থেকে সংগৃহীত এবং ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত মারীচী, মঞ্জুবর, হেরুক, সেচুয়া থেকে সংগৃহীত বিষ্ণু, আনন্দ বিহারে পাওয়া শাক্যমূর্তি উল্লেখযোগ্য।[৯]

লালমাই-ময়নামতির বৌদ্ধমূর্তি

এ শ্রেণীর মূর্তিগুলো আলোচনা করার জন্য তিনটি নিদর্শন রয়েছে। এর সবকটিই অবলোকিতেশ্বরের।

কোটিলা মুড়ার অবলোকিতেশ্বর

কোটিলা মুড়া ঢিবি খননের ফলে এক সারিতে তিনটি স্তূপের অণ্ডের নিচের অংশসহ মেধি আবিষ্কৃত হয়েছে। মাঝের স্তূপটির স্মারকগর্ভ থেকে খণ্ডিত আকারে দুটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। উভয় মূর্তির নমুনা প্রকৃতি নিম্নোক্ত কারণে একই ধরনের বলে মনে হয়। প্রথমত, মূর্তি দুটি স্থানীয়ভাবে লভ্য কোমল পললপাথরে তৈরি। দ্বিতীয়ত, উভয় মূর্তিই বলিষ্ঠ নতোন্নত কৃৎকৌশলে একটি পট্টঠেসের বিপরীতে উৎকীর্ণ। তৃতীয়ত, সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত উভয় মূর্তির মূর্তিতত্ত্ব একই রকম। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে স্তরায়নের তুলনামূলক আলোচনা করে এগুলোর সময়কালকে সপ্তম শতাব্দীতে ন্যস্ত করা যায়।

প্রথম মূর্তিটির মাপ ৭৭ সে.মি. × ৪৬ সে.মি। এ নিদর্শনে অবলোকিতেশ্বরের একটি মাথা ও চারটি হাত। তিনি একটি বিরাটাকার সনাল পদ্মের ওপর দুপা ভাঁজ করে আসীন রয়েছেন। বাম হাঁটু উঁচু করা এবং এ হাঁটুর ওপরে বাঁয়ের প্রধান হাতের কনুইর ভার রেখে হাতটির ওপর ঝোঁকানো মাথা ঠেকানো আছে। ডানের প্রধান হাতটি জানুর ওপর রাখা। পেছনের ডান হাত আসনের ওপর ঠেস দেয়া এবং চতুর্থ হাতটির অবস্থান অদৃশ্য। হাত ও আসনের এ ভঙ্গি মূর্তিতত্ত্বে একেবারেই অজানা। দ্বিতীয় মূর্তিটির মাপ ৮৬ সেমি. × ৪৭ সেমি.। পূর্বোক্ত অবলোকিতেশ্বরের সাথে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি যোগাসনে আসীন এবং তাঁর প্রধান দুটি হাত ধর্মচক্র মুদ্রায় বিন্যস্ত। উভয় নিদর্শনে অবলোকিতেশ্বরদের চারপাশ নানান দেবদেবী ও অনুচর ঘিরে রেখেছে। আর এসব ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে ধরে নেয়া যায়, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে সমতট ভূখণ্ডে এক স্বতন্ত্র মূর্তিতাত্ত্বিক ও ভাস্কর্যশৈলী-ভাবালোক গড়ে উঠেছিল।

রূপবানমুড়া বুদ্ধ

দানাদার বেলে পাথরে তৈরি ২.৪৪ মিটার উঁচু বৌদ্ধ মূর্তিটি ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। একটি নিরাভরণ পট্টঠেসের বিপরীতে এক তৃতীয়াংশ গোলমণ্ডনে বুদ্ধ বিধৃত হয়েছে। ডান হাত অভয় মুদ্রায় এবং বাম হাত বরদ মুদ্রায় সংঘাতির

একটি প্রান্ত ধরে আছে। গলার ওপর থেকে উষ্ণীষ পর্যন্ত গোড়ালির নিচের অংশ এবং হাতের পাতা ব্যতীত গোটা শরীর সংঘাতি দিয়ে ঢাকা। সংঘাতিটিকেও এমন স্বচ্ছভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে যে শরীরের প্রতিটি ভাঁজ চোখে পড়ে। অন্যান্য মহাপুরুষোচিত চিহ্নগুলো পরিপাটি করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উন্নসের পাশাপাশি অর্ধনির্মিলিত পটলচেরা চোখ, সুঢৌল কপোল ঢেউ তোলা ঠোঁট সম্বলিত ডিম্বাকার মুখ এবং পরস্পর ভারসাম্যময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ আদর্শ উচ্চতার মাংসল দেহ নিঃসন্দেহে সারনাথ নমুনা ধরনের স্মারক। তবে বুদ্ধের মাথার পেছনে শিরাশ চক্রটিতে একটা ডিম্বাকার পরিনেখ প্রক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এর থেকে ধরে নেয়া যায় যে, কিছু সারনাথ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে স্থানীয় আবহ যুক্ত হয়ে সপ্তম শতক থেকে সমতটকেন্দ্রিক ভাস্কর্য ভাবলোকের জন্ম হয়েছিল।

মিশ্র ধাতুর তৈরি নিদর্শন

এ শ্রেণীর মূর্তিগুলোকে সাধারণত ব্রোঞ্জের মূর্তি বলা হয়। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এ ধাতুকে অকট অ্যালয় বা আটটি ধাতুর মিশ্রণ অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু ব্রোঞ্জ বা অকট অ্যালয় হতে হলে মিশ্রণের মধ্যে যে ধাতু যে অনুপাতে থাকার কথা তা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। আর এজন্য একে মিশ্র ধাতু বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দেউলবাড়ি সর্বাণী দেবী মূর্তি। চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দেউলবাড়ি গ্রামে পাওয়া মূর্তিটির উৎসর্গকারিণী রাণী প্রভাবতী। আশ্রাফপুর লিপি (সপ্তম শতক) এবং সমসাময়িক কালের পরিব্রাজক ইৎ সিঙ-এর বিবরণ মতে রাণী প্রভাবতী ছিলেন সপ্তম শতকের সমতট রাজ্যের রাজা দেবখড়গের স্ত্রী। এ মূর্তিটির সময়কাল নিঃসন্দেহে সপ্তম শতক এবং ঐ সময়ের মূর্তিতত্ত্বসহ ভাস্কর্য নমুনা প্রকৃতির একমাত্র অকাট্য প্রমাণ। নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর 'আইকনগ্রাফি অব বুড্ডিস্ট এন্ড ব্রাহ্মণক্যাল স্কাল্পচারস ইন দি ঢাকা মিউজিয়াম' শিরোনামের গ্রন্থে শারদাতিলক সূত্রের বরাত দিয়ে এ মূর্তিকে সর্বাণী নামে অভিহিত করেছেন। দেবীর একটি মাথা ও আটটি হাত। উপুড় হয়ে থাকা সিংহবাহনের ওপর রাখা একটি পদ্মের ওপর সমপদ স্থানক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাতগুলোতে শঙ্খ, তীর, তলোয়ার ও চক্র এবং বাম হাতগুলোতে ঘন্টা, ত্রিশূল, ধনুক ও ঢাল ধরা। তাঁর পায়ের দুপাশে দুজন চামড়ধারিণী, দেহে ত্রিভঙ্গভঙ্গি বজায় রেখে দাঁড়ানো। প্রত্যেকের দেহের ডৌলে গোলমণ্ডনসহ একটা সুঠাম ভাব বজায় রয়েছে। বুটিদার অলঙ্করণ, গহনা স্বল্পতা, আলম্ব শিরাশচক্র এবং সোনার লেপন এ মূর্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেউলবাড়ি যোগাসন সূর্য

মূর্তিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন। এক মুখ ও দুহাত বিশিষ্ট সূর্য তার সাত ঘোড়া টানা রথের ওপর যোগাসন বজায় রেখেছে। তার পাশে দণ্ডী এবং পিঙ্গল আসীন। তবে একেবারে শেষ প্রান্তে ঊষা ও প্রত্যুষ তীর ছুড়ে মারার ভঙ্গিতে রয়েছে। আবার দেহের গড়নে একটা ভারী ডৌল এবং কৌণিক

প্রক্ষেপণগুলোর ক্ষেত্রে একটা অপরিপক্ক রৈখিক বাঁকের সমন্বয় বিদ্যমান। এ মূর্তির সময়কাল আনুমানিক সপ্তম থেকে অষ্টম শতক।

সিতাতপত্র

এটি কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত। এর পরিমাপ ৫১ সেমি × ২৫.৫ সেমি। প্রতীমাটি আট হাত বিশিষ্ট সিতাতপত্র দুস্তর পাপড়ি বিশিষ্ট একটি বিশাল পদ্মের ওপর ললিতাসনে বসা। দুটি হাতই পদ্মের ভার বহন করেছে। দেবীর গোটা দেহের পেছনে বিরাটাকার একটি শিরাসচক্র রয়েছে। এর পপন্তবন্ধনী যথেষ্ট কারুকাজময়। দেবীর ঝুটিদার মাথার বরাবর শিরাসচক্রের শীর্ষে একটি ছত্র রয়েছে। দেহের থরে থরে সৌন্দর্যের খেলা। সপ্তম শতকের নিদর্শন হিসেবে তাকে বিবেচনা করা যায়।

চন্দ্র নিদর্শনাদি

এ ধারার উৎসস্থল সমতট। বিকাশ বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ এবং সারা বঙ্গদেশে। ভোগোলিক এবং নৃতাত্ত্বিকভাবে সমতট বিচ্ছিন্ন এলাকা। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে আদি অস্ট্রেলীয় প্রভাবপুষ্ট। ভৌগোলিক দিক থেকে একান্তই নদীমাতৃক। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দিক থেকে প্রথম রাজার পরিচয় পাওয়া যায় বৈন্যগুপ্ত। একমাত্র জানা তারিখ ৫০৭, ৫০৮ খ্রিস্টাব্দ। ধর্ম বিশ্বাসে শৈব হলেও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এরপর খড়গ বংশ (৬০০-৭২৫ খ্রিস্টাব্দ), দেব বংশ (৭৪০-৮০০ খ্রিস্টাব্দ)। এরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের উদ্ভব কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই থেকেই। খড়গ ও দেব রাজত্বকালে ময়নামতি, লালমাই ও ঝিউড়িকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র ধরনের ভাস্কর্য রীতি প্রচলিত হয়। চন্দ্রদের শাসনামলে তাদের ভূখণ্ডে সে ধারারই অনুবর্তন অব্যহত ছিল। লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণসহ অন্তত দুটি নিদর্শন দিয়ে একথা প্রমাণ করা যায়। দুটি নিদর্শনের একটি ঢাকার পাইকপাড়া থেকে পাওয়া একটি বিষ্ণু মূর্তি এবং দ্বিতীয়টি ফরিদপুরের কুলকুরি থেকে পাওয়া একটি সূর্য মূর্তি। উভয় নিদর্শনই বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। লিপিভাষ্য মতে দুটি মূর্তিই চন্দ্র বংশীয় রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের শাসনামলের (১০০০-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ)।[১০]

অন্যান্য মূর্তি

কুমিল্লার শালবন বিহারের প্রথম নির্মাণ যুগে বেশ কিছু নিদর্শনসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত নানা নিদর্শনে মহাযানীভাবাপন্ন মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে (৮০০-১০৪৮ খ্রিস্টাব্দ) এ ধরনের মূর্তিগুলো নির্মাণ করা হয়। এঁরা মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের পরধর্ম সহিষ্ণুতার কথা ইতিহাসে জানা যায়। চন্দ্রবংশের সময় অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি মূর্তি তৈরির জন্য কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। মাটির ব্যবহারও লক্ষ্য করা গেছে। আনন্দ বিহার

থেকে মাটির তৈরি অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ মূর্তির মধ্যে সপ্তম-অষ্টম শতকের নমুনা বৈশিষ্ট্য বিধৃত। এর থেকে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে যে, সমতট অঞ্চলে পাথর বা ধাতুর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মাটি ও কাঠ নির্ভর মূর্তি তৈরির বিকল্প ধারা সৃষ্টি হয়েছিল।

মন্দুক গণেশ মূর্তি

মূর্তিটি ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত। এর লিপি থেকে জানা যায় দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যাভিষেকের প্রথম বছর (আনুমানিক ৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) এটি উৎসর্গ করা হয়। কালো পাথরে নির্মিত মূর্তিটি আংশিক ভাঙা হলেও মূর্তিতত্ত্ব এবং ভাস্কর্যশৈলী বোঝা কঠিন নয়। বরুড়া থানার মন্দুক গ্রামে পাওয়া নিদর্শনটিতে দেখা যায় গণেশ একটি বিশাল পদ্মের ওপর মহারাজালীলাসন ঠাস বজায় রেখে উপবিষ্ট। মূর্তিটি চার হাত বিশিষ্ট হলেও হাতগুলো ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তবে ডানের ওপরের হাতে কুঠার এবং বাঁয়ের ওপরের হাতে লাড্ডুভরা পাত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। নিচের দিকে রাখা দুটি হাতে কী ছিল জানা যায় না। শুড়টি কিছুদূর সোজা নিচে নেমে বাম পাশে ওপরের দিকে ওঠানো। ভুঁড়িতে ফণা তোলা সাপ। পদ্মের নিচে বামপাশে দেবতার বাহন ইঁদুর এবং ডানে অঞ্জলি মুদ্রায় এক সারি পূজারী। মাথার দুপাশের ওপরের অংশে উড়ন্ত দু'বিদ্যাধর। ভাস্কর্য নমুনা প্রকৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ নিরাভরণ পট্টিঠেগের জাঁকালো কারুকাজ করা প্রান্ত বন্ধনী। একেবারে বাইরের অংশে লতা ও ফুলের বন্ধনী এবং এর ভেতরের দিকে পরস্পর সমান্তরাল চার সারি বুটিখচিত একটি ফিতাকার স্বতন্ত্র অংশের সমন্বয়ে এক প্রান্তবন্ধনী রূপায়িত। পদ্মটি দু'স্তর পাঁপড়ি বিশিষ্ট। এ ধরনের পদ্মকে মহাপদ্ম বলা হয়। প্রতিটি পাঁপড়িতে রয়েছে একজোড়া হৃদয়াকার রত্ন। পরণে ধূতি, গহনা হিসেবে রয়েছে ঝালরের অনুরূপ টিকলী, করন্তমুকুট, কুন্তল, হারসন হরিণমালা, চুড়ি, মল এবং অঙ্গদ। কাঁধের নিচ পর্যন্ত দু'প্রস্ত বেণী ঝুলে আছে। পাদমঞ্চটি বেলুনাকারে উত্তল এবং এর মাঝখানে লিপিফলক উৎকীর্ণ।

বাঘাউড়া বিষ্ণু

বাঘাউড়া গ্রামে পাওয়া কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তির ডান দিকের নিচের হাতে পদ্ম. ওপরের হাতে গঙ্গা এবং বাম দিকের ওপরের হাতে চক্র ও নিচের হাতে শঙ্খ ধরে সমপদস্থানক ভঙ্গি বজায় রেখেছে। তাঁর পায়ের দু'পাশে দ্বিভঙ্গ ভঙ্গিতে লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতী দণ্ডায়মান। লক্ষ্মীর হাতে নতমাথা চামর এবং স্বরস্বতীর হাতে আড়াআড়ি বীণা। বিষ্ণুর মাথার দু'পাশে দুজন বিদ্যাধর। পাদমঞ্চের নিচে নমস্কার মুদ্রায় সারিবদ্ধ পূজারী। সঙ্গে গরুড় প্রতিকৃতি। মাঝখানে লিপিভাষ্য। নকশা করা। পাদমঞ্চটি রথ বিশিষ্ট। লিপিভাষ্য মতে এটি প্রথম মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের বছরে (৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ) উৎসর্গ করা হয়েছে।

মূর্তিতত্ত্ব : মূর্ত-বিমূর্ত

মূর্তিতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর সাজসজ্জা, অলংকার, আয়ুধ, আসন, ভঙ্গি (ঠাম-ঠাড়), মুদ্রা প্রভৃতিতে নানা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সমকালীন জীবনযাত্রা এবং ধর্মদর্শনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যাত হয়েছে রূপক-প্রতীক এবং চিত্রকল্পে। সে দিকগুলোর কথা বিবেচনা করে মূর্তিগুলোর বহিরঙ্গ প্রতিভাত প্রায় সকল বিষয়ের প্রতি আলোক সম্পাত করতে এগুলোর রেখা চিত্রের পরিচিতি এ পর্যায়ে তুরে ধরা হল।

সাজ-সজ্জা

অঙ্গদ : অঙ্গদ অঙ্গে অর্থাৎ হাত ও বাহুতে ব্যবহৃত অলংকারবিশেষ। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে ব্যবহৃত অঙ্গদের কয়েকটি নমুনা (রেখাচিত্র) তুলে ধরা হলো।

কোমরবন্ধ : রাজ-রাজরা এবং অমাত্যরা অর্থাৎ উচ্চকোটি ব্যক্তিরা কোমরবন্ধের ব্যবহার করে আসছে।

নেকলেস বা হারের ক্রমবিবর্তন : প্রাচীন কালের সাজসজ্জায় নর-নারীরা যেসব হার বা নেকলেস ব্যবহার করত দেব দেবীর মূর্তিতেও তার আকৃতি বা ধরন ব্যবহৃত হয়েছে।

শিরাবরক : বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন কালে রাজা-মহারাজা এবং তাঁদের আমাত্যরা যেসব শির আবরণ বা শির আবরক ব্যবহার করেছেন তা ব্যবহার করা হয়েছে দেব-দেবীর মূর্তিতেও। শির আবরণের আর একটি নাম উষ্ণীষ।

শিরাশচক্র : মূর্তির মাথায় ব্যবহৃত বলয় বা জ্যোতির্বলয়। বিভিন্ন সময়ে এগুলোরও বিবর্তন ঘটেছে।

গুপ্ত, আদিগুপ্ত ও পাল আমলের সাজ-সজ্জা

গুপ্ত এবং পাল আমলে রাজা-বাদশা এবং উচ্চকোটি মানুষ যা সাজসজ্জায় ব্যবহার করেছেন মূর্তিতেও সে সাজসজ্জা ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন আয়ুধ

যুদ্ধ বা সমরে প্রাচীন কালে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হতো মূর্তির মধ্যেও তা ব্যবহৃত হয়েছে। তার উদাহরণ : বৈষ্ণব আয়ুধ, শৈব আয়ুধ, ভৈরব আয়ুধ এবং অন্যান্য আয়ুধ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ আয়ুধগুলো ধর্মীয় কৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত।

জৈন শ্রীবস্ত প্রতীক

জৈন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রীবস্ত প্রতীক প্রাচীন বাংলায় সমতটে জৈনদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন ধরনের আসন

আসীন শব্দ থেকে আসন। প্রাচীন কালে নানা রকম আসন প্রচলিত ছিল। পদ্মাসন বা পরঞ্চাসন বা বজ্রপরঙ্কাসন। এই আমলে দুটি বা তাড়াতাড়ি রেখে একটি পদতলকে বিপরীত দিকের কোমরের সামনে কঠোরভাবে সংবদ্ধ রাখা হয়। পদতল দৃষ্টিগোচর অপেক্ষায় আছে। এতে পদ্ম উৎকীর্ণ হয়। এছাড়া রয়েছে বীরাসন, ধ্যানাসন বা যোগাসন, ললিতাসন, মহারাজালীলাসন, সত্ব পরাকাসন, সুখাসন, উতকিতিকাসন প্রভৃতি ।

পঞ্চ তথাগত

বিভিন্ন ধরনের আসনে বসা অবস্থায় হস্ত সংস্থাপনের অবস্থা মূলত এটি। এর মধ্যে রয়েছে উত্তরাবোধি (ধর্মচক্র) মুদ্রায় বইরচন, ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় অক্ষোভ্য, বড়দা মুদ্রায় রত্নেশ্বর, রত্ন সম্ভব, সমাহিত মুদ্রায় অভিতাভ এবং অভয় মুদ্রায় অমোঘসিদ্ধি। পঞ্চ তথাগতদের রূপ কল্পনায় সিদ্ধার্থ গৌতমের বোধিসত্ব অর্জনের বিভিন্ন পর্যায় বিধৃত হয়েছে।

ক. ভূমি স্পর্শ : মার নামের দুষ্ট বুদ্ধি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বুদ্ধ হাতের আঙুল হেলিয়ে পৃথিবীকে আহ্বান করেন।

খ. ধর্ম চক্রের মাধ্যমে প্রথম ধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক ঘটনা বিধৃত।

গ. ধ্যান : বুদ্ধের ছয় (৬) বছর ব্যাপী অনশনসহ সাধনার ঘটনা এতে বিধৃত।

ঘ. অভয় হচ্ছে শিষ্য দেবদত্তের ছেড়ে দেয়া পাগলা হাতি বশীকরণের আত্ম প্রত্যয়।

ঙ. বড়দ : বুদ্ধত্ব লাভের পর জালিবনে দস্যু অঙ্গুনিমালের আক্রমণ প্রতিহত করার দৃশ্য।

চ. সমাহিত : এতে নৈরঞ্জনা নদী তীরে ৬ বছরের কঠোর তপস্যার স্মৃতি।

বিবিধ মুদ্রা

মুদ্রা হলো বাহু, হাতের পাতা ও আঙ্গুলের বিন্যাস। প্রতিটি মুদ্রাই এক একটি ভাবের প্রকাশ। এর মধ্যে আছে নিশ্চয়তা, ক্ষমা, তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা, যুক্তিখণ্ডন, প্রার্থনা পূরণ, অন্তর্মুখী প্রজ্ঞা, অতীন্দ্রিয়তা, আজ্ঞা, ইপ্সিতের অনুজ্ঞা প্রভৃতি। মুদ্রার প্রকৃতিতে রয়েছে অভয়, জ্ঞান, বিতর্ক, কন্টক, ধর্মচক্র, বড়দ, ভূমিস্পর্শ, অঞ্জলি,

অর্ধচন্দ্র, ধ্যান ও যোগ, সিংহ অর্ণব, করিহস্ত, চিণ, করতরি, তর্জনী, সূচি, ত্রিপাটক, লম্ব হস্ত, নমস্কার, সর্বকর, গজ বা দণ্ড প্রভৃতি।

বিবিধ ঠাম বা ভঙ্গি

ভারতীয় নাট্য শাস্ত্রে ১০৮টি ঠাম বা ঠারের উল্লেখ আছে। শারীরিক ঠামে রয়েছে স্থানক বা দাঁড়ানো, নৃত্যরত, বসা, আসীন বা উপবিষ্ট, শায়ীত। স্থানকের মধ্যে কায় উৎসর্গ বা সম্পদস্থানক, আভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, একিস্বো এবং সমভঙ্গ।*

১. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১০৬-১০৭।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

* রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য।

রেখাচিত্র সূচি



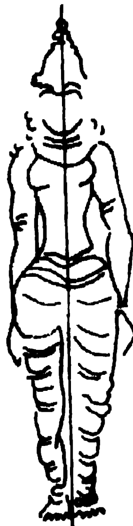
অতিভঙ্গ



ত্রিভঙ্গ



আভঙ্গ

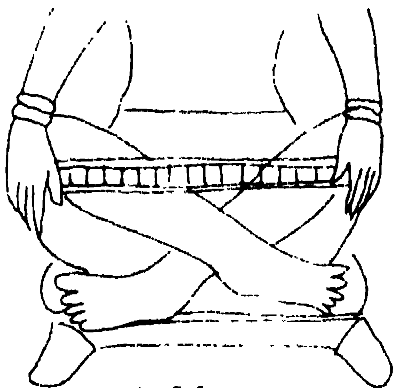


আভঙ্গ

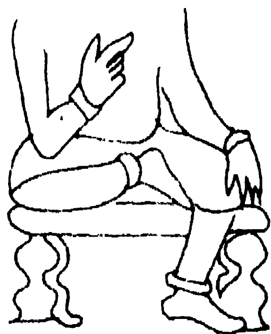


দ্বীভঙ্গ

১. স্থানক মূর্তি দেহের বিবিধ ঠাম



উতকিতিকাসন



বীবাসন



নটরাজ



পদ্মাসন

২. বিভিন্ন ধরনের আসন


অভয়


হরিণ


কর্ণ


বিস্ময়


বরদ


করতরী



তর্জনী


বজ্রহুংকাব



কটক হস্ত


কট্যাবলম্বিত


ক্ষেপণ


বুদ্ধ শ্রমণ


ভুত ডামব


তর্পণ

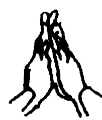

বিতর্ক


উত্তরবোধি

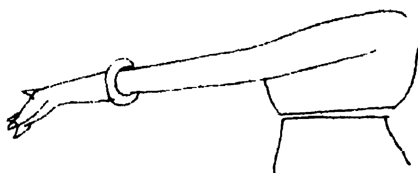

ভূমিস্পর্শ


অঞ্জলি


সূচী


নমস্কাব

৩. বিবিধ মুদ্রা


করিহস্ত


চিণ

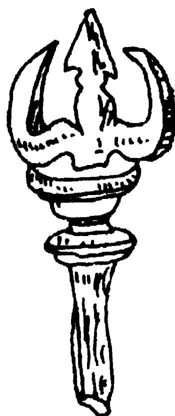
৪. বিবিধ মুদ্রা



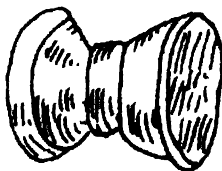
দর্পণ



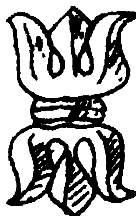
কমন্ডলু



ত্রিশূল



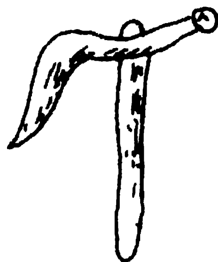
ডমরু



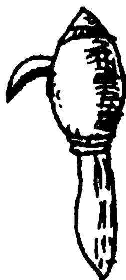
বজ্র



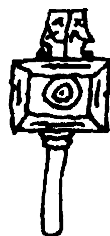
পাস



হাল

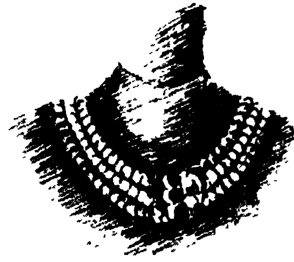
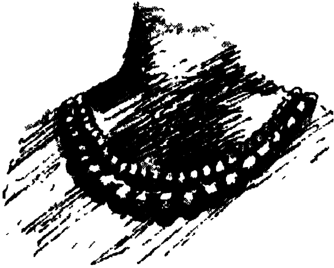
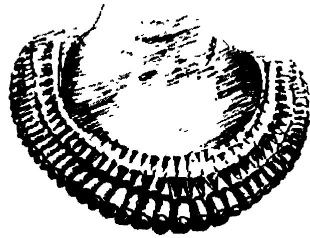
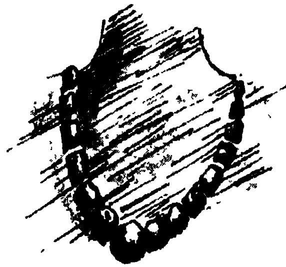


অঙ্কুশ

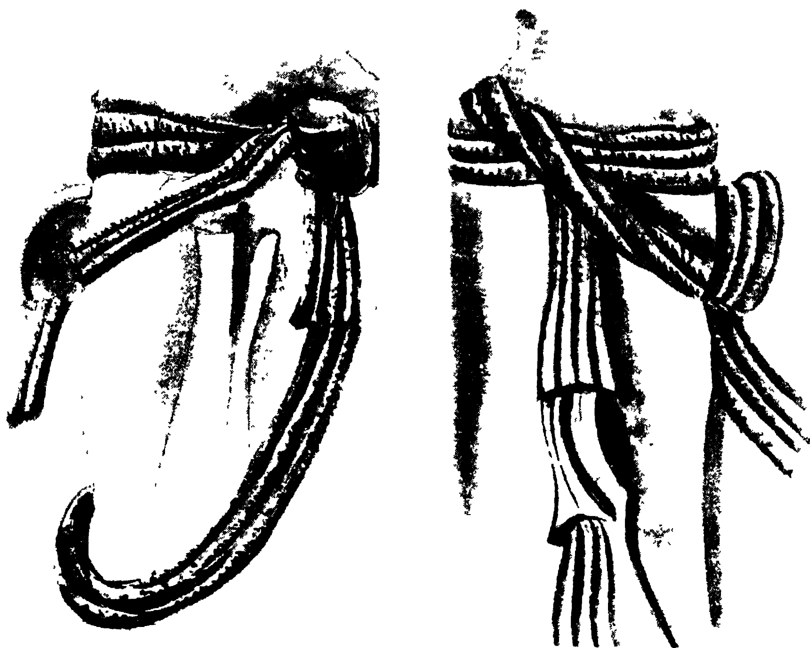


শ্রুক

৫. বিবিধ আয়ুধ

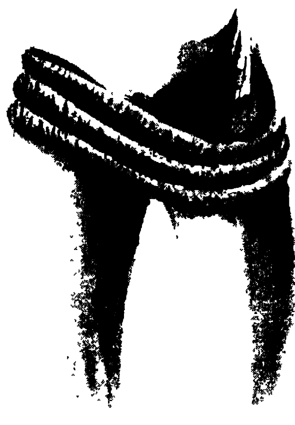
৬. নেকলেস : গুপ্ত পর্ব



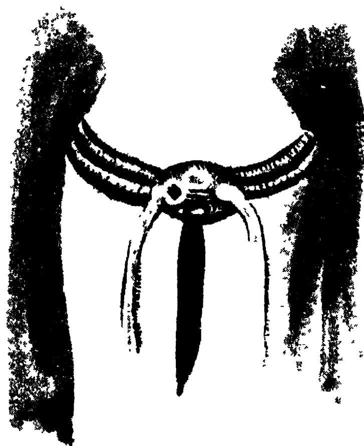
৭. কোমরবন্ধ : কুষাণ পর্ব (সামনের দিক) কোমরবন্ধ : কুষাণ পর্ব (পেছনের দিক)



৮. কোমরবন্ধ : ক্রম-বিবর্তনের ধারা
(খ্রিস্টিয় দুই-তিন শতক)



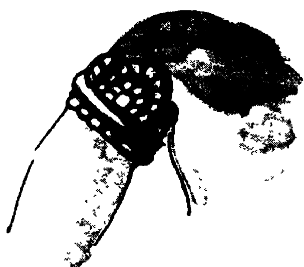
৯. কোমরবন্ধ (গুপ্ত পর্ব)

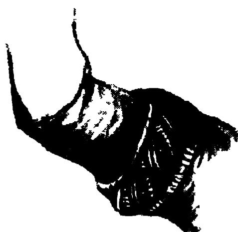


১০. কোমরবন্ধ (গুপ্ত পর্ব)



১১. কোমরবন্ধ (খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতক)






১২. অঙ্গদ : ক্রম-বিবর্তনের ধারা (খ্রিস্টিয় দুই-তিন শতক)

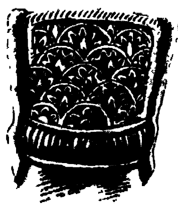





১৩. কুষাণ পর্ব



ক্রম-বিবর্তনের ধারা (খ্রিস্টীয় এক-নয় শতক)







কুষাণ পর্ব



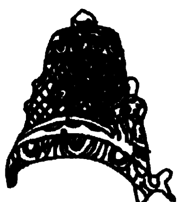
কুষাণ পর্ব



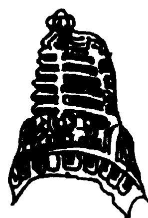
গুপ্ত পর্ব



জটামুকুট (খ্রি. নয়-বার শতক)



কিরিটমুকুট (খ্রি. নয়-বার শতক)

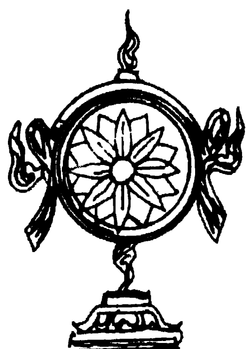
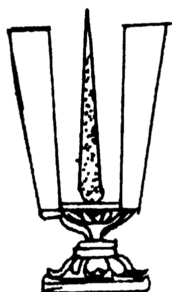


করণ্ডমুকুট (খ্রি. নয়-[illegible]

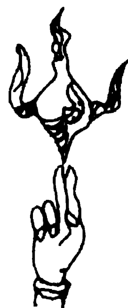
১৪. শিরাবরক : বিবর্তনের ধারা

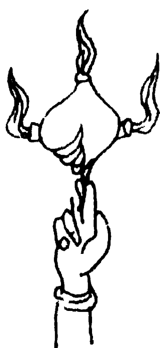


১৫. পাল পর্বের বিবিধ সাজ-সজ্জা



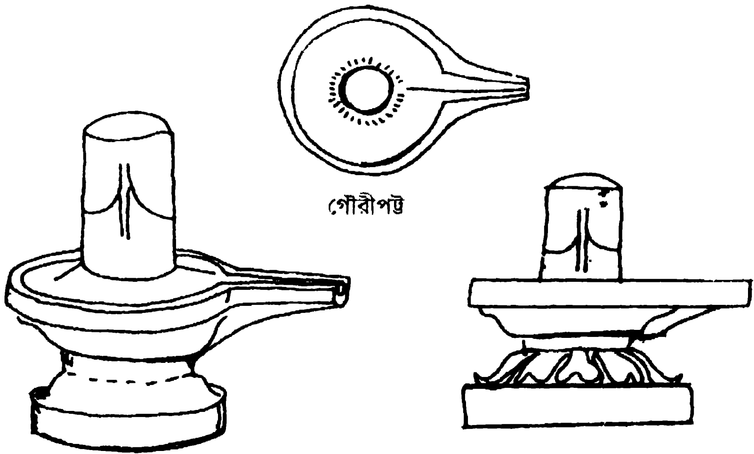




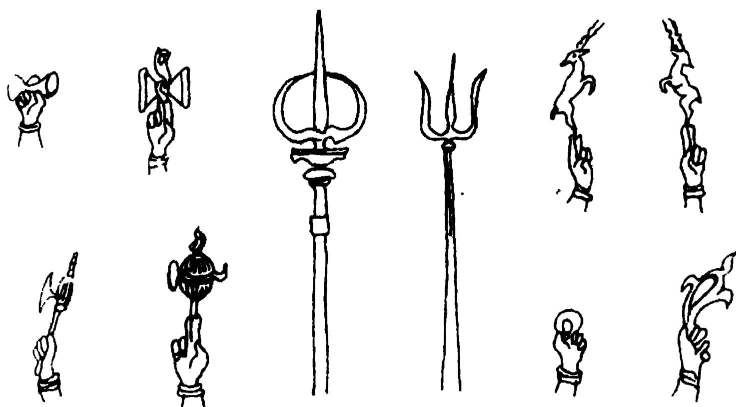

১৬. বৈষ্ণব আয়ুধ



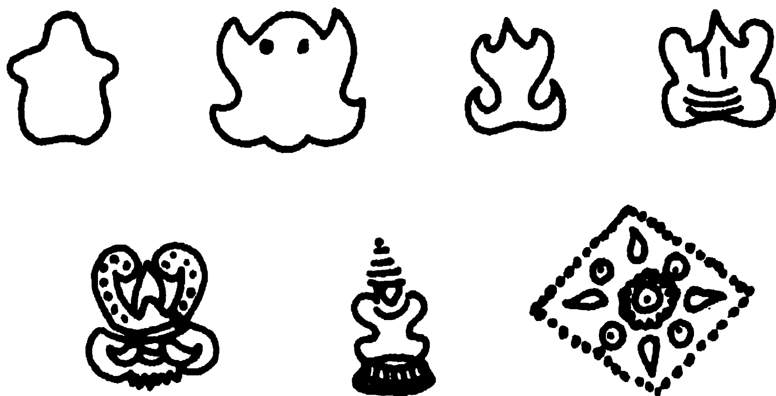
১৭. ভৈরব



১৮. শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্ট



১৯. শৈব আয়ুধ



২০. জৈন শ্রীবত্স প্রতীক



১. উত্তবাবোধি (ধর্মচক্র) মুদ্রায় বইরচন



২. ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অক্ষোভ্য



৩. ববদ মুদ্রায় রত্নেশ্ব-রত্নসম্ভব



৪. সমাহিত মুদ্রায় অমিতাভ



অভয় মুদ্রায় অমোঘসিদ্ধি

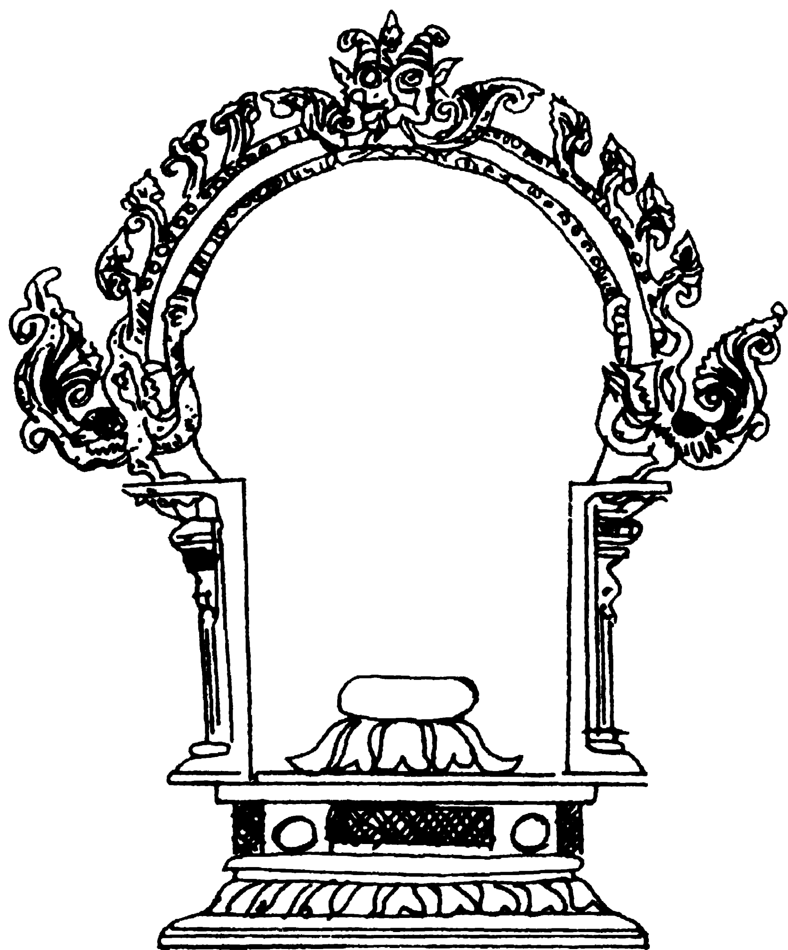
২১. পঞ্চতথাগত



২২. উষ্ণিষ : বাংলাদেশে ক্রম-বিবর্তনের ধারা



২৩. শিরাচক্র : বাংলাদেশে ক্রম-বিবর্তনের ধারা



২৪. ধাতব মূর্তির স্ট্রাট

প্রাচীন ভূমি বিন্যাস ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

প্রাচীন কালের ভূমি বিন্যাস এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা কেমন ছিল তা জানার আগ্রহ একালের অনেকেরই আছে। ভূমিদান ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কিছু তাম্রশাসন থেকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে। কিছু উপাদান বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, পালী এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কালে কৌম সমাজে ভূমি ব্যবস্থার যে পরিচয় রয়েছে তাতে দেখা যায় অরণ্যচারী শিকারি মানুষদের নির্দিষ্ট কোনও ভূমির বা বসবাসের স্থানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। পাখিদের মতোই এরা এস্থানে ওস্থানে ঘুরে বেড়াত। কোথাও বোধ হয় তাদের স্থায়ী বসবাস ছিল না। তখন ভূমির পরিমাণও বেশি ছিল। সে তুলনায় মানুষ ছিল অত্যন্ত কম। জমি নিয়ে মারামারি, হানাহানি তখন বোধ হয় ছিল না। কৃষি সভ্যতার সুচনা যুগে ভূমির প্রয়োজনীয়তা বেশি পরিমাণে দেখা দেয়। তাম্রশাসনগুলো পাবার আগে পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধারণগুলো অনুমানমাত্র। তাই আমরা সেদিকে যাবো না।

বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টলিতে দেখা যায়, মহারাজ বৈন্যগুপ্তের ভূমির জন্য আবেদন করেছেন মহারাজ রুদ্রদত্ত। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের তিনি পদদাস বা সামন্ত। রুদ্রদত্ত মূল্য দিয়ে ভূমি ক্রয় করেছেন না বিনামূল্যে লাভ করেছেন তাম্রশাসনে এ সম্পর্কে কিন্তু বলা হয়নি। দামোদরপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নগর সৃষ্টি রিভুপাল স্থানীয় অধিষ্ঠানাধিকরণের একজন সভ্য। গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে ভূমি ক্রেতা হচ্ছেন বৎসপাল। তিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয়ভুক্তির কর্মকর্তা। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসনে মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ প্রদশর্মা রাজার থেকে ভূমি লাভ করেছিলেন। তবে মূল্য দিয়ে ক্রয় করেছিলেন কী না তা উল্লেখ নেই। আমরা অধিষ্ঠানের অধিষ্ঠানাধিকরা, বিষয়ের বিষয়পতি, ভুক্তিপতি বা উপরিকের কথা পূর্বেই বলেছি। আরও বলেছি পুস্তপালের কথা। জমি ক্রয় বিক্রয়ে তার ভূমিকার কথা। ভূমির প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণ তাদের পক্ষে ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রতিনিধির মাধ্যমে ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি করাতেন। ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্য আবেদন কর্তা প্রথম পুরুষই বলছেন। ভূমির প্রকৃতি ক্ষেত্র, খিল নাকি বাসভূমি তাও উল্লেখ করতেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রীত ভূমি দেবকার্য বা ধর্মের নামে দান করার জন্যে পুস্তপালের প্রস্তাব বিষয়পতির মাধ্যমে রাজা মহা রাজাদের কাছে যেতো। দামোদরপুর শাসনলিপিতে দেখা যায় বিষয়পতির সঙ্গে পুস্তপালের বিরোধ হয়েছে। তবে বিষয়পতির আপত্তি মহারাজ শোনেননি। তিনি

পুস্তপালের প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন। মহারাজের অনুমতি নিয়ে গ্রাম প্রধানগণ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজপুরুষদের সামনে জমির সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এরপর ভূমিদানের বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং কাকে কী উদ্দেশ্যে ভূমিদান করা হয়েছে বিবৃতিতে তাও জাননো হয়েছে। সবশেষ পর্বে প্রদত্ত ভূমির রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রদানের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় রাজ সরকার সিলমোহর দ্বারা এসব তাম্রশাসন যেন রেজিস্ট্রি করেছেন। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রমও আছে। ব্যতিক্রমটা বেশি ধরা পড়েছে আমাদের সমতটে ভূমি ব্যবস্থাপনায়। বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন (ষষ্ঠ শতকের)। লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন (সপ্তম শতক) ও দেবখড়গের আশ্রাফপুরের দুটি তাম্রশাসনে (অষ্টম শতক) এ নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়নি। বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং ভূমিদান করেছেন মহাযানী সম্প্রদায়ের ভিক্ষু সংঘকে। প্রদশর্মা রাজকর্মচারী হিসেবে ভূমি প্রার্থনা করে রাজার কাছ থেকে দানস্বরূপ ভূমি গ্রহণ করেছেন। দেবখড়গ নিজেই ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী এবং একটি বৌদ্ধ সংঘকে ভূমিদান করেছেন। ভূমি কেন দেয়া হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নিজের ও পিতা-মাতার পুণ্য লাভের জন্যই ভূমিদান করা হয়েছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে।[১]

জমির শ্রেণী বিন্যাস বা প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেছে। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর লিপিতে দেখা যায় একখণ্ড খিল ভূমি উল্লিখিত হচ্ছে 'হজ্জিক খিলভূমি (Natar layged)' বলে। যার অথ জলাভূমি। বৈগ্রাম লিপিতে দেখা যায় বাস্তুভূমির পরিচয় আছে। হালিমপুর লিপিতে তলপাটকের কথা আছে। তলপাটক তলবাটক থেকে এসেছে। বাট হচ্ছে রাস্তা। এছাড়া পরিচয় পাওয়া যায় জোনা, জুটিকা, খাট, খাটী, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, যানিকা স্রোতিকা, গাঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল, বিল প্রভৃতি প্রত্যেকটি শব্দই বাংলা লিপিতে পাওয়া যায়। বন ও অরণ্যের কথা লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টলিতে দেখা যাচ্ছে। সুব্বঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প, মহিষ, ব্যাঘ্র, বড়াই অধ্যুষিত আটবী ভূখণ্ডে ২১১ জন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।

ভূমির মাপ এবং মূল্য সম্পর্কেও প্রাচীন কালের তাম্রলিপিগুলোতে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলোতে দেখা যায় সর্বোচ্চ ভূমিমাপ হচ্ছে কুল্য, কুল্য বাপ, দ্রোণ বা দ্রোণবাপ। সর্বনিম্ন মাপ আড়বাপ। সমগ্র অর্থে কুমিল্লা অঞ্চলে কুল্য কথাটির সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। ষষ্ঠ ও অষ্টম শতকে কুমিল্লায় পাওয়া দুটি তাম্রলিপিতে ভূমিমাপের নতুন মানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টলী এবং দেবখড়গের এক নং আশ্রাফপুর পট্টলিতে পাটক নামে একটি মানের উল্লেখ আছে। পাটকের পরেই আছে দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এদুটি লিপিতে প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে

পাওয়া যায়। আশ্রাফপুর লিপিতে দেখা যায় ৫০ দ্রোণে ১ পাটক। গুণাইঘর পট্টলিতে দেখা যায় মহারাজা রুদ্র দত্ত ৫টি পৃথক ভূখণ্ডে সর্বশুদ্ধ ১১ পাটক ভূমিদান করেছেন।

প্রথম ভূখণ্ড ৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
দ্বিতীয় ভূখণ্ড	২৮ দ্রোণবাপ
তৃতীয় ভূখণ্ড	২৩ দ্রোণবাপ
চতুর্থ ভূখণ্ড	৩০ দ্রোণবাপ
পঞ্চম ভূখণ্ড	১.৭৫ দ্রোণবাপ
৮.৭৫ পাটক	৯০ দ্রোণবাপ

তাহলে ৯০ দ্রোণে হচ্ছে ২.২৫ পাটক, অর্থাৎ ৪০ দ্রোণে এক পাটক, একথা সহজেই বলা চলে। পূর্বেই আমরা বলেছি ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহলে ৫ কুল্যবাপে এক পাটক।

রাজা লড়হচন্দ্রের দু'টি তাম্রশাসনে এবং গোবিন্দচন্দ্রের ১টি তাম্রশাসনে নিম্নলিখিত ভূমি পরিমাপ লক্ষ করা যায়।

প্রথমে তাম্রশাসনে প্রাপ্ত পরিমাপ এরকম :

		পাটক	দ্রোণ	কাক	ষষ্ঠি	বিন্দু
১.	ভুক্তি মণ্ডল বিষয় গ্রাম					
২.	পুণ্ড্রবর্ধন সমতট পেরনাটন ফুল্লহড়	×	৫.৭৫	×	×	×
৩.	পুণ্ড্রবর্ধন সমতট পেরনাটন দোল্লবাইক	৮	৪.৭৫	×	৫	২
৪.	পুণ্ড্রবর্ধন সমতট পেরনাটন গুপ্তিনাথন	৩	৯	১	×	×
	মোট	১১	১৯.৫০	১	৫	২

দ্বিতীয় তাম্রশাসন

১.	পুণ্ড্রবর্ধন সমতট পেরনাটন সুরবক	৮	৩৭.৫০	×	×	×

তৃতীয় তাম্রশাসন

১.	পুণ্ড্রবর্ধন সমতট পেরনাটন সাহরতলা	২	×	×	×	×

গুণাইঘর ও ময়নামতি তাম্রশাসনগুলোর মাধ্যমে দান করা সব ভূমিই কুমিল্লা জেলার। এগুলোতে পাটক দ্রোণের সঙ্গে কাক, ষষ্ঠি ও বিন্দু নামক তিনটি নতুন মাপের সন্ধান পাওয়া যায়।

আশ্রাফপুর লিপিতে পাটক কথাটি গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পাটক মর্কটাসী পাটক, বৎসনাগ পাটক, দরপাটক প্রভৃতি গ্রামাংশের নাম। সমতট

অঞ্চলে পরিমাপের জন্য নলের ব্যবহারের কথা জানা যায়। বিজয় সেন নিজেও ভূমিদান করেছেন 'সমতটনলেন' অর্থাৎ সমতট মণ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের পরিমাপে। সমতটীয় নল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়েও প্রচলিত ছিল। সমতটীয় নল বৃষভ শংকর নল নামেই পরিচিত ছিল। লক্ষণসেনের ভাওয়াল লিপিতে আছে ২২ হাতে ছিল ১ নল।

ভূমির মাপ সম্পর্কে লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের (একাদশ শতক) তিনটি ময়নামতি তাম্রশাসনে যে তথ্য দেয়া আছে তাতে ভূমির পরিমাণ দেয়া হয়েছে পর পর ক্রমহ্রস্বায়মান ৫ মাপে পাটক, দ্রোণ, ষষ্টি, কাক এবং বিন্দু। ৪০ দ্রোণে ১ পাটক। পূর্ব বাংলায় ৪ কাকে এক উয়ান। ৫০ উয়ানে ১ আড়ি। ৪ আড়িতে ১ দ্রোণ। ৪ কড়ায় ১ গণ্ডা। বিশ গণ্ডায় এক কানি। যষ্ঠি অর্থ লাঠি। লাঠি মানে নল। সমতটের নলের মাপ সমতট অঞ্চলের বাইরেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিম ভাগলিপিতে দেখা যায় বর্তমান মৌলবীবাজার জেলায় দশম শতকে ১০ দ্রোণে ১ পাটক ভূমি গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে (৫০৭ খিস্টাব্দ) গুনাইঘর তাম্রলিপিতে দেখা যায় কুমিল্লা অঞ্চলে ৪০ দ্রোণবাপে ১ পাটক। এ প্রসঙ্গে ড. রায় বলেন, তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর ত্রিপুরার (কুমিল্লার) ৪ পাটক জমি দশম শতাব্দীর শ্রীহট্টের (মৌলবী বাজার) ১ পাটক জমির ৪ গুণ। এর থেকে মনে হয় ৪ শতাব্দীর ভেতর দ্রোণের ভূমি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল বা বিভিন্ন স্থানে ভূমি পরিমাপ বিভিন্ন ছিল।

সমতট অঞ্চলে ভূমির মূল্য সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া যায় সেন আমলে। কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে দেখা যায় তালপড়া পাটকের গ্রামের মূল্য ছিল ২০০ মুদ্রা (কপর্দকপূরাণ)। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে ৩৩৬.৫ নুম্মান ভূমি দানের কথা উল্লেখ আছে। এর বার্ষিক আয় বা মূল্য ছিল ৫০০ পুরাণ। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি ২০০ বছর উত্তর বঙ্গে ভূমির দাম ছিল প্রীতি কুল্যবাপে ২ থেকে ৩ দিনার। আর পূর্ব বাংলায় ৪ দিনার। ভূমির সীমা নির্ধারণের জন্য বর্তমান প্রচলিত নিয়মেরই অনুসরণ দেখতে পাওয়া যায়। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টলিতে ৫টি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম ভূমিখণ্ডটি ৭ পাটক ৯ দ্রোণ। এর পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামের সীমা এবং বিষ্ণু বর্ধকীর ক্ষেত্র, দক্ষিণে মৃদু বিলালের ক্ষেত্র এবং রাজবিহার ক্ষেত্র। পশ্চিমে সুরীনসীর পূর্ণেকের ক্ষেত্র, উত্তরে দোষীভোগ পুষ্করিণী এবং বম্পীয়ক ও আদিত্য বন্ধু ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় খণ্ডটি ২৮ দ্রোণবাপ। এর পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা, দক্ষিণে পক্কবিললের ক্ষেত্র, পশ্চিমে রাজবিহার ক্ষেত্র, উত্তরে বৈদ্যর ক্ষেত্র। তৃতীয় খন্ডটি ২৩ দ্রোণ। এর পূর্বদিকে বুদ্ধকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে

কলকের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাগিজোদকের ক্ষেত্র। চতুর্থ খণ্ডটি ৩০ দ্রোণ। এর পূর্বদিকে বুদ্ধকের ক্ষেত্রসীমা, দক্ষিণে কলকের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে সূর্যের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম খণ্ডটি ৭/৪ পাটক। এর পূর্ব দিকে খন্দবিদুগ্গরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে যজ্ঞরাতের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাদডদক গ্রামের সীমা। যে মহাযানিক অবৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘবিহারে এই ভূমিদান করা হয়েছিল সেই বিহার সংলগ্ন কিছু নিম্নভূমি ছিল তার সীমাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে চূড়ামণি ও নগরশ্রী নোযোগের (নৌকা বাঁধবার জায়গা), মাঝখানে জোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিলের পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত নৌঘাট (নৌকা রাখাল খাল), পশ্চিমে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের মাঠ, উত্তরে প্রডামার নৌযোগখাট। বিহারের কিছু হজ্জিক খিল (হাজা অনুর্বর) ভূমিও ছিল। তার সীমা পূর্বে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচার্য জিতসেনের বিহার ক্ষেত্র সীমা, পশ্চিমে হচাত খাল, উত্তরে দত্তপুষ্করিণী। (উদ্ধৃত বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব, ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ১৯৬) এই চতুসীমা নির্ধারণ থেকে কয়েকটি গ্রামের নাম, কয়েকজন মানুষের নাম, কতগুলো ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের নৌঘাট পুষ্করিণীর নাম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। নামগুলোর কোনও কোনোটি একালেও পরিচিত। কোনও কোনও নাম আবার হারিয়ে গেছে।

ভূমির স্বত্বাধিকারী কে রাজা না প্রজা এই নিয়ে অতীতকালেও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। প্রাচীন লিপিগুলো থেকে দেখা যায় ভূমির মালিক ছিলেন রাজা। তিনিই ভূমিদান করেছেন। তাই মনে হয় ভূমির মূল মালিক ছিলেন তিনি। বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর পট্টলিতে রাজাই জমিদান করেছেন। ক্রয়ের পরে ভূমির মালিকানা (ভোগসত্ত্ব), দানের পরে ভূমির মালিকানা (ধর্মীয় কাজে ব্যবহার) প্রভৃতিতে ভূমির মূল মালিকানা কখনই প্রজা বা কোনও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে যায়নি। দেবখড়্গের আশ্রাফপুর পট্টলিতে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির ভোগকৃত সম্পত্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকারের সম্পত্তি দান করে দিয়েছেন। ড. রায় এ সম্পত্তির একটি হিসেবও দিয়েছেন। হিসেবটি নিম্নরূপ :

১. ১ পাটক	ভোগ করছিলেন রাজমহিষী শ্রী প্রভাবতী।
২. ১.৫ (?) পাটক	ভোগ করেছিলেন শুভংসুকা নামে এক মহিলা।
৩. ১.১৫ পাটক	মিত্রাবলি নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি, কিন্তু ভোগ করছিলেন সামন্ত বর্ণটিয়োক নামক এক ব্যক্তি।
৪. ১ পাটক	ভোগ করছিলেন শ্রীনেত্রভট।
৫. ১ পাটক	ভোগ করছিলেন শর্বান্তর নামক এক ব্যক্তি, কিন্তু চাষ করছিলেন মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কর্ষকেরা (শ্রীশর্বান্তরেণ ভুজ্যমানক মহত্তরশিখরাদিভি : কৃষ্যমান-[কঃ]!

৬. ১ পাটক ভোগ করছিলেন বন্দ্য জ্ঞানমতি।

৭. ১ পাটক দ্রোণমথিকা নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি।

৮. ১.৫ পাটক ভোগ করছিলেন শক্রক নামক ব্যক্তি। (এর এক পাটক ভূমির সবটুকু রাজা গ্রহণ করেননি। যে অর্ধপাটকে দুটি সুপারিবাগান ছিল সেটুকু শুধু নিয়ে দান করেছিলেন।)

৯. ২০ দ্রোণবাণ
অর্থাৎ ১.৫ পাটক আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক ব্যক্তির, অধুনা ভোগ করছিলেন স্বস্তিয়োক নামীয় জনৈক গৃহস্থ (অর্ধপাটক উপাসকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিয়োকেন ভুজ্যমানক)।

১০. ২৭ দ্রোণবাপ ভোগ করছিলেন সুলব্ধ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা।

১১. ১৩ দ্রোণবান চাষ করছিলেন রাজদাস এবং দুগ্‌গট নামক দু ব্যক্তি।

১২. ১ পাটক [এক সময়ে] বৃহৎপরমেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি দান করেছিলেন, কিন্তু কাকে এবং কী উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন তার উল্লেখ নেই।

১৩. ১ পাটক [এক সময়ে] শ্রীউদীর্ণখড়্গ দান করেছিলেন এবং অধুনা ভোগ করছিলেন শক্রক নামক জনৈক ব্যক্তি। এ শক্র এবং পূর্বোক্ত ৮ নম্বরের শক্রক যে একই ব্যক্তি এই অনুমান সহজেই করা যেতে পারে।

ওপরে বর্ণিত বিবরণ থেকে দেখা যায় রাজা যে কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তার ইচ্ছে এবং প্রয়োজনমতো কেড়ে নিতে পারতেন। ৬ পাটক ১০ দ্রোণ জমি তিনি ব্যক্তিগত অধিকার থেকে কেড়ে নিয়ে সংঘমিত্রের বিহারে দান করেছিলেন। এর জন্য ক্ষতিপূরণের কোনও উল্লেখ নেই। রাজা ভূমির মূল মালিক বলেই এটি করতে পেরেছেন। মহিলারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হতেন। ভূমির মধ্যসত্ত্বাধিকারীর পরিচয় ছিল। নিম্ন প্রজার উল্লেখ থেকে মনে হয় মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষক এক পাটকের ওপর ভূমির অধিকার ভোগ করতে পারত না। এরা ভাগচাষি কিংবা করের বিনিময়ে চাষাবাদ করত কি না তার অবশ্য উল্লেখ নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধা ছিল না। খিলভূমির কর দিতে হতো না বলে গুনাইঘর লিপি থেকে জানা যায় ("শূন্যপ্রতিকরহজ্জিক-খিলভূমি")।

চন্দ্রবংশের রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ পট্টলীতে দেখা যায় পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্টমণ্ডলে গরলা, পোগার এবং চন্দ্রপুর বিষয়ে দু'প্রস্থে দুটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন। প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক ও দ্বিতীয় প্রস্থে ২৮০ পাটক। এগুলো ছাড়াও একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দেয়া হয়েছিল ৪ বেদের বিভিন্ন শাখার ছাত্র এবং অধ্যাপকদের। এছাড়া এ ভূমিখণ্ড থেকে প্রবর পরিচয়ের ৬০০ ব্রাহ্মণকে (সমপরিমাপে) জমি প্রদান করা হয়েছিল। ৩ প্রস্থ জমির সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। উত্তরে কুশিয়ার (কুশিয়ারা) নদী, দক্ষিণে মণি (মনু) নদী, পূর্বে

বৃহৎকুট্টবাদ এবং পশ্চিমে জুর্জ্জু কাষ্ঠপর্ণী খাল। এ স্থানটির নাম দিয়েছিলেন শ্রীচন্দ্রপুর এবং তা দ্বারা তিনি ব্রহ্মপূরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রথম প্রস্থে ১২০ পাটক ভূমি দেয়া হয়েছিল দেবতা ব্রহ্মা এবং তাঁর পূজাগৃহ একটি মঠের জন্য। ড. রায় মনে করেন ব্রহ্মার মঠ এবং তাঁর একক পূজার প্রচলন পূর্ব ভারতের পূর্বতম প্রান্তে তাও দশম শতকে কৌতূহল উদ্দীপক বটে। এর মধ্যে ১০ পাটক দেয়া হয়েছিল জনৈক ব্রাহ্মণ অধ্যাপককে। উদ্দেশ্য তিনি চন্দ্রগোমীনের চান্দ্র ব্যাকরণ পড়াবেন। ১০ পাটক দেয়া হয়েছিল ১০ জন শিক্ষার্থীর ভরণপোষণ ও লেখগুটিকা বা খড়িমাটির পেন্সিলের জন্য। ৫ পাটক দেয়া হয়েছিল প্রতিদিনে ৫ জন অতিথি সেবার জন্য। ১ পাটক দেয়া হয়েছিল সে ব্রাহ্মণকে' যিনি এ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। ১ পাটক মঠ সংলগ্ন গণকের জন্যে। ২.৫ পাটক মঠের কায়স্থ বা হিসাব রক্ষকের জন্য। ৪ জন ফুলওয়ালা বা ফুলমালী, ২ জন তৈলক, ২ জন কুম্ভকার, ৫ জন কাহলিক অর্থাৎ ঢাকবাদক, ২ জন শঙ্খবাদক, ২ জন বৃহৎ ঢাকবাদক, ৮ জন দ্রাগড়বাদক এবং ২২ জন কর্মকার (ভৃত্য) ও কর্মকার এদের প্রত্যেকে ০.৫ পাটক করে একুনে ২৩.৫ পাটক প্রদান করা হয়েছিল। ২ পাটক মঠনটের জন্য, ২ জন সূত্রধর, ২ জন স্থপতি আরও ২ জন কর্মকার প্রত্যেকের জন্য ২ পাটক হিসেবে ১২ পাটক প্রদান করা হয়। ৮ জন চেটিকার (দেবদাসীর) জন্য ৬ পাটক জমি প্রদান করা হয়। এছাড়া মঠের সংস্কার ও নতুন কর্মের জন্য ব্যয় নির্বাহ হিসেবে ৪৭ পাটক প্রদান করা হয়।

২য় প্রস্থের ১৮০ পাটক ভূমি দেয়া হয় ৮টি পৃথক পৃথক মঠের জন্য। এর মধ্যে ৪টি অবাঙাল ব্রাহ্মণ পূজারী ও ভক্তদের জন্য, ৪টি বাঙাল ব্রাহ্মণ পূজারী ও ভক্তের জন্য, মঠগুলোতে যোগেশ্বর শিব, অগ্নিদেবতা, জৈমনি ও মহাকাল শিবের মূর্তি স্থাপন করা হয়। এরকম মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজা শ্রীচন্দ্রের কী দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে তা বলা শক্ত। বিদেশী বা দেশান্তরীদের জন্য কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং কেনই বা এরা দেশান্তরী এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। ২ ভাগে ১৪০ পাটক করে ২ ধরনের মন্দিরে ভূমিদান করেছিলেন। প্রত্যেক মন্দিরের ভাগে পড়েছিল ৩৫ পাটক। এখানে আরও ক্ষুদ্রভাগ দেখা যায়। বেদ পড়াবার জন্য প্রত্যেক অধ্যাপক পাবেন ১০ পাটক। ৮টি মঠে ৪০ জন ছাত্র ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য পাবে ১ পাটক হিসেবে ৪০ পাটক। প্রত্যেক মঠের ১ জন ফুলমালী, ১ জন ক্ষৌরকার, ১ জন তৈলক, ১ জন রজক, ৮ জন ভৃত্য প্রত্যেকে ১/২ পাটক হিসেবে ৪৮ পাটক ভূমি পাবে। প্রত্যেকে মঠের ২ জন সেবিকা ১/২ পাটক করে ৮ পাটক পাবে। প্রত্যেক মন্দিরের ব্রাহ্মণ প্রতি ১ জন ১ পাটক হিসেবে ৪ পাটক পাবে। প্রত্যেক ৪ মন্দিরের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ১.১/২ পাটক হিসেবে ৩ পাটক পাবে। প্রত্যেক মন্দিরের ১ জন কায়স্থ, লেখক বা হিসাবরক্ষক ২.১/২ পাটক হিসেবে ৫ পাটক। প্রত্যেক গণক ১ পাটক হিসেবে ২

পাটক পাবে। ৪ মন্দিরের চিকিৎসক প্রত্যেকে ৩ পাটক হিসেবে ৬ পাটক পাবে।

৩য় প্রস্থ ভূমিদান করা হয়েছিল ৬ হাজার ব্রাহ্মণকে। প্রত্যেকে সমপরিমাণে দেয়া হয়েছিল। ৩৫ জন ব্রাহ্মণের নাম আছে। কয়েকজনের নামের শেষাংশ আছে। নাগ, নন্দী, পাল, ধর ইত্যাদি। এ তাম্রপট্টলী থেকে বোঝা যায় প্রাচীন বাংলার সমতট অঞ্চলের মহারাজা শ্রীচন্দ্র ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুবই উৎসাহী ছিলেন। তিনি ক্লেশ বা সংঘাত পরিহারের জন্য সেখানকার স্থানীয় ও বিদেশী লোকদের জন্য পৃথক পৃথক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া দশম শতাব্দীতে সিলেটে চন্দ্রগোমীনের চান্দ্র ব্যাকরণের প্রচলন ও চতুর্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একালের জন্যও এক বিরাট বিস্ময়। ড. রায় মনে করেন, সবচেয়ে যা অর্থবহ তা হচ্ছে ব্রহ্মাপুর শ্রীচন্দ্রপুরের মতো একটি সুবৃহৎ ধর্ম ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় পশ্চিমভাগ পট্টলীর পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, এ ধরনের সুবিস্তীর্ণ, সুবৃহৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আর কোনও লিপিমালায় পাওয়া যায় না।

ভূমি রাজস্ব বা করের বিষয়ে সকলের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। তাম্রশাসনগুলোতে 'রাজভাগ, ভোগকর হিরণ্য প্রত্যায়' স্বার্থ ত্যাগ করে ভূমিদানের কথা আছে। লড়হচন্দ্রের প্রথম তাম্রশাসনে দেখা যায় 'সমস্ত রাজভোগ কর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতং' ত্যাগ করে ভূমি দান করা হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে স্থানীয় অধিবাসী বা কৃষকগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ ও প্রতিপালন করে দান গ্রহণকারীকে যেন যথোচিত করাদি প্রদান করে (নিবাসী ভিঃক্ষেত্র করেশ্চাজ্ঞা শ্রবণ বিধেয়ৈ ভূয় যথোচিত প্রত্যায় কার্যেতি)। তাম্রশাসনগুলোয় কর হিসেবে 'ভাগ' কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমেই্ এটি সম্ভবত প্রধান কর ছিল। লড়হচন্দ্রদের আমলে ভাগ, ভোগ, হিরণ্য প্রভৃতি রাজকর ছিল বলে মনে করা হয়। 'কর' তো ছিলই। পণ্ডিতেরা মনে করেন ভাগ বলতে রাজা বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য শষ্যের অংশকে বোঝাত। পাহাড়পুর এবং বৈগ্রাম লিপি থেকে মনে করা হয় ভূমির উপসত্বের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী ছিলেন রাজা। ধর্মাদিত্যের প্রথম তাম্রশাসনে 'ষষ্ঠাধিকৃত' নামে একটি পদবীর উল্লেখ আছে। তার কাজ ছিল সম্ভবত এক ষষ্ঠাংশ কর আদায় করা। রাজার প্রাপ্য ষষ্ঠভাগের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও রয়েছে।

'ভোগ' শব্দটি খুবই পরিচিত। 'রাজভোগের' প্রবাদও আমাদের সকলেরই জানা। পণ্ডিতেরা মনে করেছেন রাজাকে বিভিন্ন অকেশনে প্রদেয় বস্তু সামগ্রিই হচ্ছে ভোগ। ফল, ফুল, সুপারি, অর্থাৎ উৎপন্ন সবকিছুই রাজার প্রাপ্য তা ভোগ্য ছিল।

কর বলতে বস্তুত মুদ্রাকর বুঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তিন রকম করের উল্লেখ রয়েছে– ১. রাজার প্রাপ্য শষ্যভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে

নিয়মিতভাবে দেয় মুদ্রাকর, ২. আপদ কালে দেয় মুদ্রাকর, এবং ৩. বণিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের ওপর প্রদেয় কর। হিরণ্য কর সম্ভবত শষ্যের পরিবর্তে দেয় নগদ মুদ্রাকর। বিভিন্ন তাম্রশাসনে আরও নানা রকম করের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সদশপচারা'– এটি সম্ভবত অপরাধের দণ্ড হিসেবে দিতে হত। চোর ডাকাতের উৎপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রজাসাধারণকে সচৌরোদ্ধরণা কর দিতে হতো। 'পরিহৃত সর্বপীড়া' একটি সর্বমুখী কর। রাজা মহিষী রাজপুত্র, কিংবা অমাত্যরা ভ্রমণ কিংবা শিকারে যাবেন, সেখানে তার ভরণপোষণ, হস্তি, ঘোড়া, নৌকা বা বজরা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এরকম কর দিতে হতো সেখানকার প্রজাদের। এ ছাড়া আছে যে কোনো অজুহাত। এসব করের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলবর্মার আসাম নওগাঁ এবং কামরূপরাজ রত্নপানের প্রথম তাম্রশাসনে। বর্ণিত করগুলো ছাড়াও প্রজাদের হাটকর, ঘাটকর, পিণ্ডকর এবং উপরিকর দিতে হতো। এতে বোঝা যায় প্রজাসাধারণকে করের বোঝা বইতে হতো হর হামেশাই। কর নিয়মিত আদায় না করলে যন্ত্রণাও ছিল। কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো।

গুপ্তযুগের নির্ভরযোগ্য প্রশাসনিক ইতিহাস রয়েছে। এ যুগে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক বিভাগ ছিল ভুক্তি। ভুক্তির অধীনে কয়েকটি বিষয়, বিষয়ের অধীনে কয়েকটি মণ্ডল, মণ্ডলের অধীনে কয়েকটি বীথি, বীথির অধীনে গ্রাম। প্রশাসনিক বিভাগ ছিল তখন মূলত ভূমিপ্রশাসনিক বিভাগ। রাজা রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ায় এ ভূমি বিভাজন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়।

ভুক্তির শাসনকর্তাকে বলা হতো উপরিক মহারাজ। বিষয়ের শাসনকর্তা বিষয়পতি এবং মণ্ডলের শাসনকর্তা মণ্ডলাধিপতি। বীথি প্রধানের নাম জানা যায় না। দশ গ্রামিক বলে একজন কর্মকর্তার কথা জানা যায়। গ্রামিক নামে আরেক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তিনি ব্রাহ্মণ মহত্তর, কুটুম্ব প্রভৃতির সাহায্যে প্রশাসন চালাতেন। সর্বনিম্নস্তর বা গ্রাম পর্যায়ে প্রশাসন ও রাজস্ব আদায় ছিল অন্যতম কাজ এতে সন্দেহ নেই।

গুপ্তোত্তর যুগে খড়গ, লোকনাথের বংশ, রাত বংশ, ভদ্রবংশ দেববংশ প্রমুক ছোটখাটো পরিবর্তন দেখা যায়। কোনও কোনও তাম্রশাসনে মণ্ডলের স্থান দেয়া হয়েছে বিষয়ের ওপর।

শ্রীচন্দ্রর ধুল্লা তাম্রশাসনে দেখা যায়, মণ্ডল ছিল বিষয়ের অংশ। চন্দ্ররাজদের সময় প্রশাসনিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। লড়হচন্দ্রের প্রথম ময়নামতি তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত ফুল্লহড়, দোল্লবাইক ও গুপ্তিনাথন নাম তিনটি গ্রামে রাজা কর্তৃক ভূমি দান করা হয়েছিল। এখানে বিষয় অনুপস্থিত। আবার তাঁর দিবৃতীয় তাম্রশাসনে দেখা যায় ভুক্তি ও মণ্ডলের অধীনস্থ পেরনাটন বিষয়ের অন্তর্গত সুরভার গ্রামে ভূমি দান করা হয়েছিল। গোবিন্দচন্দ্রের

ময়নামতি তাম্রশাসনেও দেখা যায় মণ্ডল ও বিষয়ের অধীন সাহরতলা গ্রামে তিনি ভূমি দান করেছিলেন ভুক্তি, মণ্ডল, খণ্ডল ও গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় তাম্রশাসনগুলোয়। বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। তাদের সময় খণ্ডলের প্রবর্তন হয়। সেনরাজাদের সময় ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাম্রশাসনগুলোয়, বিষয় বা মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে ভোগপতি নামে একজন কর্মকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি ভোগকর আদায় করতেন। দু'য়েক জায়গায় তাকে মহাভোগিক বলা হয়েছে। ষষ্ঠাধিকৃত নামে একজন কর্মকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ আদায় করা সম্ভবত তার কাজ ছিল। পুস্তপাল নামক আরেক জন রাজস্ব কর্মকর্তার পরিচয় রয়েছে তাম্রশাসনগুলোয়। ভূমিদান ও ক্রয়বিক্রয়ে তার বড় ভূমিকা ছিল। পাল এবং চন্দ্রযুগে পুস্তপালের পদ বিলুপ্ত হতে দেখা যায়। ভূমি দান, ক্রয়-বিক্রয়ে মহা সান্ধিবিগ্রহিক মহামহোত্তর, মহাক্ষপনিক প্রভৃতি কর্মকর্তারা এ দু'যুগে দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষেত্রপ নামে একটি পদের উল্লেখ আছে। জমি জমার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা পদবী থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে তার কাজটি আসলে কী ছিল তা পরিষ্কার নয়। প্রমাতৃ, চৌরদ্ধরণিক, দাশপরাধিক, মৌল্লিক ও তরিক প্রভৃতি কর্মকর্তারা রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে করা হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সূচি

১. আনন্দ বিহার ও শালবন বিহারে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র
২. শালবন বিহারে প্রাপ্ত সংকর ধাতুর মূর্তি
৩. আনন্দ বিহারে প্রাপ্ত সংকর ধাতুর অবলোকিতেশ্বর
৪. কাঠের জাম্ভালা, বসুধর
৫. ভোজ বিহারে প্রাপ্ত নরম পাথরের অমিতাভ
৬. শালবন বিহারে প্রাপ্ত মহারাজলীলায় উপবিষ্ট অষ্টধাতুর বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী
৭. পোড়ামাটির চিত্রফলক (সিংহ), ময়নামতি
৮. পোড়ামাটির চিত্রফলক (রাজহাঁস), ময়নামতি
৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে (ভগ্নাবশেষ) বোধিসত্ব বা রাজকুমারের (দেব বংশীয় রাজা) লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তি
১০. কোটিলামুড়া থেকে উদ্ধারকৃত দেব-দেবী পরিবেষ্টিত বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর
১১. শালবন বিহারে প্রাপ্ত বিশ্বপদ্মাসনে উপবিষ্ট অষ্ট ধাতুর বুদ্ধদেব
১২. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর ধ্যানাসনে বুদ্ধ। দুই পাশে দুই পার্শ্ব দেবতা, মধ্যে বোধিসত্ব মঞ্জুশ্রী।
১৩. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বোধিসত্ব লোকনাথ
১৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বৌদ্ধদেবী তারা
১৫. পাথরের তৈরি মারীচী মূর্তি। এটি এক সময় ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ১৯৮২ সালের পর থেকে এটি আর দেখা যায় না।
১৬. চারপত্র মুড়ায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি
১৭. লড়হচন্দ্রের তাম্রশাসন
১৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ধাতব ঘন্টা
১৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের স্তূপ প্রতিকৃতি
২০. নোয়াপাড়ার প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ
২১. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত অশ্মীভূত কাষ্ঠখণ্ড
২২. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত এক মুখ ও দুই দেহ বিশিষ্ট সিংহমূর্তি
২৩. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত মালা মুখে রাজহংস
২৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের হাঁড়ি-পাতিল
২৫. শালবন বিহারে প্রাপ্ত মাটির হাঁড়ি-পাতিল
২৬. খনন কার্যকালে আনন্দ বিহারের উন্মোচিত দৃশ্য

২৭. আব্বাসীয় খলিফা মুসতাসীম বিল্লার স্বর্ণমুদ্রা
২৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রা
২৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ধ্যানমুদ্রায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব
৩০. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষ্যোভ্য
৩১. স্থানীয় নরম পাথরে তৈরী বৌদ্ধ দেব-দেবী পরিবেষ্টিত অবলোকিতেশ্বর, কোটিলামুড়া
৩২. স্থানীয় নরম পাথরে তৈরী বৌদ্ধ মূর্তি, কোটিলামুড়া
৩৩. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক, ক. তরবারি হাতে যোদ্ধা, খ. উড়ন্ত বিদ্যাধরি, গ. কিন্নরী ঘ. মাকারামুখা, ঙ. আট পাঁপড়ি বিশিষ্ট পদ্ম চ. চ. রাজহংস
৩৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক ক. কির্তীমুখা খ. সিংহ গ. হরিণ ঘ. হরিণ ঙ. ভেড়া
৩৫. ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবী পরিবেষ্টিত চার হাতবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর
৩৬. শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরে পোড়া মাটির চিত্রফলকের সারি
৩৭. ময়নামতিতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্ত্রযুক্ত পোড়ামাটির সীল
৩৮. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বোধিসত্ত্ব লোকনাথ
৩৯. শালবন বিহারে প্রাপ্ত চারদিকে চারটি চালযুক্ত বৌদ্ধ প্রতিমাসহ একটি বৌদ্ধ নিবেদন স্তূপ
৪০. আনন্দবিহারে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত তারা মূর্তি
৪১. ময়নামতিতে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা
৪২. ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মূদ্রা, যার এক পাশে ছাপচিত্র এবং অন্যপাশে সমতল। এগুলো উয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া। সময় খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৪র্থ শতক
৪৩. রূপবান মুড়ার বৌদ্ধ মন্দির
৪৪. ভোজ রাজার বৌদ্ধ স্তূপ
৪৫. পোড়ামাটির ভাস্কর্য (মহিষ), ময়নামতি
৪৬. ইটাখোলা মুড়ার বৌদ্ধ স্তূপ
৪৭. ময়নামতিতে প্রাপ্ত গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা
৪৮. কোটিলামুড়ার ত্রিরত্ন বৌদ্ধ স্তূপ
৪৯. মন্দুক থেকে সংগৃহীত কালো পাথরের তৈরি গণেশ
৫০. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর তৈরি চারদিকে চারটি চালসহ নিবেদন স্তূপ
৫১. খনন কার্যের পর আনন্দ বিহারের উন্মোচিত দৃশ্য

৫২. রূপবান কন্যা মুড়ায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বৃহদাকার ঘন্টা
৫৩. স্থানীয় কালো পাথরের তৈরি অবলোকিতেশ্বর, ময়নামতি
৫৪. উন্মোচিত মাটির সঞ্চয়াধার, ময়নামতি
৫৫. রূপবান মুড়া মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য
৫৬. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পাত্র
৫৭. ইটাখোলা বিহারে পাওয়া ধাতব ফলকলিপি
৫৮. ভোজ রাজার বাড়িতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের তৈরি বজ্রসত্ব
৫৯. রূপবান মুড়ায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি
৬০. লালমাই পাহাড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মস্তক ফলক
৬১. আনন্দ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভিতে পোড়ামাটির ফলক
৬২. ময়নামতি ঢিবির স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ
৬৩. পোড়ামাটির ফলকে নীলপদ্ম, ময়নামতি
৬৪. ব্রোঞ্জ নির্মিত রেপ্লিকা, ময়নামতি
৬৫. পোড়ামাটির যুগল অশ্ব, ময়নামতি
৬৬. ময়নামতি প্রাসাদ
৬৭. চারপত্র মুড়া মন্দিরের আংশিক দৃশ্য
৬৮. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে আহাররত রাজহংস
৬৯. রাণীর বাঙলো ঢিবিতে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামো
৭০. ভোজ রাজার বাড়িতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক
৭১. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র
৭২. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র
৭৩. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র
৭৪. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক
৭৫. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র
৭৬. ময়নামতি প্রত্মতাত্ত্বিক জাদুঘর
৭৭. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক
৭৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ভগ্নমূর্তি

প্রত্নতাত্ত্বিক চিত্র



১. আনন্দ বিহার ও শালবন বিহারে প্রাপ্ত নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র



২. শালবন বিহারে প্রাপ্ত সংকর ধাতুর মূর্তি



৩. আনন্দ বিহারে প্রাপ্ত সংকর ধাতুর অবলোকিতেশ্বর



৪. কাঠের জাম্ভালা, বসুধর



৫. ভোজ বিহারে প্রাপ্ত নরম পাথরের অমিতাভ



৬. শালবন বিহারে প্রাপ্ত মহারাজলীলায় উপবিষ্ট অষ্টধাতুর বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী



৭. পোড়ামাটির চিত্রফলক (সিংহ), ময়নামতি



৮. পোড়ামাটির চিত্রফলক (রাজহাঁস), ময়   াত



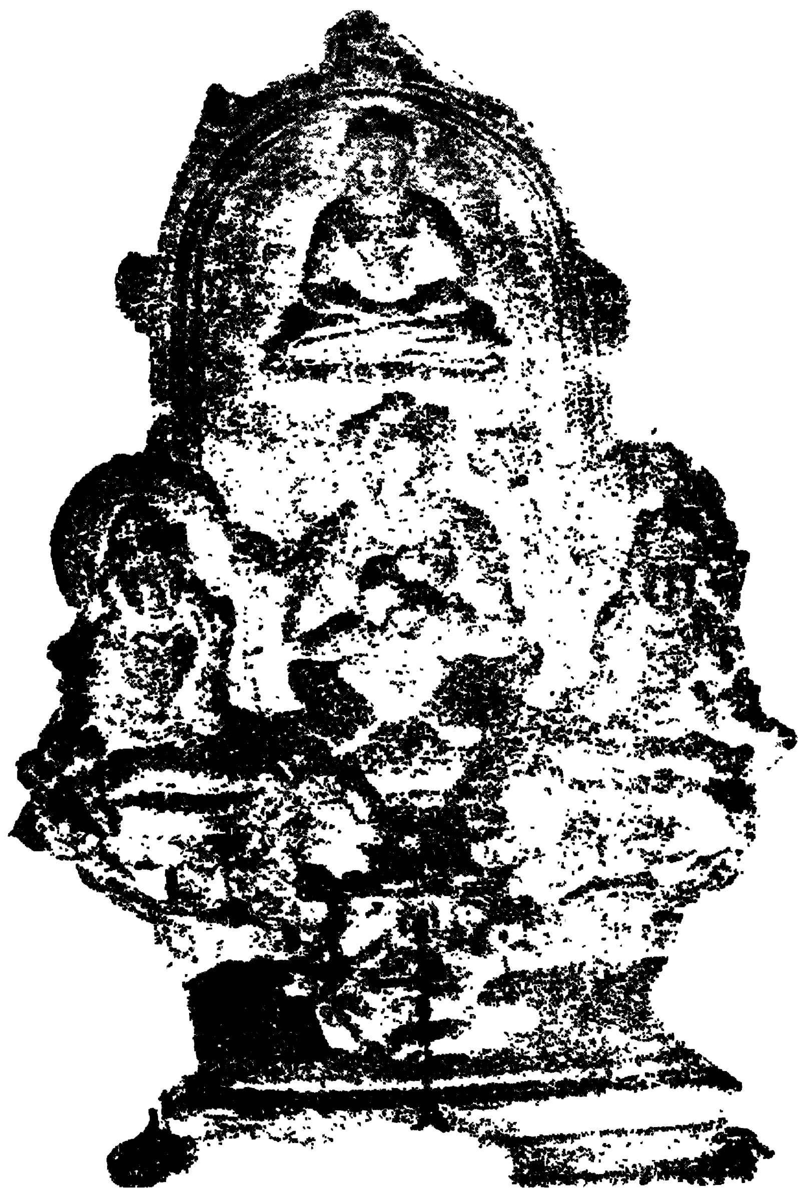
৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে (ভগ্নাবশেষ) বোধিসত্ত্ব বা রাজকুমারের (দেব বংশীয় রাজা) লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান মূর্তি



১০. কোটিলামুড়া থেকে উদ্ধারকৃত দেব-দেবী পরিবেষ্টিত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর



১১. শালবন বিহারে প্রাপ্ত বিশ্বপদ্মাসনে উপবিষ্ট অষ্ট ধাতুর



১২. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর ধ্যানাসনে বুদ্ধ
দুই পাশে দুই পার্শ্ব দেবতা, মধ্যে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী



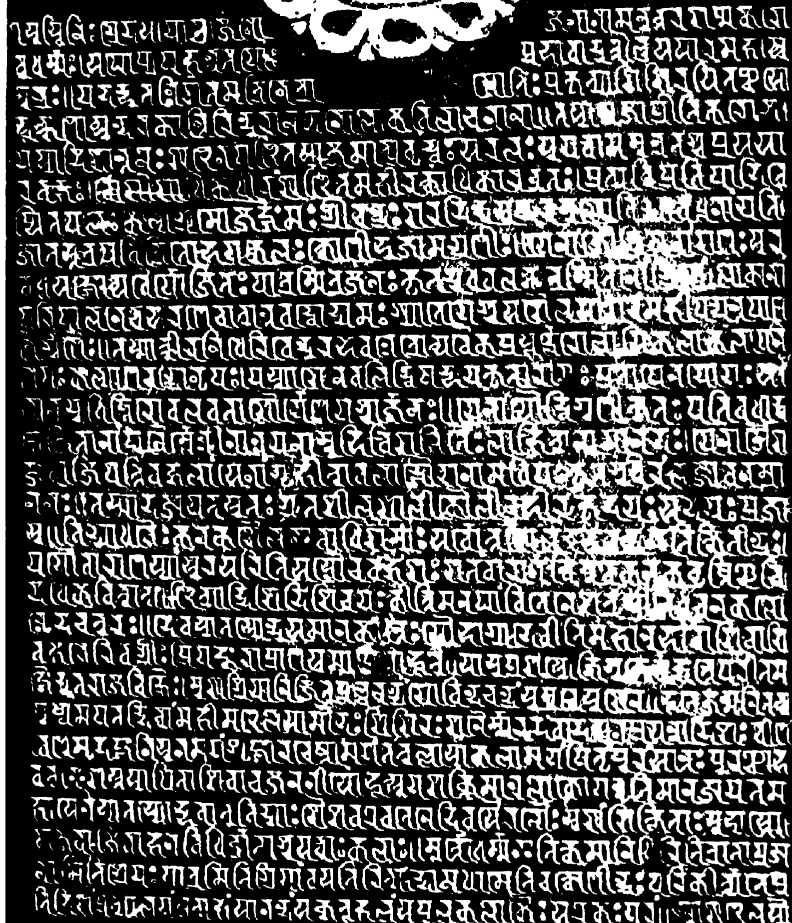
১৩. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বোধিসত্ত্ব লোকনাথ



১৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বৌদ্ধদেবী তারা



১৫ পাথরের তৈরি মারীচী মূর্তি। এটি এক সময় ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ছিল কিন্তু ১৯৮২ সালের পর থেকে এটি আর দেখা যায় না।



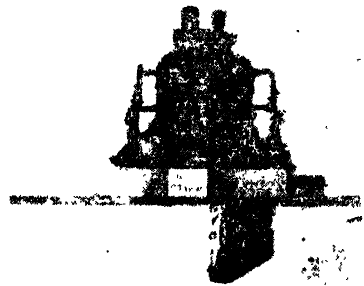
১৬. চারপত্র মুড়ায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি



১৭. লড়হচন্দ্রের তাম্রশাসন



১৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ধাতব ঘন্টা



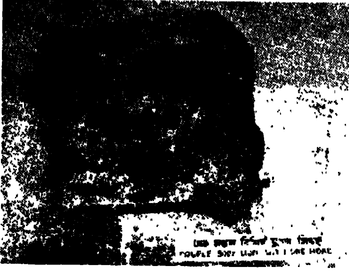
১৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের স্তূপ প্রতিকৃতি



২০. নোয়াপাড়ার প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ



২১. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত অশ্মীভূত কাষ্ঠখণ্ড



২২. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত এক মুখ ও দুই দেহ বিশিষ্ট সিংহমূর্তি



২৩. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত মালা মুখে রাজহংস



২৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের হাঁড়ি-পাতিল



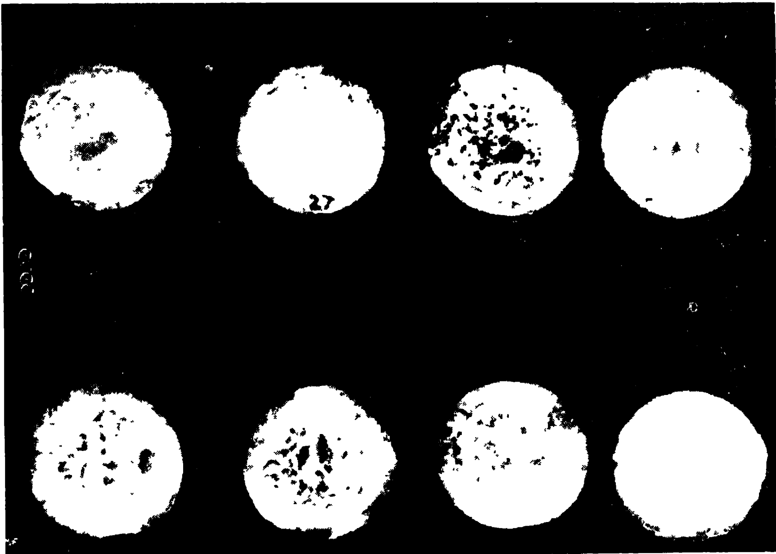
২৫. শালবন বিহারে প্রাপ্ত মাটির হাঁড়ি-পাতিল



২৬. খনন কার্যকালে আনন্দ বিহারের উন্মোচিত দৃশ্য



২৭. আব্বাসীয় খলিফা মুসতাসীম বিলার স্বর্ণমুদ্রা



২৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রা







২৯. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ধ্যানমুদ্রায় বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব







৩০. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য



৩১. স্থানীয় নরম পাথরে তৈরী বৌদ্ধ দেব-দেবী
পরিবেষ্টিত অবলোকিতেশ্বর, কোটিলামুড়া



৩২. স্থানীয় নরম পাথরে তৈরী বৌদ্ধ মূর্তি,
কোটিলামুড়া



তরবারি হাতে যোদ্ধা



উড়ন্ত বিদ্যাধরি



কিন্নরী



মাকারামুখা



আট পাঁপড়ি বিশিষ্ট পদ্ম



রাজহংস

৩৩. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক



কির্তীমুখা



সিংহ



হরিণ



হরিণ



ভেড়া

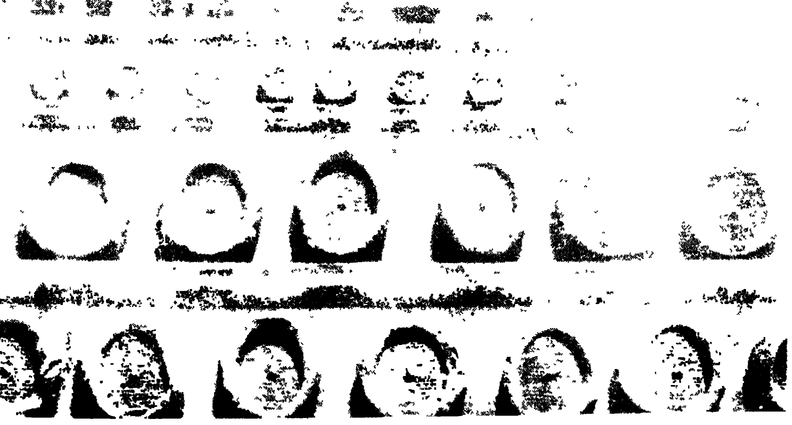
৩৪. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক



৩৫. ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও
অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবী পরিবেষ্টিত চার হাতবিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর



৩৬. শালবন বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরে পোড়া মাটির চিত্রফলকের সারি



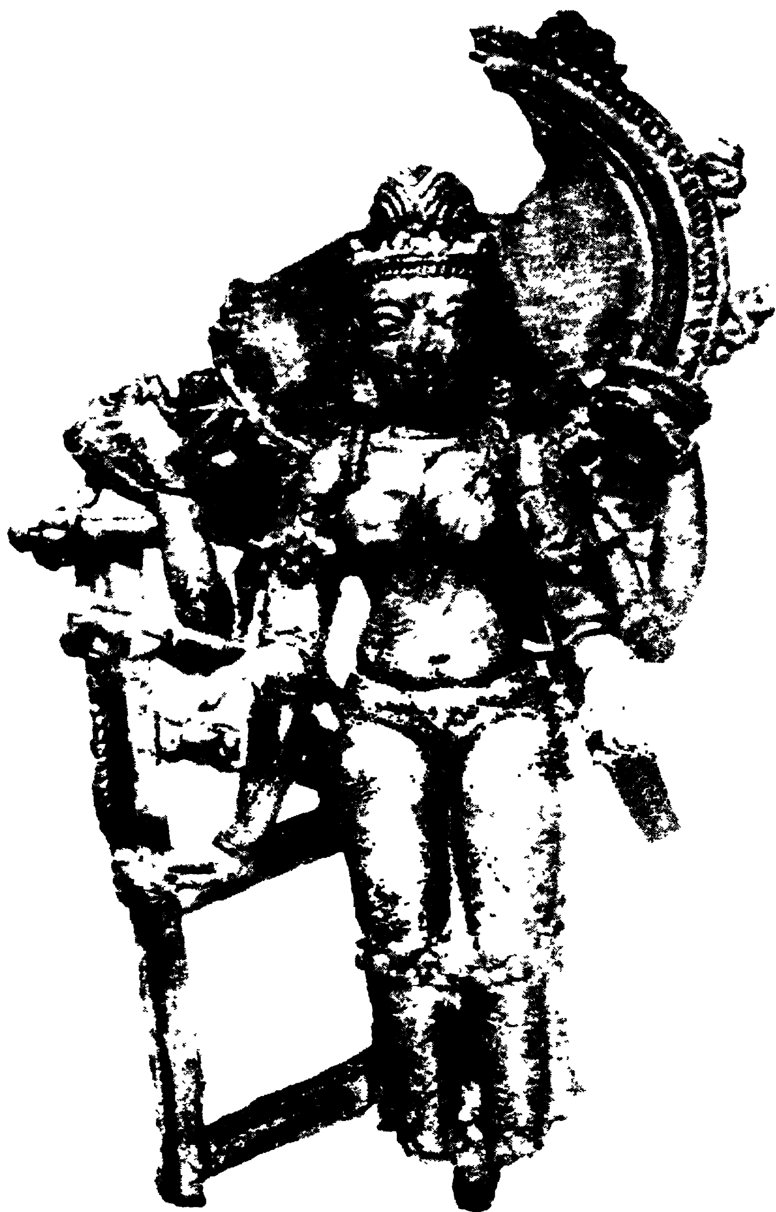
৩৭. ময়নামতিতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্ত্রযুক্ত পোড়ামাটির সীল



৩৮. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বোধিসত্ত্ব লোকনাথ



৩৯. শালবন বিহারে প্রাপ্ত চারদিকে চারটি চালযুক্ত বৌদ্ধ প্রতিমাসহ একটি বৌদ্ধ নিবেদন স্তূপ



৪০. আনন্দবিহারে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ নির্মিত তারা মূর্তি



৪১. ময়নামতিতে প্রাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা



৪২. ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা, যার এক পাশে ছাপচিত্র এবং অন্যপাশে সমতল। এগুলো উয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া। সময় খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৪র্থ শতক

৪৩. রূপবান মুড়ার বৌদ্ধ মন্দির



৪৪. ভোজ রাজার বৌদ্ধ স্তূপ



৪৫. পোড়ামাটির ভাস্কর্য (মহিষ), ময়নামতি



৪৬. ইটাখোলা মুড়ার বৌদ্ধ স্তূপ

৪৭. ময়নামতিতে প্রাপ্ত গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা

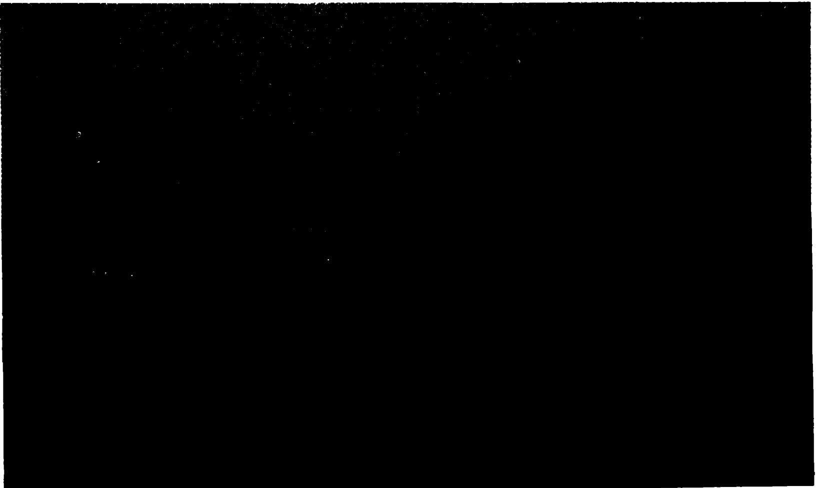


৪৮. কোটিলামুড়ার ত্রিরত্ন বৌদ্ধ স্তূপ

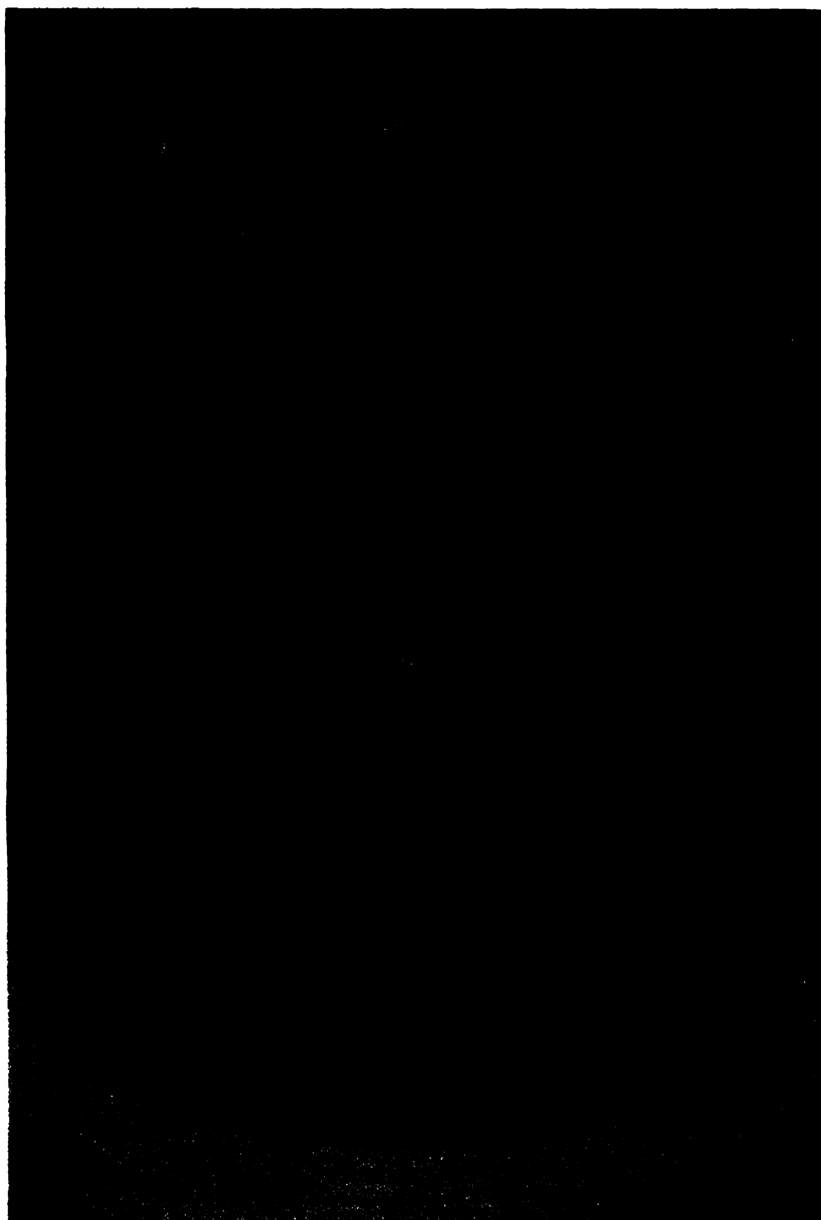


৪৯. মন্দুক থেকে সংগৃহীত কালো পাথরের তৈরি গণেশ

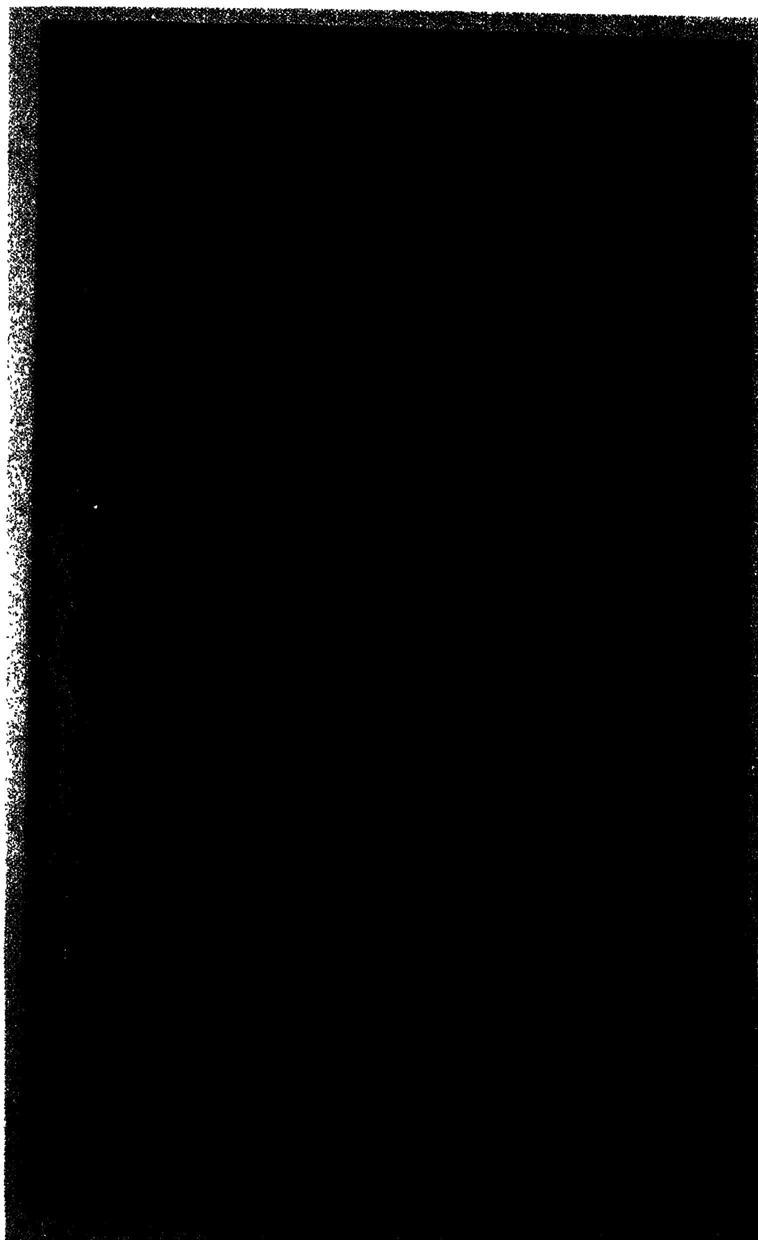
৫০. শালবন বিহারে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর তৈরি চারদিকে চারটি চালসহ নিবেদন স্তূপ



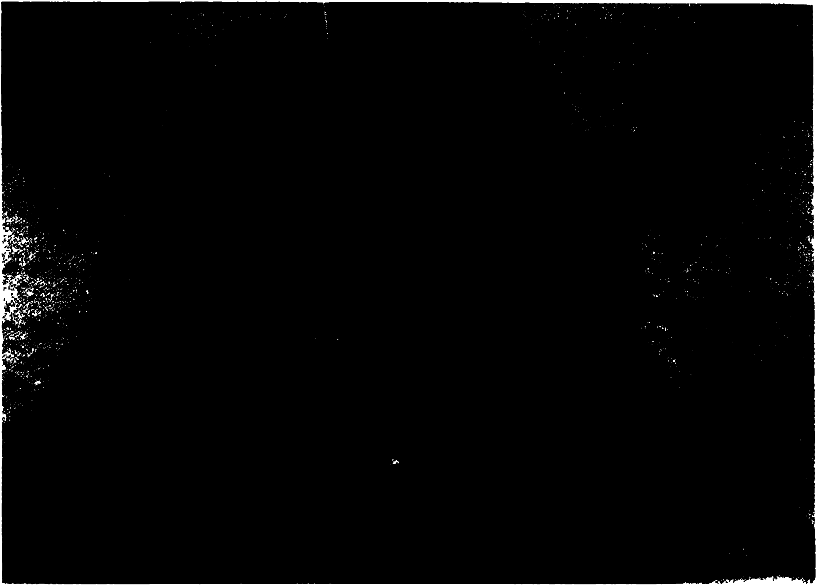
৫১. খনন কার্যের পর আনন্দ বিহারের উন্মোচিত দৃশ্য



৫২. রূপবান কন্যা মুড়ায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের বৃহদাকার ঘন্টা



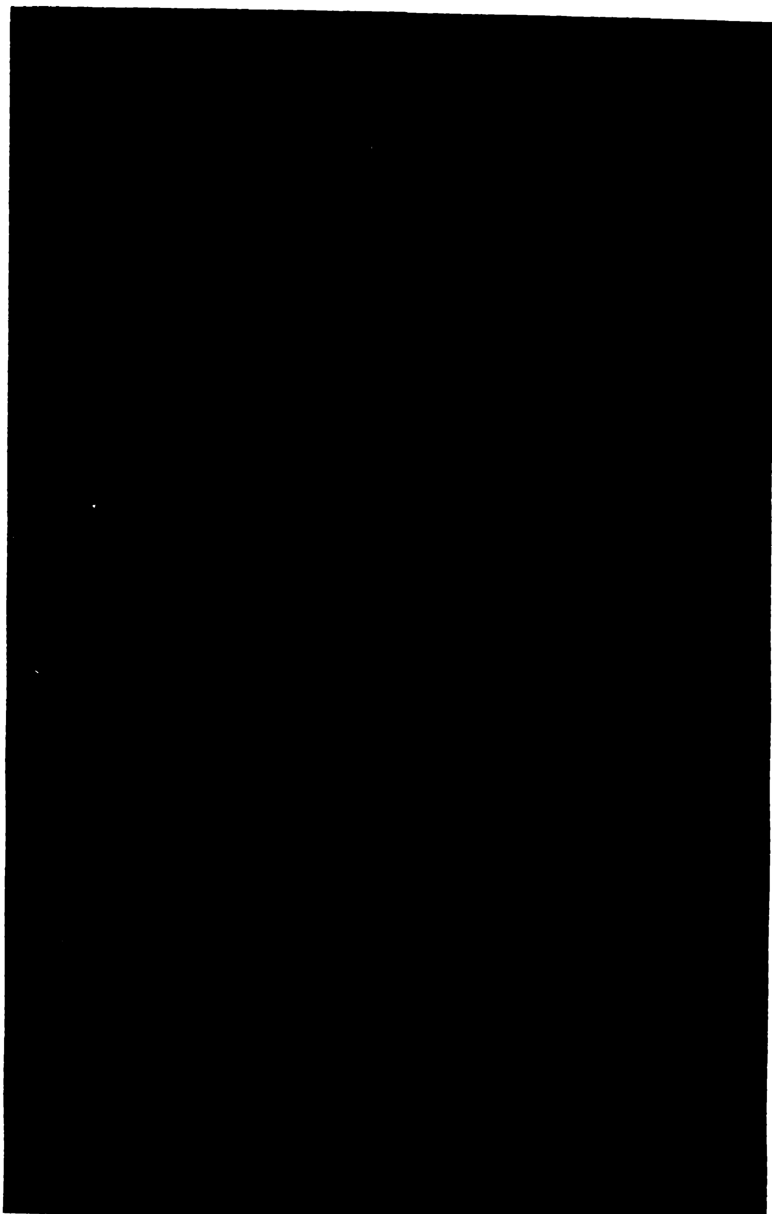
৫৩. স্থানীয় কালো পাথরের তৈরি অবলোকিতেশ্বর, ময়নামতি



৫৪. মাটির সঞ্চয়াধার, ময়নামতি



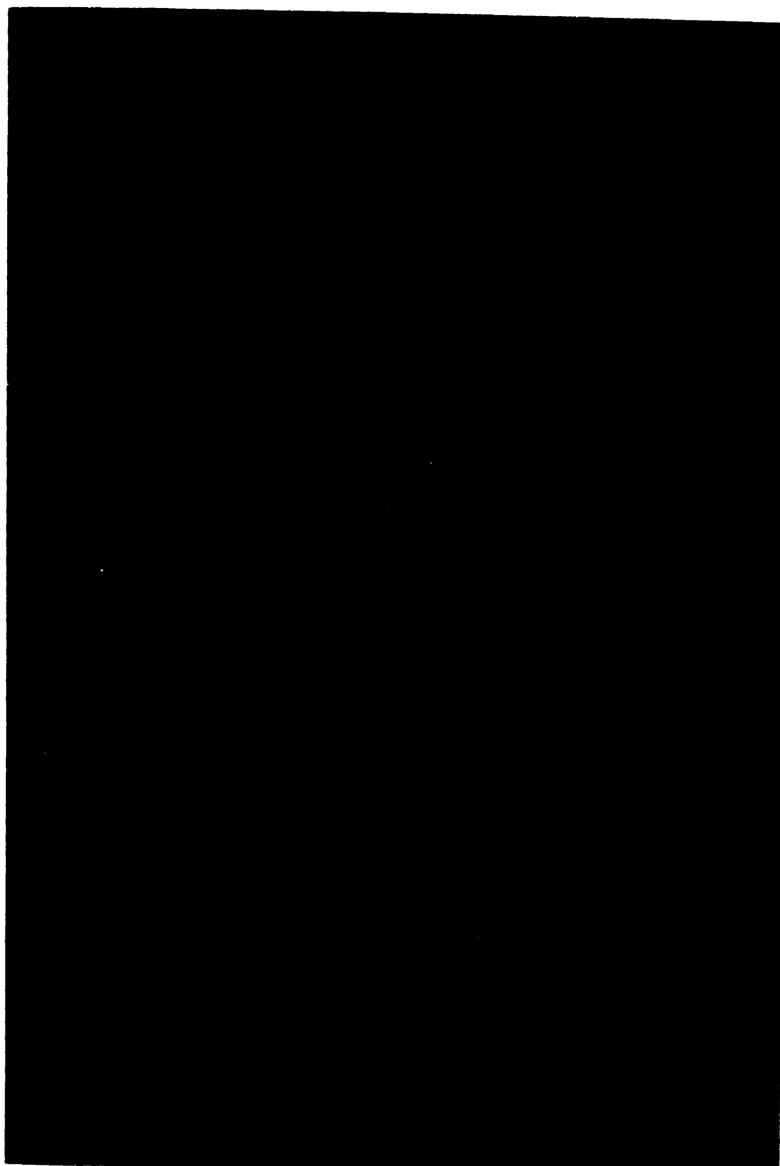
৫৫. রূপবান মুড়া মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য



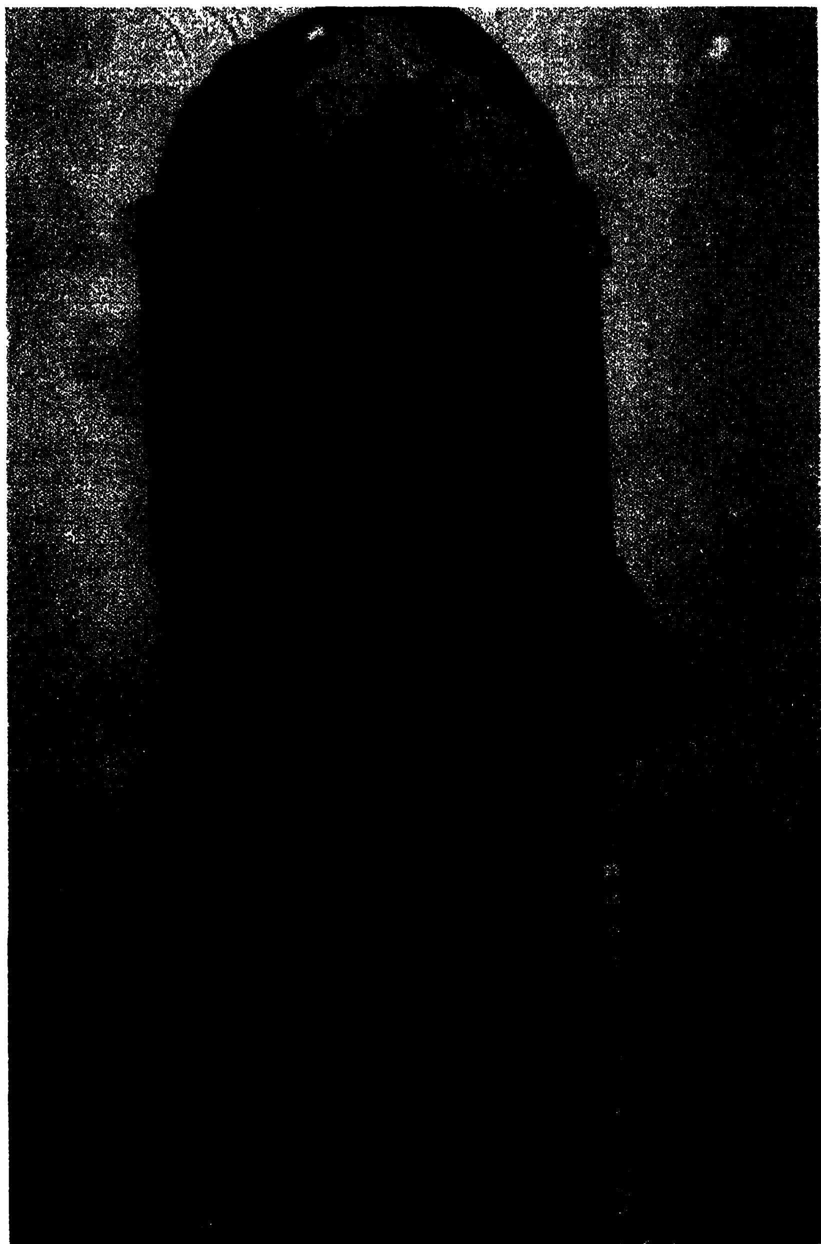
৫৬. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পাত্র



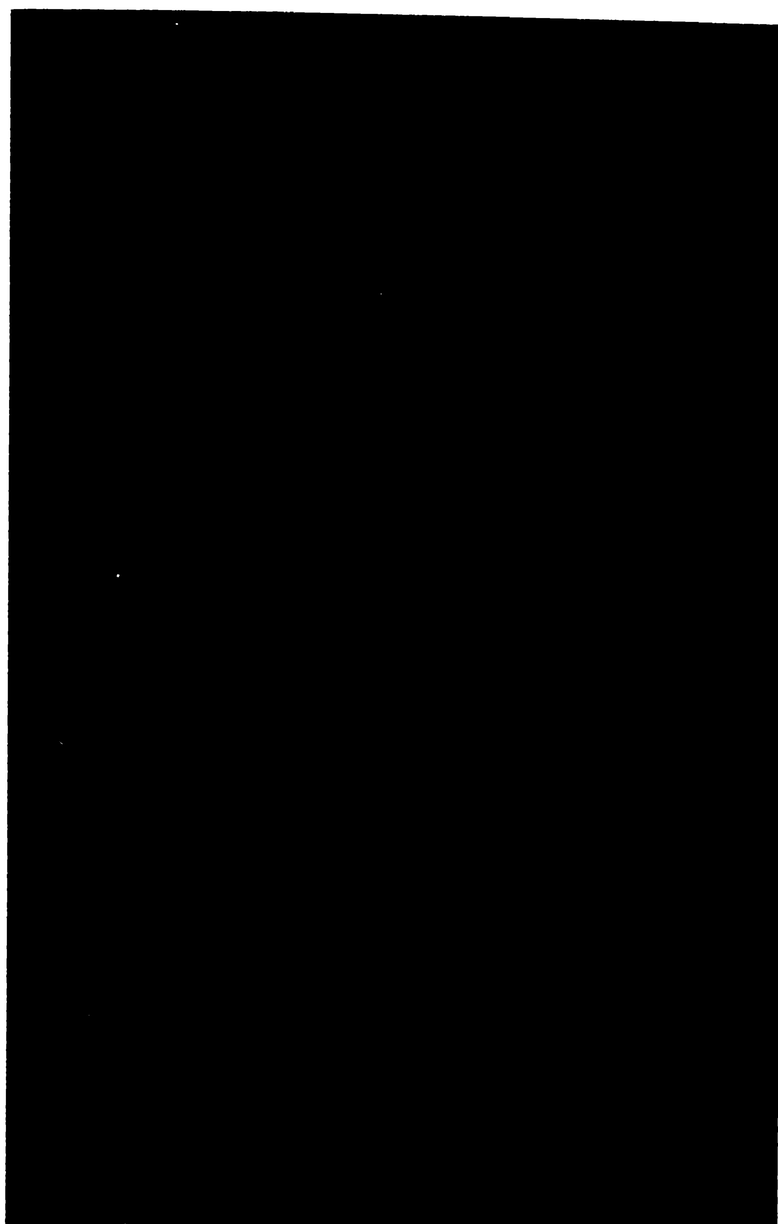
৫৭. ইটাখোলা বিহারে পাওয়া ধাতব ফলকলিপি



৫৮. ভোজ রাজার বাড়িতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের তৈরি বজ্রসত্ব



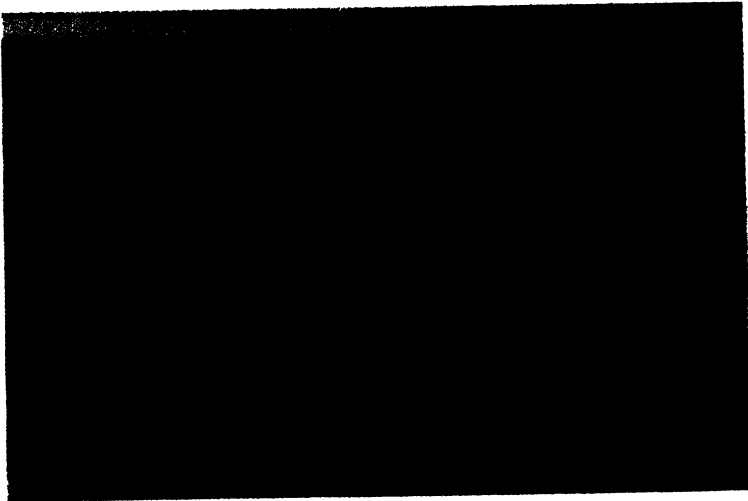
৫৯. রূপবান মুড়ায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্তি



৬০. লালমাই পাহাড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মস্তক ফলক



৬১. আনন্দ বিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ভিতে পোড়ামাটির ফলক

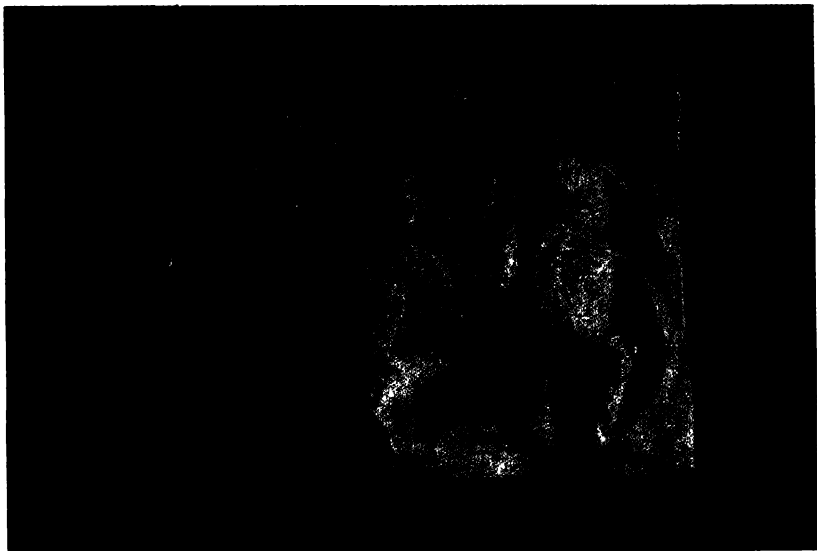


৬২. ময়নামতি টিবির স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ

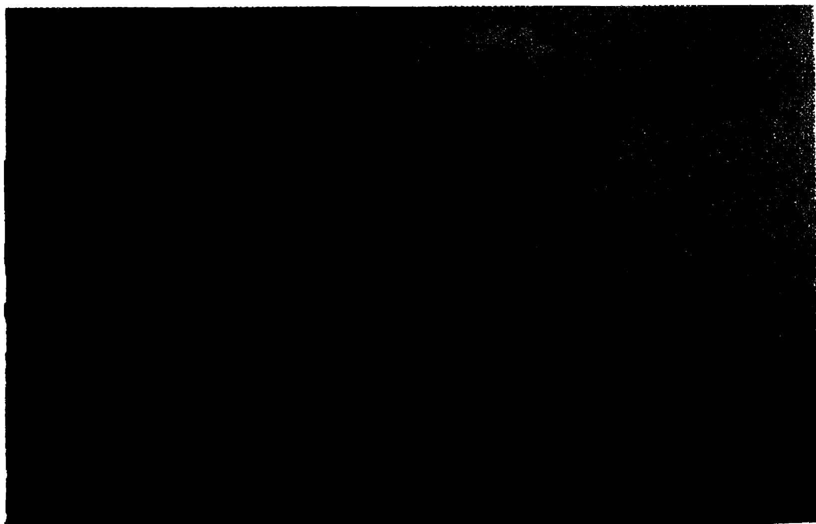
৬৩. পোড়ামাটির ফলকে নীলপদ্ম, ময়নামতি



৬৪. ব্রোঞ্জ নির্মিত রেপিকা, ময়নামতি



৬৫. পোড়ামাটির যুগল অশ্ব, ময়নামতি



৬৬. ময়নামতি প্রাসাদ



৬৭. চারপত্র মুড়া মন্দিরের আংশিক দৃশ্য

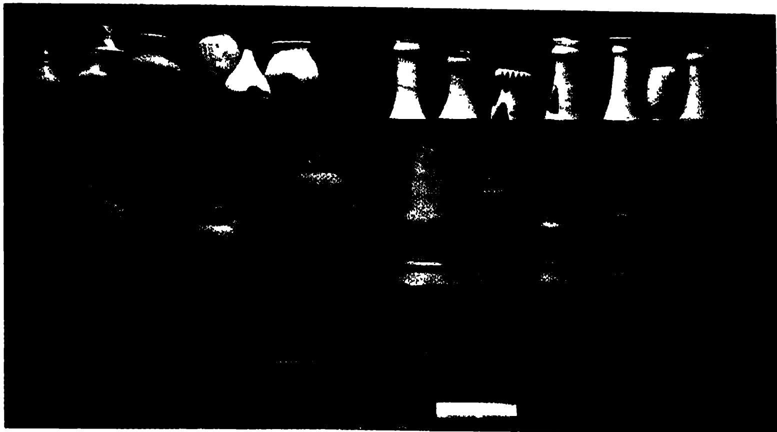
৬৮. শালবন বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে আহাররত রাজহংস



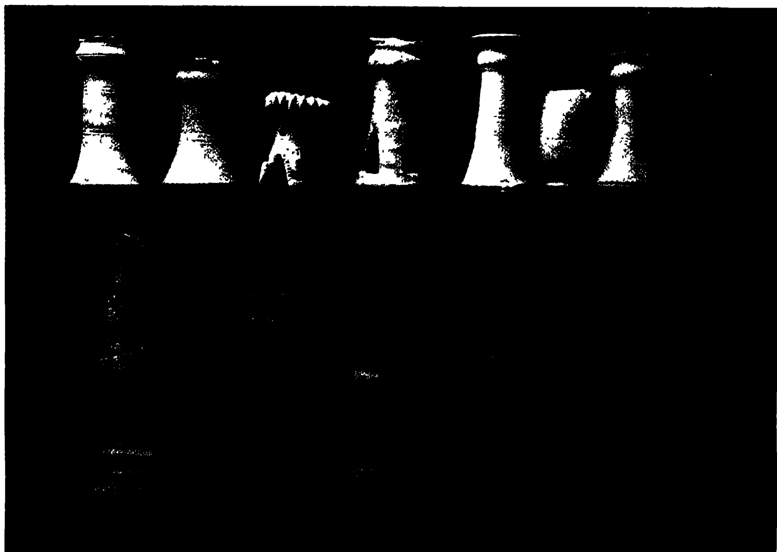
৬৯. রাণীর বাঙলো ঢিবিতে উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামো



৭০. ভোজ রাজার বাড়িতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক



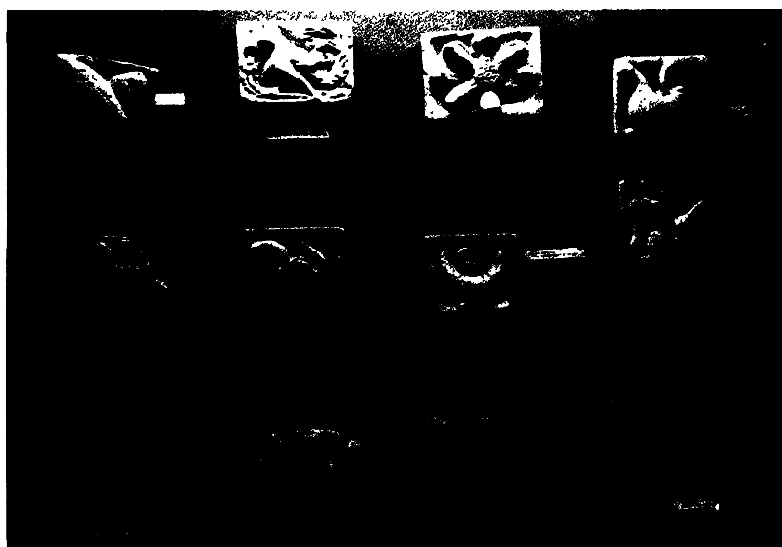
৭১. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র



৭২. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র



৭৩. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র



৭৪. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক



৭৫. ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজষপত্র



৭৭. লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলক



৭৮. ময়নামতিতে প্রাপ্ত ভগ্নমূর্তি



৭৬. ময়নামতি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর

লেখমালা-পঞ্জি

পঞ্চম শতাব্দী

(প্রথম) কুমারগুপ্তের (রাজত্বকালীন) জগদীশপুর তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১২৮ = খ্রি. ৪৪৭-৪৮) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৯, ৩৫, পৃপৃ; Epigraphic discoveries in East Pakistan by D.C. Sircar. Calcutta. 1973 (SED). PP. 8-14. 61-63.

(প্রথম) কুমারগুপ্তের (২নং) দামোদরপুর তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১২৮ = খ্রি. ৪৪৮-৪৯), EI. XV. P. 128 ff. SSI. 292.

ষষ্ঠ শতাব্দী

বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ১৮৮ = খ্রি. ৫০৭-০৮), IHQ vip. 53 ff; SSI. 340.

গুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন (গুপ্তাব্দ ২২৪?), EI xv. P. 141 ff; xvii. P. 193; SSI. 346.

গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩; ভিন্নমতে ৩৩?), EI xxiii, P. 155 ff; SSI. 372.

গোপচন্দ্রের কোটালীপাড়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৮), IA xxiii. 1910, P. 195 ff; SSI 370.

লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন EI, XV, P, 301, ff. IHQ ,XXIII P. 232 ff

শ্রীধারণ রাতের কৈলান তাম্রশাসন IHQ, XXIII, P. 221 ff. সা.প.প. ৫৩, খণ্ড ১৩৫৩, ৩-৪ সংখ্যা ৪১-৫৪ পৃ.পৃ.।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী

দেবখড়্গের (২নং আশ্রাফপুর তাম্রশাসন, তদেব।

দেবখড়্গ-মহিষী প্রভাবতীর সর্বানী প্রতিমালিপি, EI. xvii P. 357 ff.

আনন্দদেবের শালবন বিহার তাম্রশাসন, পাঠ অপ্রকাশিত, Excavations in Mainamati hills near Comilla (1956); in Further Excavations in

East Pakistan Mainamati 1956, P. 20 ff; Mainamati, a preliminary report on the recent archaeological Excavations in East Pakistan, Karachi, 1963.

ভবদেবের শালবনবিহার তাম্রশাসন, পাঠ অপ্রকাশিত। তদেব।

ভবদেবের এসিয়াটিক সোসাইটি তাম্রশাসন JASB. Letters, xvii. 1956, P. 83 ff. অষ্টম শতাব্দী

দশম শতাব্দী

(দ্বিতীয়) গোপালের ত্রিপুরা মন্দুক লিপি (রাজ্যাঙ্ক ১), IHQ xxvii. P. 55 ff.

কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন EI, xxvi. P. 313 ff.

দশম-একাদশ শতাব্দী

শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৫), Copper Plates of Sylhet. by Kamalakanta Gupta. P. 81 ff; SED PP. 19-40, 63-69; Indian Museum Bulletin. January 1967.

শ্রীচন্দ্রের মদনপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪৪ বা ৪৬), EI xxviii, P. 51 ff. P. 337; ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩।

শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন EI xii P. 136 ff.; Inscriptions of Bengal (IB) iii. P. 1 ff.

শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর তাম্রশাসন EI. xviii P. 188 ff; IB. ff. P. 10 ff.

শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা বা ধুলিয়া তাম্রশাসন EI. xxxii P. 134 ff; IB. ff. P. 165 ff.

শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর তাম্রশাসন EI. xxxiii P. 189 ff. IB ff. Dacca Review October, 1912; IB iii P. 166 ff.

কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২৪) Proceedings of the Indian Histary congress Aligarh 1960 part i.p. 36 ff; সা.প.প. ৬৭ খণ্ড, ১৩৬৭, ১ পৃ.পৃ.; Journal of Indian History x. iii 3; 1964 P. 661 ff.

একাদশ শতাব্দী

লড়হচন্দ্রের (১নং) ময়নামতি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬) Proceedings of the Indian History Congress. Aligarh. 1960. Part i, P. 36 ff;

Pakistan Archaeology. Karach 1966. 3 PP 22-55; SED. P. 45 ff and P. 69 ff.

লড়হচন্দ্রের (২নং) ময়নামতি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬) তদেব।

লড়হচন্দ্রের ভারেল্লা প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১৮) EI. xvii P. 349 ff.

গোবিন্দচন্দ্রের ময়নামতি তাম্রশাসন Procedings of the Indian History Congress. Aligarh 1960, 3. PP. 22-55 SED. P. 49-57. 77-80.

গোবিন্দচন্দ্রের কুলকুড়ি প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ১২) EI. xxvii. P. 24 ff. xxviii P. 339 ff.

গোবিন্দচন্দ্রের বেতকা প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ২৩) EI. xxvii. P. 26 ff.

ভবদেব ভট্টের ভুবনেশ্বর-মন্দির প্রশস্তিলিপি EI. vi. P. 88 ff; IB iii. P. 25 ff.

ভোজবর্মার বেলাব তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৫) EI. xii P. 37 ff; IB. iii. P. 14 ff.

হরিবর্মার সামন্তসার তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৫) EI xxx. P. 259 ff;

ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, মাঘ ১৩৪৪, ১৬৯ পৃ.পৃ; বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃ., শ্যামলবর্মার (খণ্ডিত) বজ্রযোগিনী তাম্রশাসন

দ্বাদশ শতাব্দী

বিজয়সেনের দেওপাড়া স্তম্ভ-প্রশস্তিলিপি EI. i. P. 305 ff; IB iii. P. 42 ff; JASB xxxiv, Part; i. Pp. 128-54.

বিজয়সেনের পাইকার প্রতিমালিপি ARASI, 1921-22, P. 78. IB. iii, 168 ff. বীরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ড, ১০ পৃ.।

বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬২) EI. xv.P. 275 ff; IB iii. P. 57 ff; সাহিত্য মাসিক পত্র, ১৩২৮, ৮১ পৃ.পৃ.।

লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২) IB, iii. 92-98; ভারতবর্ষ মাসিকপত্র ১৩৩২, ৪৪১-৪৫ পৃ.পৃ।

লক্ষ্মণসেনের অর্পণদীঘি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩) IB. iii. PP. 99-105; EI xii. P. 6 ff. JASB xliv Part; i, p, 11 ff; সা.প.প., ১৭ খণ্ড, ১৩১৭, ১৩৫ পৃ.পৃ.।

লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা বা সুন্দরবন তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ২ বা ৩) IB iii P. 169 ff; ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, ১৩৩২, ৬২২ পৃ.পৃ.।

লক্ষ্মণসেনের আনুলিয়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩) IB. iii PP. 89. 911; JASB lxix

part; i pp. 61-65.

লক্ষণসেনের ঢাকা প্রতিমালিপি (রাজ্যাঙ্ক ৩) IB iii PP. 116-17 JASB. NS, ix PP. 289-90.

লক্ষণসেনের শক্তিপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৬) EI xxi P. 211 ff. স.প.প. ৩৭ খণ্ড, ১৩৩৭, ২১৬ পৃ.পৃ.।

ত্রয়োদশ শতাব্দী

বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া বা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ শাসন, IHQ ii; IB iii P. 140 ff IHQ. iv. P. 637ff.

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪), IB. iii. P. 132 ff.; EI xxxii P. 315 ff JASB. 1896. Part : i PP. 6-15.

কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৩) IB. iii. P. 118 ff.; JASB. vii P. 43-47 JASB. NS. x. PP. 99-104; Indian Archaeology. 1953-54. P. 14 কানাইবড়শবোয়া শিলালিপি কামরূপ শাসনাবলী, ভূমিকা দামোদরদেবের মেহার তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ৪), শকান্দ ১১৫৬, EI, xxvii. PP. 182-91. xxx P. 51-58.

দামোদরদেবের শোভারামপুর তাম্রশাসন (শকান্দ ১১৫৮), EI. xxx P.P. 184-88.

দামোদরদেবের আদাবাড়ী তাম্রশাসন, IB iii. P. 181 ff.; ভারতবর্ষ মাসিকপত্র, ১৩৩২, ১১ খণ্ড, ৭৮-৮১ পৃ.পৃ.।

দামোদরদেবের পাকামোড়া তাম্রশাসন, ইতিহাস, ৮, ১৩৬৪-৬৫, ১৬০ পৃ.পৃ.।

দামোদরদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন (শকাব্দ ১১৬৫), IB. iii. P. 158 ff.

গোবিন্দকেশবদেবের ভাটেরা তাম্রশাসন (৪১৫১ কলিযুগ), EI. xix P. 2 77 ff. Capper-Plates of Sylhet by Kamalakanta Gupta. P. 153; Procedings of the Asiatic Society of Bengal; 1880. P. 141 ff.

Bengal 1880 P. 141 ff.; Copper-Plates of Sylhet. Op-citp. 184 ff. রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকেলদেবের ময়নামতি তাম্রশাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৭, শকাব্দ ১১৪১), IHQ. ix. P. 282 ff.

গ্রন্থপঞ্জি

1. W.G. East, The Geography behind history, London, 1966.
2. H.P.R. Finberg (ed), Approaches to history, (Historical Geography by H.C. Darby, Page: 127-157), London, 1962.
3. M.A. Choudhury, Geography of Ancient Bengal, 1977.
4. H. Yule (ed), The Book of SirMarcopolo, London,1903.
6. Amitabha Bhattacharya, Historical Geography of Ancient and Early Medieval Bengal.
7. H.S. Farrett, Ain-1-Akbari (vol-2), Calcutta,1948.
8. Sir Jadunath Sarkar, Commemoration Volume, Punjab University,1959.
9. K. Bagchi, The Ganges Delta, Calcutta, 1944.
10. G.E. Gerini, Researches on Ptolemys, Geography of Eastern Asia, London, 1909.
11. R.C. Mojumdar, Physical features of Ancient and Medievl Bengal, Calcutta 1945.
12. H.A.R. Gibb (tr.), Travels of Ibn Batuta in Asia and Africa, London,1929.
13. R.C. Mojumdar (Ed.), History of Bengal, Vol.1, Dhaka, 1943.
14. W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal, London, 1975-1977.
15. S.M. Ali, The Geography of the Puranas, New Delhi, 1966.
16. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.V.
17. Barrie M. Morrison, Lalmai, a Cultural Center of Early Bengal (Lalmai), seatle,1974.
18. A.M. Chowdhury, Dynestic History of Bengal, Dhaka, 1967.
19. Ahmed Hassan Dani, Mainamati Plates of Chandras, Pakistan Archaeology No. III, 1966.
20. B.C. Sen, some historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Calculla, 1942.
21. J.A. Legge, Record of the Buddhist Kingdoms being an account of the Chinese Monk Fa-hien's Travels, Oxford, 1886.
22. Mikhail Nesturkh, The Origin of Man, second Eddition, Moskow, 1967.
23. H.H. Risley, The People of India, Second eddition Delhi,1969.
24. L.S.S.O. Malley, Census of India vo. 1, 1911.
25. R.P. Chanda, The Indo-Aryan Races, 1969.
26. S.K. Chatterjee, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta,1926.
27. A.H. Dani, Race and Cultural Complex in Bengal, Social Research in East Pakistan, Chaka,1960.

28. S.K. Chatterjee, Indo-Arians and Hindi, Ahmedabad, 1924.
29. A.K. Nazmul Karim, The Dynamics Bangladesh Society, Delhi,1980.
30. H.R. Sanyal, Social Mobility in Bengal, Calcutta, 1981.
31. S.K. Saraswati, Architecture of Bengal, Calcutta, 1976.
32. Nazim Uddin Ahmed, Discover the Monuments of Bangladesh, A Guid to their History, location and Development, Dhaka, 1984.
33. F.A. Khan, Mainamoti, Karachi, 1963.
34. A.K.M. Samsul Alam, Mainamoti, Dhaka, 1975.
35. M.R. Tarafdar, Mosques and Dargahs- Their Role and Signifecance in the Modern life of the Bengali Muslims.
36. Niherranjan Roy, Sculpture, HBI.
37. D.C. Sarkar, Epigraphic Discoveries in East Pakistan ,Calcutta, 1973.
38. P.C. Bagchi, History of Bengal, Vol-1.
39. Abdul Momin Choudhury, Conversion to Islam in Bengal: An Exploration, Rafiuddin Ahmed (ed), Islam in Bangladesh, Dhaka, 1983.
40. N.K. Bhattasali, Commemoration, Volume, Dhaka, 1966.
41. Bijoy Chandra Majumdar, History of the Bengali Language, 2nd edition ,Calcutta, 1927.
42. M. Shahidullah, les chants Mystiques de kanha et de Saraha, Paris,1928.
43. Statistical Pocket Book Bangladesh, Bangladesh Bareau of Statistics, July 2007.
44. R,C. Majumdar, History of Ancient Bengal (Page-167-169,199-206, 278-280.)
45. Md. Mosharraf Hossain Mainamati Lalmai Anecdote to history, Dibyaprakash, Dhaka,2006.
46. F.A. Khan and A.H. Dani, Excavations on Mainamati Hills near Comilla in further excavation in East Pakistan Mainamati, 1956.
47. D,C. Sarkar, Chandra Kings of Arakan and studies in Indian Coins, Calcutta, 1968 and land system and Socialism in Ancient India, Calcutta 1966.
48. Debiprashed, Taranath's history of Buddhism in India, Simla,1969.
49. S.N. Majumdar, Ancient India as Deseribed by Ptolemy (east) Calcutta, 1927.
51. B.M. Morrison, Political centers and cultural regions in early Bangal, Tascon, 1970.
52. T.N. Ramachandran, Recent Archological Discoveries Along the Mainamati-lalmai ranges, Tripora Dishtrict, Calcutta, 1946.
53. James Rennell, Momoir of a map of Hindoustan, London 1783.

55. Dr. Mohammed Shahidullah, Buddhist Mystic Songs: Oldest Bengali and other eastern vernacular, Karachi 1960.
56. Thomas Watters, On Yuan Chwangs Travells in India-629-645 AD London 1905.
58. B. Gangopaddhyay, Some Recently Discoverd Brozas from Tripura, Art and Culture no.1 Calcutta, July 1983.
59. Enamul Haque, Bengal Sculptures; Hindu Iconography up to C 1250 A.D. Bangladesh national Museum 1992.
60. C. Swamy, Early Indian Iconography. Philasdalphis, 1929.
61. R.B. Smart, Geographical and Statistical Report on the District of Tripura, Calcutta, 1866.
62. Williem Van Schendel (ED.), Francis Buchanan in South-East Bengal (1798) : His Journey of Chittagang Hilltacks, Noakhali and Comilla, University Press Limited, Dhaka, 1992.
63. J. Allan, Catalogue of Coins of the Gupta Dynasty, British Museam, London, 1940.
৬৪. ড. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলিকাতা, ২০০৪।
৬৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৪।
৬৬. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ঢাকা, ১৯৭৭।
৬৭. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, (সম্পাদিত) কুমিল্লা, ১৯৮৪।
৬৮. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা।
৬৯. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৭।
৭০. চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি, চট্টগ্রামের ইতিহাস, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪।
৭১. শ্রী অতুল সুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৭৭।
৭২. সুকুমার সেন, বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪।
৭৩. সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি, কলিকাতা, ১৩৫৩।
৭৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), বৃহদ্ধর্মপুরান, কলিকাতা, ১৮৯৫।
৭৫. আহমদ শরীফ, বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৮।
৭৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা, ১৯৬৩।
৭৭. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙলা ভাষা ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৬৫।
৭৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, নবম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭৪।
৭৯. সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৭৯।
৮০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃথিবীর ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৫।
৮১. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০।

৮২. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, চর্যাগীতি, কলিকাতা, ১৯৬৫।
৮৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৩৫৮।

পত্র-পত্রিকা

1. J.P. Morgan and W.G. Mc. Intire, Quarternary Geology of the Basin, East Bulletin of the Geological Socity of America, LXX, 1959.
2. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1913.
3. Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, 1870.
4. Epigraphia Indica (Ei), XVII, 1924.
5. Archaeological Survey of India Report XV.
6. M. Harunur Rashid, Bangladesh-A Profile in the light of Recent Archaeological Discoveries, Bangladesh Historical Studies, Dhaka, Vol-III, 1978.
7. N.G. Majumdar (ed), Inscriptions of Bengal, Vol. III, Rajshahi, 1929.
8. A.M. Choudhury, The Deva Parvata, Journal of the Borendra Research Musiam Vol. I, 1972.
9. B.N. Mukherjee, Place of Harikela Coinge in the Archaeology of Bangladesh J.V.R.M. Vol. VII.
10. M.A. Gafur, Archaeological Monument in East Pakistan, Pakistan Observer, 14 November 1970.
11. T.C. Roy Choudhury, The Racial Problem of Bengal, Presidential Address, Anthropology and Archaeology Section, Indian Science Congress, 1952.
12. M.A. Basu, Blood Groups of Noluas of Bengal, Nature, April 1938.
13. M.R. Tarafdar, Trade and Society in Early Bengal, Indian Historical Review.
14. M. Harunur Rashid, The Mainamoti Gold Coins, Bangladesh Lalitkola, Vol. I, 1975.
15. M. Harunur Rashid, The Origin and Early Kingdom of the Chandras of Rohitagiri, Bangladesh Historical Studies, Vol. 2, 1977.
16. B.D. Chattapadhai, Currency in Early Bengal, Journal of Indian History. December 1977.
17. E.F. Oargutcrm, Ancient Curtries in Eastern India, found of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIV, 1895.
18. A.N. Chatterjee, The Variation in Stature and Cephalic Index among Bengalee College Students, Presidential Address, Anthropology and Archaeology Section, Indian Science Congress, 1948.

21. R.D. Banerje, Chandras Conquest of Bengal, Indian Antiquary (IA) XLIII, 1990, Tipperas Copper Plate Grant of Lokonatha : The 44th year, Epigropha Indica (EI), XV, 1919,
Mainamati Copper Plate of Ranavankamalla Harikaladeva, The Indian Historical Quaterly (IHQ), IX, 1933.
Harikala and the Ruins at Mainamati, IHQ, XX, 1944.
22. R.G. Basak, Tippera Copper Plate Grants of Lokonath the 44th Regnal year EI, 1919-20;
23. D.C. Bhattacharya, A Newly Discoverd Copper Plate from Tippera, (IHQ, VI, 1930.).
24. P.N. Bhattacharja, Nidhanpur Capper Plate of Vaskara Varman, EI, XII, 1930.
25. N.K. Bhattasali, The Kedarpur Plate of Srichandradev, EI, XVII, 1923, The New Kailan Plate of SriDharana Rata, IHQ, XXII, 1946.
The Inscription of Gavinda Chandra, King of Vanga, EI, XXII, 1947,
Two Grant of Varmans of Vanga Samantasar Plate of Harivarman, EI, XXX, 1954.
26. S.K. Chakrobortty, The Gold Coins of Ancient Bengal, IC. XII, 1945.
27. P.C. Chakravarti, On the Identification of Harikalia, IC, XII, 1945.
28. R.C. Hazra, A Newly Discoverd Work of Bhatta Bhabadeva of Bengal, IHQ, XXXII, 1956.
29. A.B.M. Hussain, Mainamati Deva Parvata, ASBD, Dhaka, 1997.
30. M.H. Rashid, The Chandra Rulers of Bengal, JVRM, V, Rajshahi, 1976-77.
31. Excavation at Ananda Vihara, Mainamati, Comilla 1979-82. Department of Archaeology, Bangladesh, 1999.
32. Excavation at Rupban Mura, Department of Archaeology, Bangladesh, 2000.
৩৩. সুকুমার সেন, বাংলাদেশের নামের পুরাতত্ত্ব ইতিহাস, কলিকাতা, নবম সংখ্যা, ১৩৬৫।
৩৪. বাদল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রত্নতত্ত্বের আলোকে আদি ঐতিহাসিক পর্বের বঙ্গীয় সভ্যতা, ইতিহাস, ঢাকা একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলার বর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩।
৩৫. ভোজবিহার খনন প্রতিবেদন ২০০২-২০০৩, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
৩৬. ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
৩৭. ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের প্রতিবেদন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।

নির্দেশিক